হাসনাত আবদুল হাই

নভেরা

'নভেরা' পত্রিকান্তরে প্রকাশের সঙ্গে
সঙ্গে যে বিপুল আলোড়ন তোলে তার কোনো তুলনা
খুঁজে পাওয়া ভার। হারিয়ে যাওয়া অসাধারণ এক শিল্পীকে,
জেদী সংবেদী তরুণীকে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনা
শুধু নয়, তাঁকে আজকের দিনের পটভূমিকায় প্রাসঙ্গিক ও
সজীব চরিত্রে রূপান্তর করেছেন হাসনাত আবদুল হাই।
জীবনীভিত্তিক সাহিত্য-রচনায় যে অনুপম সিদ্ধির পরিচয়
রেখেছেন তিনি, 'নভেরা' রচনার সুবাদে তা সাফল্যের নতুন
মেরুশেখর স্পর্শ করলো। বহুমাত্রিক এই উপন্যাসে যন্ত্রণা-
জর্জর শিল্পীর আর্তি দাগ কেটে যায় আমাদের অন্তরের
গভীরতম প্রদেশে, ফেলে আসা এক অতীত মুখর হয়ে ওঠে
সমাজবাস্তবতার সমগ্রতা নিয়ে, শিল্প ইতিহাসের অজানা
পর্ব দ্যুতিময় হয়ে ওঠে চরিত্রচিত্রণ কুশলতায় এবং বিস্মৃত,
অবহেলিত, উপেক্ষিত নভেরা এ উপন্যাসের সূত্রে আবার
হয়ে ওঠেন আমাদের খুব কাছের নভেরা, অতীতের সকল
ব্যর্থতা মুছে দিয়ে সমাজ আবার বরণ করতে এগিয়ে আসে
সাহসিক এক শিল্পীকে, শুরু হয় নতুন করে 'নভেরা
অনুসন্ধান'। হাসনাত আবদুল হাই-এর এই উপন্যাস
তাই জন্ম দিয়েছে বড় মাপের সামাজিক ঘটনার।
রচনার শিল্পগুণ ও বিষয়ের অভিনবত্ব যে কতটা
আলোড়ন উদ্রেকী হতে পারে তার
সাক্ষ্য বহন করছে 'নভেরা'।

ISBN 984-465-072-0

নভেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

খান আতাউর রহমান
সাঈদ আহমদ
আমিনুল ইসলাম
মুর্তজা বশীর
শাহাদত চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথার উপর পুরনো ফ্যান শব্দ তুলে ঘুরতে শুরু করলে নভেরার কলকাতায় বউবাজারের বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। বউবাজারে তাদের বাড়িতে বসবার ঘরে ঠিক এমনি শব্দ তুলে একটি ফ্যান যখন ঘুরত বাইরে রাস্তার কোলাহল, যানবাহনের শব্দ চাপা পড়ে দূরে চলে যেত, নতুন একটা ঢেউ পুরাতন ভেঙে পড়া ঢেউকে যেমন তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

মা এসে বললেন, কিরে কখন এলি? ক্লাস শেষ?

হ্যাঁ। পা দুটো টেবিলের ওপর উঠিয়ে আরাম করে বসল নভেরা। তার হাতে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা, চোখ সিনেমার বিজ্ঞাপনে, মেট্রোতে গ্রেটা গার্বোর 'ক্যামিল' দেখানো হচ্ছে। পুরনো ছবি, নতুন করে দেখাচ্ছে। সে চোখ তুলে বলল, চলো, ম্যাটিনি শো দেখে আসি।

কোথায়? মা তাকালেন। যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

মেট্রোতে, আমার ফেভারিট স্টারের বই চলছে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে? না হলে একাই যাবো।

সেইজন্যে আজ স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলি বুঝি? না, বাপু এমন হুট করে আমি বেরুতে পারব না।

বেশ। তাহলে একাই যাই। হয়ত মেট্রোতে দেখা হয়ে যাবে বন্ধুদের কারু সঙ্গে।

তাহলে বন্ধুদের কাউকে নিয়ে বেরুলেই পারতিস। বাড়ি এসে আমাকে নিয়ে টানাটানি করতে হতো না।

টানাটানি আমি করছি না। কেউ গেল বা নাই গেল তাতে কিছু আসে যায় না আমার। আমি একাই যেতে পারি। সে ঠোঁট ওল্টালো। মাথার একগুচ্ছ চুল এসে পড়েছে কপালের ওপর।

মা হেসে বললেন, সে তো জানিই। তোকে কে কবে আটকে রাখতে পেরেছে।

নভেরা উঠে এসে মাকে দুহাতে জড়িয়ে তার কপালে চুমো খেয়ে বলল, ইউ আর নাইস। আই লাভ ইউ।

তার এখন বউবাজারের বাড়ির কথা মনে পড়ছে, ফ্যানটা শব্দ তুলে ঘুরছে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ, যেন ঘোড়ার গাড়ির চাকা তেলের অভাবে গোঙানি তুলছে। ওপরের দিকে তাকালো নভেরা। কড়ি-বরগা নিয়ে ছাদটা বেশ ওপরে। নতুন রং করা হয়েছে, তবু বয়স ধরা যায়। প্লাস্টার খসে পড়েছে আলগা হয়ে, মাঝে মাঝে ভেজা স্যাঁতসেঁতে। একটা স্কাইলাইট সিলিং আর দেয়ালের মাঝে। ওপর থেকে হলুদ একটা আলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিম নেবে এসেছে ঘরের ভেতর ফর্টিফাইভ অ্যাঙ্গেলে। বিমের ভেতর অসংখ্য ধুলোর কণা উড়ছে, জড়াজড়ি করে আছে, যেন একটা শেপ নেবে একটু পর। নভেরা ভাবল সমস্ত ঘরেই ধুলোর কণা ছড়িয়ে আছে, উড়ছে, ঘুরছে, কেবল আলোর যে বিম নেবে এসেছে তির্যক হয়ে স্কাইলাইট থেকে সেখানে তারা স্পষ্ট। ট্রুথ কি এমনই, সামান্য ধরা পড়ে? বাকিটা থাকে লুকিয়ে, চোখের সামনে যদিও? নভেরা কিছুক্ষণ ভাবল, হঠাৎ করেই তার মনে এল কথাটা।

পেছনে পায়ের শব্দ। শক্ত জুতোর পালিশ-করা শরীর মচমচ করছে, ফ্যানের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে। পায়ের শব্দ খুব কাছে এসে গিয়েছে। থেমে গেলে আবার ফ্যানের শব্দ বড় হলো। ঘরটায় জানালা নেই, কলোনিয়াল স্টাইলের বড় বড় দরজা, খড়খড়ি দেওয়া দরজার কপাট খুলে রাখা। পরদা ঝুলছে, বাতাস নেই, নড়ছে না ভারী কাপড়। বড় বড় ফুলের নকশা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

তুমি এসেছ তাহলে? পদশব্দ সামনে আসে, লোকটি সামনের সোফায় বসে, ঠিক ওপর থেকে বাঁকা আলোর বিমটা যেখানে এসে পড়েছে। হাজার লক্ষ ধূলিকণার ভেতর তার মুখ, গলা, বুক গেঁথে যায়, তার চেহারা অন্যরকম দেখায়। যেন ফ্যান্টম।

হ্যাঁ, একটু আগে এলাম।

না এলেই পারতে। খুব রুষ্ট শোনায় কণ্ঠস্বর।

তার মানে? নভেরা মৃদু হেসে তাকায় সামনে। ভ্যাপসা গরমে সে ঘামছে। তার তৃষ্ণা পেয়েছে, বরফ দেওয়া পানি পাওয়া যাবে? বাবুর্চি বেয়ারা কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

মানে আবার কী। খুব সোজা। এই-যে ইচ্ছেমতো বাইরে যাচ্ছ, যেখানে খুশি ঘুরছ, আমি কিছুই জানছি না, এটা কি ভালো হচ্ছে?

মন্দেরও কিছু দেখছি না। যেখানে খুশি যাচ্ছি, এ তো নতুন কিছু না। বিয়ের আগেও গিয়েছি।

বিয়ের আগে আর পরে তফাৎ আছে। তুমি এখন বউ। একজন সম্ভ্রান্ত, ইম্পর্ট্যান্ট লোকের স্ত্রী। এভাবে টম বয়ের মতো ঘুরে বেড়ালে আমার ইজ্জত যাবে।

টম বয়! ভেরি ফানি! নভেরা সোজা হয়ে বসে। তুমি এই ইজ্জতের ব্যাপারটা আগেও বলেছো কয়েকবার। এতই যদি ঠুনকো হয় তোমার ইজ্জত তাহলে বিয়ে করতে গেলে কেন? আই ওয়াজ নট কিন। তুমিই জোর করলে।

বিয়ে সবাই করে। নতুন কিছু করি নি আমি। তুমি স্ত্রী হয়ে যা করছ তা শুধু নতুন না, দারুণ বেখাপ্পা। অস্বাভাবিক, এবনর্মাল। কণ্ঠস্বর ক্রমেই উঁচু হয়।

তাই? ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি নতুন কিছু করছি? আই ডোন্ট থিংক সো। আই অ্যাম মাই ওল্ড সেল্‌ফ। তোমার এসব অজানা থাকার কথা নয়। তুমি আমাকে খুব কাছ থেকে দেখেছ। ডে অ্যান্ড নাইট। ডে আফটার ডে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্যাটস ট্রু। সেটা বিয়ের আগে। নাউ ইউ আর মাই ওয়াইফ। ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে ঘুরতে পারো না। আমার প্রেসটিজের কথা ভাবতে হবে তোমাকে।

রং। ইউ আর রং। তোমার প্রেসটিজের কথা ভাবার মানে যদি এই হয় যে আমাকে চার দেয়ালে বন্দি হয়ে থাকতে হবে, তাহলে ইউ আর রং। তুমি সে কথা ভালো করেই জানো, আই অ্যাম নট দ্যাট টাইপ। তাছাড়া বিয়ের আগে শর্ত ছিল তুমি আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হস্তক্ষেপ করবে না।

শাট আপ। আই নো ইওর টাইপ। তার স্বামী উঠে দাঁড়ালো। কোমরের বেল্ট খুলল। রাগে তার মুখ লাল হয়ে এসেছে। এখন হলুদ আলোর বিমে কেবল তার মাথাটা দেখা যাচ্ছে। বীভৎস দেখাচ্ছে, যেন মানুষের মুখ নয়। সে বেল্টটা ছুঁড়ে সোফার ওপর ফেলে দিল। তারপর নভেরার কাছে এসে দাঁড়ালো, শক্ত হাতে তার দুকাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে দাঁড় করালো সামনে। সমস্ত শরীর ঝাঁকুনি দিতে দিতে জিগ্যেস করল, বলো কোথায় গিয়েছিলে? কোথায়? কোথায়? কোথায়?

এই গ্রামে সে আগে আসেনি, যদিও শহরের খুব কাছে। এখানে অনেক বড় বড় দিঘি আছে বলে পিওনের কাছে শুনেছে। এসে দেখল সত্যি তাই। দিঘির পাড়ে তালগাছ, দিঘির বুকে তাদের শান্ত ছায়া। তালগাছের উঁচু মাথায়, শক্ত খসখসে পাতা থেকে ঝুলছে পাখির বাসা। কী নাম? বাবুই? ভেরি পোয়েটিক, বাবুই। কীভাবে তৈরি করে ওদের অমন সুন্দর ঐ বাসা। সম্বল শুধু তো ঠোঁট। তাও খুব ছোট। বাবুই, এ গ্রেট আর্টিস্ট, আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার। আমি যদি বাবুই হতাম। ইফ দেয়ার ইজ এনাদার লাইফ আই উড লাইক টু বি এ বাবুই।

সূর্য মাথার ওপর এগিয়ে আসছে, গরম লাগছে, দিঘির পাড়টা ছাড়তে ইচ্ছে করে না, বেশ সুন্দর আর ঠাণ্ডা, এখন একটু পরপর মাঠ পেরিয়ে বাতাস বয়ে যায়। বসি একটু এখানে, না, না চাদর পাততে হবে না। চা নিয়ে এসেছ? বেশ দাও। পিওনটা চা ঢালে। আচ্ছা ওর সঙ্গে কথা বলি এখন। একে আগে সঙ্গে আনি নি। কি বললে, এই গ্রামেই তোমার বাড়ি? আহা তাহলে তো এখানকার সবকিছু তোমার চেনা। বলো তাহলে কী কী আছে দেখার। দিঘি তো দেখলাম, বিশাল দিঘি। জোছনা রাতে এসে দেখতে হবে পরীগুলো যখন ওপর থেকে নেবে দিঘিতে সাঁতার কাটে? তুমি দেখো নি কোনোদিন? না, না, শুধু গল্প হতে যাবে কেন? তোমাকেও নিয়ে আসব সঙ্গে। দেখবে সত্যি না মিথ্যা। কি বললে? একটা মাজার আছে এই গ্রামে? চলো সেখানে যাই, আই লাভ মাজারস্। লাল সালু, শুকনো ফুলের মালা, ঠাণ্ডা ঘরের মেঝে, পিন ড্রপ সাইলেন্স, যদি না ঘুঘু ডেকে ওঠে কাছের কোনো গাছ থেকে। আর দুপুরে ঘুঘুর ডাক ভেরি স্যাড, খুব লোনলি মনে হয়।

খাদেম মুখ নিচু করে দোয়া-দরুদ পড়েন। আমার মাথায় হাত রেখে দরুদ পড়েন বিড়বিড় করে। তারপর দোয়ার পর দুহাত তোলেন। আমরা দুজনেও তুলি। অনেকক্ষণ দোয়া করেন তিনি। তার লিলি হোয়াইট পাঞ্জাবির ওপর চেককাটা লাল গামছা ঝোলানো, দাড়ির চুল শাদা পাকা। তিনি দোয়া করতে করতে কাঁদেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মন ভারী হয়ে আসে। আই ক্যান্ট স্টান্ড টিয়ারস। লোকটা কি অভিনয় করছে, না সত্যি সত্যি কান্না পেয়েছে তার? সে যাই হোক, আই লাইক মাজারস্। চট্টগ্রামের অনেক গ্রামে ঘুরে ঘুরে ছোট বড় বহু মাজার দেখেছি। দে গিভ মি এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অব ফিলিং। না, আমাকে আদার ওয়ার্ল্ডলি করে তোলে না। আই জাস্ট ফিল ডিফারেন্ট। ফার ফ্রম দা ম্যাডেনিং ক্রাউড টাইপের ফিলিং এসে যায়।

ইউ আর হার্টিং মি। ছেড়ে দাও। লিভ মি এলোন। আই সে লিভ মি এলোন।

সে হিংস্র হয়ে আমার ওপর চেপে বসেছে। ঘরটা নিকষ অন্ধকার। রাত কটা বাজে? খুব গভীর, আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। গার্ডের গলাখাঁকারি শোনা গেল। অন্ধকারে যেন অন্ধকারকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। ভয় পেয়েছে।

সে ভারী পাথরের মতো আমার ওপর চেপে আছে। তার হাত হিংস্র হয়ে উঠেছে। সে আমার সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, স্টপ ইট, স্টপ ইট।

শাট আপ। আই অ্যাম ইওর হাজব্যান্ড।

ভীষণ যন্ত্রণায় আমি কেঁদে উঠি। বাইরে গাছে পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ শুনি। অবিকল মানুষের মতো শব্দ। ভালচার, ভালচার, আমার রুদ্ধ গলা দিয়ে ফ্যাস-ফ্যাস স্বর বের হয় ভালচার, ভালচার। দূরে ঘন্টার শব্দ হয়। এক, দুই, তিন। রাত তিনটা বাজে। ভোর হতে অনেক দেরি। অন্ধকারে আমি অনেক ছায়া দেখতে পাই যারা সন্তর্পণে নড়ছে। ষড়যন্ত্র করছে।

তাজিয়া এসেছে, তাকে খুশি দেখাচ্ছে। একটা নীল প্যান্ট পরেছে, ওপরে শাদা ব্লাউজ। বব-করা চুল কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে। আমাকে দেখে বলল, কিরে ডার্লিং আপু তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন? তোর কি অসুখ করেছে? চেহারা কেমন হয়ে গিয়েছে।

নভেরা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। তাজিয়াকে বলে, ঘুম থেকে উঠে আজ মেক-আপ করিনি। ভুলেই গিয়েছি।

তাজিয়া তার দিকে তাকিয়ে বলে, স্ট্রেঞ্জ। তুমি সব ভুলতে পারো, মেক-আপ করতে ভুলতে পারো না। কী হয়েছে তোমার? সামথিং ইজ রং।

ঘরের ভেতর যেতে যেতে নভেরা বলে, বোস্ আমি আসছি।

কিছুক্ষণ পর নভেরা ঘরে এসে ঢোকে। কালো শাড়ি পরেছে, ধূসর ব্লাউজ, মাথার ওপর চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। মুখে ফ্রেশ মেক-আপ। তার মুখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

তাজিয়া বলল, তোমাকে খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে। ভেরি কিউট।

হাতের ব্যাগ দেখে নিয়ে নভেরা বলল, তুই কি হেঁটে এসেছিস?

না, সাইকেলে।

বেশ। তোর সঙ্গে যাবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ছোট কাগজের নোট রেখে দেয় টেবিলের ওপর, পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপানো থাকে। সুইচ টিপে ফ্যান বন্ধ করে দেয়। ফ্যানের গোঙানি হঠাৎ দীর্ঘ হয়, তারপর দুর্বল হয়ে আসে ক্রমে। যেন জ্ঞান হারালো কেউ।

খুব হালকা স্বরে, ফুর্তির মেজাজে নভেরা ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলে, লেট আস গো।

তাজিয়া সাইকেল চালায়, নভেরা পেছনে বসে। ছেলেরা পেছনে পেছনে দৌড়ায়। বাড়ির গার্ড হাঁ করে থাকে। সালাম ঠোকার পর হাত নাবাতে মনে থাকে না।

বাড়িতে এসে নভেরা মাকে জড়িয়ে ধরে। হু হু করে কাঁদে।

মা ব্যস্ত হয়ে বলে, কী হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন?

নভেরা বলে, আই ওন্ট গো ব্যাক। নেভার এগেইন।

কেন কী হলো, এই তো কমাস। এরি মধ্যে কী হলো তোদের?

মা নভেরাকে সোফায় বসায়। তাজিয়া হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নভেরা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, হি ইজ এ ডিফারেন্ট ম্যান দ্যান হি ওয়াজ বিফোর ম্যারেজ।

মা আর তাজিয়া চুপ করে থাকে। ঘরের মধ্যে বাতাস এসে পরদা উড়িয়ে চলে যায়। বাইরে পাখি ডাকে, দূরে গাড়ির হর্ন শোনা যায়। ফেরিঅলার দীর্ঘ ক্লান্ত স্বর ছড়িয়ে পড়ে।

নভেরা বলে, হি ওয়ান্টস টু পজেজ মি। লাইক এ চ্যাটেল।

AMARBOI.COM

চারদিকে পটকা ফুটছে সেই সন্ধ্যা থেকে, আজ শবে বরাত, তাই। বাইরে থেকে ঘুরে এসে রাত সাড়ে দশটায় ফোন করলাম উত্তরায়। জওশন আরা ভাবি ফোন ধরলেন, কুশল বিনিময়ের পর বললাম, মাহবুব ভাই আছেন? ঘুমিয়ে যান নি তো?

ভাবি বললেন, আছে, এখনো ঘুমোয় নি। ধরেন, ডেকে দিচ্ছি।

একটু পর ফোনের ওপাশে মাহবুব ভাইয়ের স্বচ্ছ, সহাস্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সব সময়ই উষ্ণতা মাখানো আর আমন্ত্রণের ভঙ্গি সেই স্বরে। তাকে জানালাম চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম, মুর্তজা বশীরকে নিয়ে সুচরিত চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে বউদির সঙ্গে দেখা করে এসেছি। শুনে তিনি চুপ করে থাকলেন। বুঝলাম সুচরিতের নাম শুনেই বিষণ্ন হয়ে পড়েছেন। দুজনে প্রায় বাল্যবন্ধু, সুচরিত ঢাকায় এলে তার বাড়িতেই উঠতেন। কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে সুচরিত সবকিছু ছেড়ে চলে গেলেন।

অন্য দু-একটা কথা বলার পর বললাম, আপনি নভেরা আহমেদকে চিনতেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু থেমে মাহবুব ভাই সহাস্যে বললেন, চিনব না কেন? খুব ভালো করে চিনি। মানে চিনতাম। আশ্চর্য, এই এত বছর পর তার কথা কেউ জিগ্যেস করল!

আমি বললাম, বলুন দেখি তার সম্বন্ধে যা জানেন।

একি ফোনে বলে শেষ করা যাবে? সে এক মহা উপাখ্যান। আমি তাকে অল্প সময়ের জন্য দেখেছি। কিন্তু সেই সময়ের কথা বলতে গেলেই বিরাট কাহিনী হয়ে যাবে। অবশ্য ওর বিয়ের পর ওকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম।

বিয়ে হয়েছিল তাহলে?

হ্যাঁ, হয়েছিল, কিন্তু বেশিদিন টেকে নি।

কী বিষয় ছিল আপনার গল্পের? আমি কৌতূহলী হয়ে পড়ি।

নভেরার বিয়ে এবং তারপর। কল্পনা মিশিয়ে লেখা অবশ্য। নাম দিয়েছিলাম 'নভেরা,' নিজের নাম ব্যবহার করি নি, ছদ্মনাম দিয়েছিলাম, শফিয়ুল আযম।

আমি বললাম, আশ্চর্য। 'নভেরা' নাম দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?

এমনি। আচ্ছা বিয়ে টেকে নি কেন? তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ছিল বলে?

না, ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে হয়নি। বেশ মেলামেশার পর দুজনের বিয়ে হয়েছিল। ভদ্রলোক সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। শুনেছি প্রায়ই তার সাইকেলের পেছনে বসে ঘুরে বেড়াতো, বিয়ের আগে। কুমিল্লার মতো ছোট শহরে দারুণ হৈ-চৈ পড়েছিল তাকে নিয়ে। কিন্তু সে তার স্বভাবসিদ্ধভাবে কিছু পরোয়া করে নি। এখন মেয়েরা উওম্যান লিবের কথা বলে, নভেরা সেটা প্র্যাকটিস করেছে সেই উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশে, তাও চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়; রাজধানী ঢাকাতে নয়।

আমি বললাম, তার বিয়ে বেশ রহস্যে ঘেরা, কেউ বলে বিয়ে হতে হতে হয় নি, কেউ বলে বিয়ের রাতেই নভেরা উঠে চলে আসে, কারো তথ্য অনুযায়ী বিয়ে টিকেছিল ছয় মাস। আবার কেউ বলে, দুবছর ছিল তার বিবাহিত জীবন। আপনি তার বিয়ে সম্বন্ধে কী জানেন?

বিয়ে বেশিদিন টেকে নি এটা সত্যি। কয়েক মাস ছিল তার বিবাহিত জীবন। আমি গল্পে যে কারণ দেখিয়েছি, আমার অনুমানের ওপর নির্ভর করে, সেটা এরকম: বিয়ের আগে নভেরা যেমন ফ্রি ঘোরাঘুরি করেছে, বিয়ের পরেও তাই করতে চেয়েছে। কিন্তু স্বামী দেয় নি। যদিও দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল নভেরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে। নভেরাকে কন্ট্রোল করতে চেয়েছে তার স্বামী, যেটা সে মেনে নিতে পারে নি।

আমি বললাম, বেশ যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়।

মাহবুব ভাই বললেন, অনেকটা ইবসেনের ডলস হাউসের মতো। নভেরা তার মায়ের দেখাদেখি পুতুল গড়ত, কিন্তু নিজে পুতুল হতে চায় নি। দারুণ ফ্রি স্পিরিটেড আর আধুনিক ছিল চলাফেরায়। সময়ের তুলনায় খুব অগ্রগামী ছিল। শুধু ও কেন, ওর তিন বোনই ছিল অমন। তার ছোট বোন তাজিয়া ছিল আপনার ভাবীর বন্ধু। প্রথম বিয়ের আগে বলেছিল, টাকার জন্য একটা কন্ট্রাক্ট-বিয়ে করব, তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালাক দিয়ে দেবো। সত্যি সত্যি তাই করেছিল সে। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। পরে বিয়ে করেছিল নৃত্য পরিচালক দেবুকে, পিআইএর সাংস্কৃতিক দলের নৃত্য পরিচালক দেবু।

আমি বললাম, নভেরা পড়েছিল আপনার গল্প?

হ্যাঁ। কুমিল্লা থেকে ওর বাবা রিটায়ার করেন ১৯৫০-এর দিকে। ওরা তখন আবার চট্টগ্রামে চলে আসেন। ভদ্রলোক এক্সাইজ সুপার ছিলেন। চট্টগ্রামে এসে প্রথমে ওঠেন বড় জামাই শফিকুল হকের বাড়ি আশকার দিঘির পাড়ে 'গডস্ গিফট'-এ। কুমিল্লা যাওয়ার আগেও সেখানেই থাকতেন। আমাদের যাওয়া-আসা ছিল। আরো অনেকে যেতেন– আহমদুল কবির, সানাউল হক, কলিম শরাফীও যেত মাঝে মাঝে। কলিম বেশি যেত না, স্ত্রীকে ভয় পেতো, বলে তিনি হাসলেন।

আমি বললাম, আপনার গল্পটা সম্বন্ধে কিছু বললেন না।

ও হ্যাঁ। কোথা থেকে কোথায় চলে যাই। নভেরা সম্বন্ধে কিছু কি গুছিয়ে বলা যায়? যা উড়নচণ্ডী ছিল। হ্যাঁ গল্পটা পড়েছিল সে। রুহুল আমিন নিজামীর পত্রিকা 'উদয়ন'-এ বেরিয়েছিল। 'নভেরা' পড়ে লেখককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল। কী করে পাবে তাকে, নিজের নামে তো লিখি নি। শফিয়ুল আযম এই ছদ্মনামে। যাই হোক শুনেছি লেখাটা তার পছন্দ হয়েছিল।

নভেরা যখন প্রথম চট্টগ্রামে আসে কলকাতা থেকে তখন তাকে দেখেন নি?

দেখব না কেন? অনেক দেখেছি, সে তখন কলেজে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু ক্লাসটাস করত না। ঘোরাঘুরি, আড্ডা খুব পছন্দ ছিল। ওর সার্কলের বেশির ভাগই ছিল পুরুষ, তাদের সঙ্গ সে পছন্দ করত, কিন্তু কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। বাইরে ঘুরত, বাড়িতেও তুমুল আড্ডা হতো, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কাকে যে পাত্তা দিত আর কাকে দিত না তা বোঝা মুশকিল ছিল।

আপনি যেতেন তাদের বাসায়?

কেন যাবো না? চট্টগ্রামে সব যুবক এমনকি যারা একটু বয়স্ক সবাই যেত। 'গডস্ গিফট'-এর দারুণ আকর্ষণ ছিল তখন চট্টগ্রামের সমাজের একটা অংশের কাছে। পুরো পরিবারটাই এনলাইটেন্ড ছিল, বাবা-মা, বোন সব। তবে নভেরাই ছিল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। ম্যাগনেটিক চার্ম বলতে যা বোঝায়। আর সুন্দরী তো ছিলই। সাজতে পছন্দ করত, যার জন্য তাকে আরো সুন্দর লাগত। আধুনিক ছিল, উগ্র বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য নয়। শাড়িই পরত, কখনো ঘটিহাতা, কখনো-বা স্লিভলেস ব্লাউজ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

আমি বললাম, শুনেছি নাচের শখ ছিল তার। জানেন কিছু? আপনি তো সেই সময় চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যমণি।

কেন জানবো না? নাচ নিয়েই তো ওকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হলো।

আমি বললাম, শুনবো একদিন। আজ থাক। আপনার নিশ্চয়ই ঘুম পাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, না ঘুম পাচ্ছে না। এই এখনো নভেরার নাম শুনলে ঘুম পালিয়ে যায়। হ্যাঁ, আপনার ভাবি পাশেই আছেন। শুনছে সব। আপনি হঠাৎ 'নভেরা'র ব্যাপারে কৌতূহলী হলেন কেন? অনেক বছর পর তার নাম বলল কেউ।

আমি বললাম, কৌতূহলটা পুরনো, এখন সেটা বেড়েছে।

বসা যাবে একদিন। বলব সব, যা মনে আছে। ওর সম্বন্ধে আর একজন বেশ বলতে পারবেন, প্রবীণ বামপন্থী রাজনীতিবিদ বজলুস সাত্তার, চট্টগ্রামে আছেন, বেশ বয়স হয়েছে, আশির ওপর। তিনি নভেরাকে কলকাতা থেকে চেনেন। তার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। আর বার্মায়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন কমরুদ্দিন আহমদ, তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে নভেরা সম্বন্ধে লিখেছেন।

কোন্ প্রসঙ্গে লিখেছেন? আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি।

নভেরা রেঙ্গুনে গিয়েছিল, বুদ্ধের মূর্তি দেখতে। সেই সময় দেখা হয়েছিল। আর তাকে যে একবার দেখেছে সে কি ভুলে যেতে পারে? প্রায় একটা কিংবদন্তির চরিত্র। কমরুদ্দিন আহমদ নভেরা চরিত্রের এমন একটা দিক তুলে ধরেছেন যা অনেকের জানা নেই।

আমি বললাম, পড়তে হবে তার বই।

"নভেরা রেঙ্গুন এসেছে প্রায় তিন সপ্তাহ, এর মধ্যে আমার সঙ্গে তার ভালো করে কথাবার্তা হয়নি। কারণ এদিকে আমি যে কেবল ব্যস্ত ছিলাম তাই নয়, আমার মনের ভারসাম্যও ঠিক ছিল কিনা আমি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলাম না। অফিসের সুপারিন্টেনডেন্ট, যার অফিসে কোনো কাজই ছিল না, তার ওপর ভার দিয়েছিলাম সকালে 'স্টাফকারে' উডওয়ার্কস যেসব জায়গায় হয়, সেসব স্থানে নভেরাকে নিয়ে যেতে এবং কাজ শেষ হলে বাসায় তাকে পৌঁছে দিতে। আমি একদিন জানতে পারলাম, নভেরা একটি কাঠের শিল্প-কারখানায় নিজেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কী একটা বানাবার জন্যে।

আমি খুব দেরিতে নিচে নামি 'ব্রেকফাস্ট' করার জন্যে। প্রতিদিনই দেখি নভেরা বেরিয়ে গেছে। বোধহয় আগস্ট মাসের মাঝামাঝি একদিন দেখলাম, সে 'ব্রেকফাস্ট' না করে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে বলল, 'আপনি এত দেরিতে 'ব্রেকফাস্ট' করেন? আমি তো ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গেছি। চলুন খাবেন। আমি নিজেই আজ আপনার 'ব্রেকফাস্ট' তৈরি করেছি। আমি তো তার কথা শুনে অবাক। কেবল বললাম– "তুমি তো কোনোদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করো নি। তাই আমি কেমন করে জানবো তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছ।"

"বার্মার কাজতো আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হয়ত সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমার শিক্ষা সমাপ্ত হবে। তাই ভাবছি, এ কটা দিন আমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করব।" আরো বলল, আগামীকাল থেকে তাকে পার্টিতে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে; যার ফলে বার্মিজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের শিল্পকলা, বিশেষ করে ভাস্কর্য সম্বন্ধে আলাপ করার সুযোগ হয়।

পরের দিন ছিল ভারতীয় ইম্পেরিয়েল ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজারের বাড়িতে পার্টি। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ভজন ও কীর্তন গানের জন্যে প্রসিদ্ধ। অনেক দিন আমি তাঁর গান শোনার জন্যে বেশ রাত পর্যন্ত তাঁদের বাড়িতে থেকেছি। পরের দিন সন্ধ্যায় নভেরা বেরিয়ে এল সদ্যস্নাতা লম্বা চুলের অধিকারিণী, কালো শাড়ি ও ব্লাউজ, গলায় কালো রঙের রুদ্রাক্ষের মতো কী একটা পাথরের মালা। চোখে কাজল। আর বিশেষ কোনো প্রসাধন ব্যবহার করা থেকে সে আজ বিরত রয়েছে। খুব ফরসা গায়ের রঙ। তাই প্রতিমার মতো দেখাচ্ছিলো। আমিই যে কেবল তার সাজগোজ দেখে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম, তাই নয়, আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম তখন সব লোকের দৃষ্টিই পড়ল তার ওপর। ইতালীয় রাষ্ট্রদূত আমাকে বললেন, মহিলা কে? আমি বললাম– আমার দেশের একজন 'স্কালপট্রেস'। বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী জুলিয়েট আমাকে জিগ্যেস করলেন, ইংরেজি জানে কিনা। আমি বললাম, ইংরেজি ও ফরাসি ভালোই জানে। তাছাড়া আরো কন্টিনেন্টের কিছু কিছু ভাষা অল্প-বিস্তর জানে। তার ফলে, নভেরাকে সবাই এমনভাবে ঘিরে ধরল যে, আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন মনে করতে লাগলাম। ভাবলাম একে নিয়ে আর কোনো অভ্যর্থনা বা নৈশভোজে বা 'সাপার ডান্সে' যাওয়া হবে না। আমার নিজের 'ইম্পরটেন্স' কেবল সবার কাছে যে কমে গেল তাই নয়, আমি নিজেই যেন ছোট হয়ে গেলাম আমার নিজের কাছে।

পার্টি যখন প্রায় শেষ, তখন অনেকেই তাঁদের বাড়ি যাবার জন্যে নভেরাকে নিমন্ত্রণ করল। আর নভেরা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল "I am completely at his disposal," আমি পড়লাম বিপদে। কেবল বললাম, আর এক সপ্তাহ আছে এখানে। তাই আপনাদের সবাইকে খুশি করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, তা করব। অর্থাৎ নভেরাকে যাতে আপনারা সবাই আবার দেখতে পারেন, তার জন্যে তার বার্মা আসা উপলক্ষে একটি বড় অভ্যর্থনার আয়োজন করব। ও আর সেটা হবে 'শ্যামপেন পার্টি' যা বার্মায় খুব একটা হয় না। সবাই খুশি। রাত নটার দিকে বাড়ি ফিরলাম। বেয়ারাকে টেবিল সাজাতে বললাম। যার যার রুমে গেলাম কাপড় বদলাতে। আধঘণ্টার মধ্যে বেয়ারা 'ডিনার বেল' বাজালো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকলাম। সুপ দুরকম। আমার জন্যে লবণহীন এসপারাগাস আর নভেরার জন্যে মুরগির সুপ। তারপর আমার জন্যে এল সিদ্ধ কাঁচা তরকারি। তার জন্যে 'বিফস্টিক তাও আবার আধপোড়া। তারপর আমার লবণ ছাড়া মুরগির শিক কাবাব আর তার জন্যে বিন-পোলাও এবং খাশি আর মুরগির কাটলেট। তার জন্যে এল পুডিং আর আমার জন্যে 'স্কিমড মিল্ক' অর্থাৎ ননীতোলা দুধের একটু ছানা। ভোজন শেষে নভেরা জিগ্যেস করল, আপনার খাবারের ওপর কী কী বিধি-নিষেধ? আমি বললাম, ১৯৫৮ সালে ১২ এপ্রিল থেকে "No salt, no fat, no red meat, no egg, no smoking" অর্থাৎ লবণ, চর্বিযুক্ত খাদ্য, গরু, খাশির মাংস, ডিম, এমনকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিগারেট পর্যন্ত খাওয়া নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এখন নিরামিষ, বড় জোর ছোট মুরগির মাংস ও মাছ। তা-ই আবার কোনোদিন বন্ধ হয়ে যাবে বলতে পারি না। সে তখন যেন স্বগতোক্তি করল, "আমি ভাবছিলাম, আমি নিজে আপনাকে রান্না করে খাওয়াবো। তা আর হলো না।"

তারপর নানা আলোচনার মধ্যে জানতে পেলাম, তার পিতাকে আমি জানতাম। তিনি ছিলেন 'একসাইজ ইনসপেক্টর'। নভেরার বড় বোন কুমকুম হককেও আমি জানি, আমার ভাগ্নি বীণার (সার্জেন ডাক্তার আসিরুদ্দীন সাহেবের স্ত্রী) সূত্রে। এসব জানার পর, স্কালপট্রেস হিসেবে যতটা দূরত্ব অনুভব করছিলাম তা কতটা দূর হলো। কথায় কথায় বলল যে, তার কোনো বিপদ এলে আগেই সে জানতে পারে। তারপরেই বলল যে, কেন যেন তার মনে হচ্ছে- তার একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আমি বললাম, তার ভয়ের কারণ নেই। সারারাত দারোয়ানরা পাহারা দেয়। আমার অন্যান্য ভৃত্যকে বলে দেওয়া হয়েছে বারান্দায় ঘুমাবার জন্যে। কথাগুলো বলার সময় তার চোখের দৃষ্টিতে যেন উদাসভাব দেখতে পাচ্ছিলাম।

পরের দিন রাত দুটোর পর, আমি যখন ঘুমে অচেতন তখন হঠাৎ আমার দরজায় খুব জোরে ধাক্কার শব্দ পেয়ে 'নাইট গাউনটা' গায়ে দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলে দেখি নভেরা ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং সে নাইটিজের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে। আমি তাকে ঘরে নিয়ে গেলাম। তার গায়ে ড্রেসিং গাউনটা তুলে দিলাম। সে একটু সুস্থ হলে জিগ্যেস করলাম- কী হয়েছে? বলল, ঘরে ডাকাত ঢোকার চেষ্টা করেছিল। আমাকে বলল- পুলিশ ডাকতে। আমি দারোয়ানদের ডাকলাম। ডিউটিতে যে দারোয়ান ছিল, সে বলল, খাবার ঘরে সে প্লেট ভাঙার শব্দ শুনে বাবুর্চিকে ডেকে তোলে ঘরটা দেখার জন্যে। এরই মধ্যে সে নভেরার আর্ত চিৎকার শুনে সবাইকে ডেকে তুলেছে।

আমি সবাইকে নিয়ে নভেরার ঘরে গিয়ে দেখি, কোনো একটা ভারী জিনিস দিয়ে কাচের দরজা ভেঙে ফেলেছে- ঠিক তার ড্রেসিং টেবিলের পেছনে। নভেরা সাধারণত শোবার আগে ঐ টেবিলের দেরাজে তার জুয়েলারি রাখে।

এরপর নভেরা খানিকটা মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে লাগল। উপায়ান্তর না-দেখে তার বন্ধু ও সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ আলীকে তার করে দিলাম। সৈয়দ মোহাম্মদ আলী দুদিন পরেই রেঙ্গুন এসে গেল। আমি যেন নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

সৈয়দ মোহাম্মদ আলী আমাকে বলল যে, নভেরাকে পরের দিনই ঢাকা নিয়ে যাবে। আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং তার যাবার আয়োজন করে দিলাম। 'শ্যামপেন পার্টির' টাকাটা বেঁচে গেল। যাবার দিন গাড়িতে তার এবং সৈয়দ মোহাম্মদ আলীর লাগেজ তুলছে। আমরা তখনো 'ব্রেকফাস্ট' টেবিলে। হঠাৎ বলল যে পিআইএ প্লেন তো আজ যাচ্ছে না। আমি সেক্রেটারিকে এয়ারপোর্টে টেলিফোন করতে বললাম। খবর পেলাম যে, বিমান তৈরি। আমার অতিথির জন্যেই কেবল দেরি করছে। বললাম, না তোমার 'প্রিমনিশন' বা পূর্বলক্ষণ সব সময়ই ঠিক হয় না। ওরা চলে গেল; আমার গাড়ি এল বারান্দায়। যতক্ষণ না ড্রাইভার অফিসে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর দিল যে, বিমান ভালয় ভালয় ছেড়ে গেছে, আমার মনে খটকা লেগেই ছিল। সারাদিন অফিসে কাজ করে বাসায় এসে কাপড় ছেড়ে গলফ খেলতে বেরিয়ে গেলাম। সন্ধ্যার বেশ কিছু পরই বাসায় ফিরলাম। উপরে উঠে বাথরুমে ঢুকবো– এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কথা বলছে নভেরা– রেঙ্গুন স্ট্র্যান্ড হোটেল থেকে। আমি তো হতবাক। শুনলাম, বিমান প্রায় অর্ধেক পথ যাবার আগেই প্লেনে গোলমাল আরম্ভ হয়। ফলে, ক্যাপ্টেন প্লেন নিয়ে বার্মায় ফিরে আসে এবং তারা দুজনই পিআইএ-র অতিথি হয়ে স্ট্র্যান্ড হোটেলে আছে। বিমান খুব সকালেই ছেড়ে যাবে। টেলিফোনে কথা শেষ হলে, ভাবলাম, মেয়েটি কি 'পজেজড'? আমরা যাকে বলি– 'আছরে' পাওয়া। একদিকে আমার বহুদিনের বিশ্বাস যে ওসব কুসংস্কার, আবার এ মেয়েটির অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী। অনেক ভাবনার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল হতেই আবার টেলিফোন। এবার সৈয়দ মোহাম্মদ আলীর কাছ থেকে। বলল, সকালের দিকে রুমে হ্যান্ডব্যাগে নভেরা জুয়েলারি রেখে বাথরুমে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে হ্যান্ডব্যাগ খোলা। গহনাপত্র সব কে চুরি করে নিয়ে গেছে। অলঙ্কারের জন্যে যতটা দুঃখ হয় নি, তার চেয়ে বেশি দুঃখ ঢাকার কাস্টমসকে সে কী কৈফিয়ত দেবে। আমি বললাম, তার জন্যে ওকে ভাবতে নিষেধ করে দিন। আমি কাস্টমসকে 'ক্যাবল' করে দিচ্ছি। আর স্ট্র্যান্ড হোটেলের ম্যানেজারকে টেলিফোনে বলে দিলাম, অলঙ্কার হারানোর ব্যাপারে একটা সারটিফিকেট দিয়ে দিতে। তিনিও আমার কথা শুনলেন। ঘণ্টাখানেক পরে যখন বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা, তখন নভেরা বিমানবন্দর থেকে জানালো যে, তার অলঙ্কারগুলো পাওয়া গেছে। কাজেই আর 'ক্যাবল' করার দরকার নেই। অদ্ভুত পরিস্থিতি আর অদ্ভুত ঐ মেয়েটি। বিমান যেন আবার ফিরে না আসে তার জন্যে সৃষ্টিকর্তার সাহায্য চাইলাম। যাক সেদিন আর প্লেন ফিরে আসে নি। ভালয় ভালয় সব মিটে গেছে।"

কমরুদ্দিন আহমদ : বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী, ১৯৭৯

AMARBOI.COM

সন্ধ্যায় দাওয়াত ছিল এনায়েত বাজারে খালু সুলতান খানের বাসায়। 'সীমান্ত' অফিস থেকে হেঁটে গেল মাহবুব। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনই বেশি, প্রায় সবাই পরিচিত। শুধু একজনকে দেখে চমকে উঠল সে। অপরিচিত বলে নয়, অন্যদের চেয়ে বেশ আলাদা। একটি মেয়ে, বয়স আঠারো উনিশ হবে, ফরসা রং, আয়তনেত্র, মুখে প্রসাধনী যত্ন করে লাগানো, শাড়িই পরেছে, তবে খোলামেলাভাবে, নিজেকে ঢেকে রাখার তাগিদে নয়। কথা বলছে কয়েকটি যুবকের সঙ্গে, তারা তাকে ঘিরে রেখেছে।

খালুকে জিগ্যেস করতে তিনি বললেন, নভেরা। ওর নাম নভেরা। ওর বাবা কলকাতা থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় থাকতে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আয় তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

নভেরাকে শুধু নাম বলা নয়, মামা আমার প্রশংসাও করলেন। আমি যুবকদের ভিড়ে বসে পড়লাম। নভেরার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম আগ্রহ নিয়ে। দেখলাম সে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। আমি যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সে সবের নাম করলাম। চট্টগ্রামের জনপ্রিয় সংস্কৃতিসেবীদের কথাও বললাম। তাতেও লাভ হলো না। মনে হলো এইসব বিষয়ে তার আগ্রহ নেই, কেমন যেন উড়ু উড়ু ভাব। ইনটেলেকচুয়ালি শ্যালো।

দাওয়াত শেষে বেশ অতৃপ্তি নিয়েই ফিরল মাহবুব। তার পৌরুষে আঘাত লেগেছে, নিজের সম্বন্ধে, নিজের কৃতিত্ব নিয়ে যে গর্ব ছিল অর্বাচীন মেয়েটা তুড়ি দিয়ে যেন সব উড়িয়ে দিল। একটা পিন নিয়ে ফুটিয়ে দিল ইগোর ফানুস। মনে জেদ চেপে থাকল। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে তার অবস্থান, এক ডাকে সবাই চেনে, তার সাহচর্য পেলে ধন্য হয়। অথচ একটা মেয়ে, যার সৌন্দর্য ছাড়া কিছু নেই, সে পাত্তাই দিল না। অপমানবোধ সমস্ত সন্ধ্যাটাই মাটি করে দিল।

একদিন খালুর সঙ্গে দেখা, রেলওয়ে মেনস স্টেডিয়ামে ওখানে দল বেঁধে খাচ্ছি আমরা। খালুকে বললাম, নভেরাকে নিয়ে আসুন আমাদের অর্গানাইজেশনে।

খালু বললেন, কোনটায়? তোমার তো একাধিক অর্গানাইজেশন।

খালু ঠিকই বলেছেন। 'সীমান্ত' পত্রিকা অফিসে তখন পত্রিকার অফিস ছাড়াও 'সংস্কৃতি বৈঠক' আর 'নজরুলজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি'র অফিস। যত প্রগতিশীল সংগঠন সবার ঠিকানা ছিল আমাদের 'সীমান্ত' পত্রিকা অফিস।

আপনি চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বইটা পড়বেন। সেই ১৯৪৭-৪৮-এর দিকে চট্টগ্রামের কালচারাল লাইফ ঢাকার চেয়েও সমৃদ্ধ ছিল। দেশ বিভাগের আগে আমরা প্রতিষ্ঠা করি কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক অঙ্গ, ফ্যাসি-বিরোধী 'শিল্পী ও সাহিত্য সংঘ'। সেই ১৯৩৬ সালে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়। কম্যুনিস্ট পার্টির কনফারেন্সের পর আমরা প্রতিষ্ঠা করি 'প্রগতি সাহিত্য ও শিল্পী সংঘ'। ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন মুলকরাজ আনন্দ সভাপতি, আর খাজা আহমদ আব্বাস, কৃষণ চন্দর প্রমুখ সাহিত্যিকরা সদস্য ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরোধের জন্যে 'শান্তি কমিটি' গঠন করি আমরা। 'শান্তি কমিটি' গ্রামে গ্রামে সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সভা করেছে, মিছিল করেছে। আমাদের সেইসব কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসেছেন অনন্ত সিংহ, গণেশ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল এইসব বিপ্লবী আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নেতারা। শান্তি কমিটির সভাপতি ছিলেন রফিউদ্দিন সিদ্দিকী আর আমি ছিলাম সেক্রেটারি জেনারেল। চট্টগ্রামে এমন কোনো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল না, যেখানে আমি যুক্ত নই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান হবার পরও কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ অব্যাহত ছিল। নাজিমুদ্দিন সরকার কমরেড মুজাফফর আহমদকে ডেকে আনেন, তিনি জে এম সেন হলে বক্তৃতা দেন। কিন্তু 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়' ঘোষণার পর সরকার কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লেগে গেল। ফজলুল কাদেরের নেতৃত্বে দখল হলো আন্দরকিল্লার কম্যুনিস্ট পার্টি অফিস। ছাত্রলীগের নেতা সুলতান আহমদ, পরে ব্যারিস্টার হয়েছিল, দখল করে নেয় কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্রদল, ছাত্র ফেডারেশনের সিরাজউদ্দৌলা রোডের অফিস। এরপর ১৯৪৮ সালে সরকারিভাবে কম্যুনিস্ট পার্টিই নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন আর ফর্মাল অর্গানাইজেশন না করে 'সংস্কৃতি বৈঠক' নাম দিয়ে সাংস্কৃতিক কাজ চালিয়ে যাবার সংকল্প নিলাম। প্রগতিশীল আন্দোলনের কর্মীরা যেন একত্রে থাকে সেটাই ছিল উদ্দেশ্য। 'সংস্কৃতি বৈঠক'-এর আসর হতো কখনো কখনো আমার মামা সগীর চৌধুরীর এনায়েত বাজারের বাড়িতে, কখনো শওকত ওসমান, ননী সেনগুপ্ত, গোপাল বিশ্বাস অথবা কবি সানাউল হকের বাসায়। পরে নিয়মিত বৈঠক হতো 'সীমান্ত' পত্রিকা অফিসে। আমাদের আসরে আসতেন কবি সানাউল হক, প্রবন্ধকার অধ্যাপক মোতাহার হোসেন চৌধুরী, চট্টগ্রাম কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সচিব ননী সেনগুপ্ত, বিজিত কুমার দত্ত, সাইদুল হাসান, ওহিদুল আলম, সুচরিত চৌধুরী। গল্প পড়া হতো। কবিতা আবৃত্তি করত সদস্যরা। মুড়ি আর বেলা বিস্কিট দিয়ে চা খাওয়া হতো। সকাল থেকে কত যে চায়ের কাপ আসত যেত হিসেব ছিল না।

মেয়েরা? খুব কম ছিল তারা। রোকেয়া কবির, ফরিদা হাসান, কামেলা শরাফী এরা আসতেন। তিনজনেই কলকাতা থেকে এসেছিলেন, দেশভাগের পর। বেশ রুচিশীল, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

একদিন 'সংস্কৃতি বৈঠক'-এ নভেরা এসে হাজির। সঙ্গে খালু সুলতান খান। তখন কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে। নভেরাকে দেখে কবিতা আবৃত্তি বন্ধ করে তাকিয়ে থাকল আবৃত্তিকার, শ্রোতারা পেছন ফিরে তাকালো বারবার। গুঞ্জন উঠল– নভেরা, নভেরা এসেছে।

হ্যাঁ, তাকে অনেকেই আগে থেকে চিনত, পরিচয় না থাকলেও দূর থেকে দেখেছে, শুনেছে তার কথা। চট্টগ্রামে আসার পর থেকেই নভেরা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তার ফ্রি মিক্সিং, খোলামেলা চলাফেরার জন্য। আর তার সৌন্দর্যের খ্যাতি তো ছিলই।

নভেরার চেয়ে ফরিদা হাসান আর রোকেয়া কবির সিনিয়র ছিলেন। তারা তার বেপরোয়া ভাব আর অত্যাধুনিক সাজগোজ দেখে একটু রুষ্ট হলেন বলে মনে হলো। যাই হোক আমি খুশি হলাম, শেষপর্যন্ত নভেরা আমাদের বৈঠকে এল। আমাকে যে প্রথম দিন পাত্তা দেয় নি সেই অপমান বোধ দূর হয়ে গেল।

বুঝলেন পরে আবিষ্কার করেছি ওটা ওর স্বভাব, কাকে পাত্তা দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে না এসব বিষয়ে সে মোটেও সচেতন না। সচেতন হয়ে সে কোনো সম্পর্ক গড়ে তোলে নি। পরে শুনেছি দেশে-বিদেশে একাই থাকতে হয়েছে তাকে। নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছাতেই। যাক সে কথা, বৈঠকে নভেরার কথা বলছিলাম। কবিতা আবৃত্তি শুনল, গল্পও পড়া হলো, তারপর চা-মুড়ি, বিস্কিট খাওয়া। চুপচাপ বসে ছিল। দুএকটা কথা বলছিল খালুর সঙ্গে, আমিও দুএকবার গিয়ে নানা ছুতোয় কথা বলে এলাম।

খালুর সঙ্গেই চলে গেল সে। আমি রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললাম, আবার আসবেন। নভেরা মাথা নেড়ে চলে গেল।

ঘরে ফিরতেই ছেলেরা একসঙ্গে বলে উঠল, চিজটা কে আনল?

মাহবুব বলল, কেন আনতে যাবে কেন? নিজেই এসেছে।

না, না, তার নিজের বাসায় জবর মহফিল বসায়, সেটা ফেলে এখানে আসতে যাবে কেন? বড়লোকের পোলাগুলো তাকে ঘিরে রাখে সব সময়, গাড়িতে নিয়ে হাওয়া খেতে যায়, রেস্তরাঁয় খাওয়ায়। সেসব ফেলে এখানে কবিতা আবৃত্তি শুনতে আসবে কেন?

মাহবুব বলল, হয়ত এই দিকে আগ্রহ আছে। তাই এসেছে।

একজন বলল, মনে হয় না। আগ্রহ থাকলে অনেক আগেই আসত। তাছাড়া এমন আপস্টার্ট ধরনের মেয়ের প্রগতিশীল সংস্কৃতিতে আগ্রহ থাকতে পারে না।

মাহবুব হেসে বলল, তাহলে হয়ত দেখতে এসেছে কৌতূহল নিয়ে। কৌতূহল থেকেও তো আগ্রহ হতে পারে।

ফরিদা হাসান আর রোকেয়া কবির হট্টগোলের মধ্যে উঠে চলে গেলেন। মাহবুব তাদেরকেও পৌঁছে দেবার জন্য রাস্তা পর্যন্ত গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর একটা রিকশা পাওয়া গেল তাদের জন্য।

বুঝলেন, তখন চট্টগ্রামে সবে রিকশা বেরিয়েছে, আগে ছিল সবই ঘোড়ার গাড়ি। একদিন তো রেষারেষির ফলে ঘোড়ার সহিস আর রিকশাঅলাদের মধ্যে সংঘর্ষই হয়ে গেল। যাক, সেই সমস্যাটা ঐভাবে শেষ হলো।

নভেরা এরপর আর দুদিন এসেছিল 'সংস্কৃতি বৈঠক'-এর আসরে। চুপচাপ বসে থাকত পেছনে। বেশ সাজগোজ করে আসত, তাকে কখনো সাজগোজ ছাড়া দেখি নি। প্রথমদিকে বেশ উগ্রভাবে সাজতো, পরে অনেকটা কমে এসেছিল। কিন্তু রূপচর্চায় সব সময়ই সচেতন ছিল। বাঙালিত্ব ছিল, কেননা শাড়ি পরত সব সময়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে বালা তবে ঐসবের মধ্যেও এমন একটা আধুনিকতা ছিল যা তখন চট্টগ্রামে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে ছিল না। একটা কথা, নভেরা আসার পর থেকে আমাদের বৈঠকে আরো অনেকে আসতে শুরু করল। কিছুদিন পর এলেন আহমদুল কবির আর কবীর চৌধুরী। দুজনেই সরকারি চাকরি করেন। তাদের সান্নিধ্য লাভের জন্যও অনেক ব্যবসায়ী আসতে শুরু করল। যার আকর্ষণেই হোক না কেন আমাদের বৈঠকে লোকের সমাগম বেড়ে গেল। আমি নভেরাদের বাড়িতে গিয়েছি কয়েকবার, লেফটিস্ট লিটারেচার নিয়ে। দেখতাম সব সময় লোকজন ঘিরে রেখেছে তাকে। তার সমবয়সী, এমনকি সিনিয়র কয়েকজনকেও দেখতাম সেখানে। অবশ্য ওদের বাড়ির সবাই ছিল মিশুক আর গুণী। ওর বড় বোন কুমুম তো কলকাতা থাকতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। বাবা-মা ছিলেন বেশ উদার মানসিকতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ। আশকার দিঘির পাড়ে ওদের বাড়িটা সকাল-সন্ধ্যা গমগম করত লোকের কণ্ঠস্বরে। 'গডস্ গিফ্‌ট' বাড়িটায় কুমুম হক ছিল, পরে তার পাশে বাড়ি তৈরি করেন তাদের বাবা। দুটোরই সাদা রঙ। যেন পাশাপাশি দুটো হাঁস।

পুস্তিকাগুলো হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল নভেরা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বইগুলো কিসের ওপর?

আমি তার পাশের যুবকদের দেখে নিয়ে হেসে বললাম, প্রগ্রেসিভ কিছু লিটারেচার। 'সংস্কৃতি বৈঠক'-এর সদস্যদের পড়ার জন্য আমরা দিয়ে থাকি।

আমি তো সদস্য নই। নভেরা বলল।

তাতে কী। পড়তে নিষেধ নেই।

পড়ে যদি বুঝতে না পারি?

নভেরার কথা শুনে হেসে উঠল পাশের ছেলেরা। তাদের হাতে মাউথ অর্গান, কারো হাতে ট্রফি, কেউবা গাড়ির চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে শিস দিচ্ছে।

মাহবুব নভেরার হাতে পুস্তিকাগুলো দিয়ে বলল, বুঝতে পারবেন। এমন কঠিন কিছু নয়। সবার বোঝার জন্যই লেখা হয়েছে।

বেশ, পড়ে দেখব। নভেরা বইগুলো পাশে রেখে দিল। তাকে দেখে খুব উৎসাহী মনে হলো না।

এরপর অনেক দিন নভেরা আসে নি 'সংস্কৃতি বৈঠক'-এ। দুষ্টু ছেলেদের কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেছে, কী হলো? আগ্রহ শেষ?

আর একজন বলল, বুঝলা না, জমছে না এখানে। তার পার্টিই আলাদা। আমি চুপ করে থাকলাম। এইসব বিদ্রূপের আমিই লক্ষ্য।

বেশ কিছুদিন পর বজলুস সাত্তার এলেন 'সীমান্ত' অফিসে। মাহবুব আর সুচরিত তখন লিখতে ব্যস্ত। উদয়ন চৌধুরীও ছিল অন্য ঘরে।

মাহবুব বলল, কী খবর খালু? হঠাৎ।

খালু বললেন, হ্যাঁ, হঠাৎই। আমি তো আর তোমাদের মতো প্রতিদিন অফিস করতে পারি না।

তাহলে? মাহবুব সপ্রশ্ন তাকালো।

নভেরা। বলে তিনি থামলেন।

শুনে মাহবুব গম্ভীর স্বরে বলল, না, নভেরার কোনো খবর নেই আমাদের কাছে। সে আর আসে না।

বজলুস সাত্তার বললেন, তার কথাই তো বলতে এসেছি। সে নাচতে চায়।

নভেরা নাচতে চায়? কোথায়? বলে মাহবুব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

তোমরা নজরুলজয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছ শুনতে পেয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে বলল।

নভেরা নাচতে জানে? সুচরিত তাকালো।

নিশ্চয়ই জানে, না হলে নাচতে চাইবে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহবুব সোৎসাহে বলল, বেশ তো নাচবে। তাকে আসতে বলুন। আলাপ করে দেখি কোন্ বিষয়ে নাচবে, কী গানের ওপর ভিত্তি করে। আসতে বলুন তাকে।

তার পরদিনই নভেরা এল। একাই। আমি আর সুচরিত বসেছিলাম। আমরা তাকে খুব ইমপ্রেস করার চেষ্টা করলাম, নজরুলজয়ন্তী বিষয়ে যতটা নয়, আমাদের ভূমিকা, কৃতিত্ব নিয়ে তার চেয়ে বেশি। সে সব শুনে বলল, আমি নিজের মতো নাচবো।

আমি থমকে বললাম, নিজের মতো নাচবেন? সে কী করে হয়? নজরুলজয়ন্তীতে, নজরুলসঙ্গীত দিয়েই নাচতে হবে। তারই সঙ্গীতের বিষয় কেন্দ্র করে।

সেটা ঠিক আছে। তবে গতানুগতিক যেভাবে নজরুলসঙ্গীত নিয়ে নাচ হয় তেমন নয়।

শুনে সুচরিত আর আমার দুজনের মুখ অনেকক্ষণ হা হয়ে থাকে।

সুচরিত বলে, আপনি নাচ জানেন? আগে নেচেছেন?

নভেরা বলল, না, আগে নাচি নি।

আমি বললাম, নাচ শিখেছেন কারো কাছে?

নভেরা বলল, না।

তাহলে নিজের মতো নাচবেন কী করে? সুচরিত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আমি বললাম, নাচের জন্য আমাদের বেশ কয়েকজন ওস্তাদ আছেন– চুনী সেন, রুনু বিশ্বাস, অনিল মিত্র। এরা আপনাকে নাচ কম্পোজের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

নভেরা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, না, আমি একাই নাচ কমপোজ করতে পারব।

তাকে এ ব্যাপারে আর না ঘাঁটিয়ে আমি বললাম, বেশ তাই হবে। কিন্তু মিউজিক? মিউজিকের ডিরেকশন তো লাগবে। এই যে সুচরিত চৌধুরী। আমাদের মিউজিক ডিরেক্টর। সে আপনাকে সাহায্য করবে।

নভেরা বলল, লাগবে না। মিউজিকও আমিই ডিরেকশন দেবো।

বুঝলেন অসম্ভব জেদি মেয়ে, দারুণ কনফিডেন্স ছিল নিজের ওপর।

ওর কথামতোই হলো সবকিছু। রিহার্সাল শুরু হলো প্রথমে বজলুস সাত্তারের বাড়িতে, রহমতগঞ্জে। তারপর 'সীমান্ত' পত্রিকা অফিসে যেখানে নজরুলজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির অফিস। ওটা ছিল যত শিক্ষিত বেকার, সবার মেস। ঐখানেই অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন আসার পর নাইট কলেজ খুলি আমরা, বেকারদের সাহায্যে।

যাক যা বলছিলাম, কয়েকদিন রিহার্সালের পর সুচরিত বলল, মনে হচ্ছে মিউজিক সম্বন্ধে ভালো ধারণা আছে।

রুনু বিশ্বাস বলল, নাচ সম্বন্ধেও। অনেক কিছুই জানে, কিন্তু বলছে না।

মাহবুব ভাই বললেন, পরে শুনেছি সে কলকাতায় সাধনা বোসের কাছে নাচ শিখেছে। ঐ একটা গুণ তার ছিল। প্রচার করত না। নিজের গুণ নিয়ে গর্ব ছিল না। তাকে প্রথমে দেখে যেমন মনে হয় সে তেমন ছিল না। সে যে কনট্রোভার্সিয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে এ নিয়ে তার মাথাব্যথাও ছিল না। অন্যেরা কী ভাবছে বা ভাববে এ সম্বন্ধে সে ছিল নির্বিকার।

সেন্ট প্ল্যাসিড স্কুলে নজরুলজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হলো। এবারের প্রধান আকর্ষণ নভেরার নাচ। 'বলো বীর চির উন্নত মম শির' অথবা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' এই গানটির সঙ্গে নেচেছিল নভেরা। নাচে যেভাবে অঙ্গভঙ্গি, হাত আর পায়ের সঞ্চালন করেছিল সেখানে ছিল অনেক অভিনবত্ব। বেশ এক্সপেরিমেন্টাল। পরে মার্থা গ্রাহামের নাচ দেখে আমার নভেরার সেই নাচের কথা মনে হয়েছে। মিউজিকেও ছিল নতুনত্ব, নজরুলসঙ্গীতই, কিন্তু তার মধ্যে আলাদা একটা মাত্রা যোগ করেছিল। কেউ কেউ সেই ইনোভেশনের সমালোচনা করেছিল। বলেছিল বেশি ওয়েস্টার্নাইজড।

ওটাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য ভিত্তিটা দেশী, তার ওপর আধুনিক একটা আবরণ। নিজস্ব কিছু জুড়ে দেওয়া। যেমন চুল পিছনে ছড়িয়ে দিত, কিন্তু কাটত কাঁধ পর্যন্ত, বব-করা অনেকটা। শাড়িই পরত কিন্তু তার সঙ্গে থাকত স্লিভলেস্ ব্লাউজ। বেঁটে ছিল, তাই পরত হাই হিল। কপালে এঁকে নিত সন্ন্যাসিনীর মতো লম্বা টিপ।

পরে ১৯৫৮ সালে বিদেশ থেকে ফেরার পর যখন ওকে দেখি তখন পিঠময় লম্বা চুল দেখেছি। বিদেশ থেকে ফিরে সে আরো বেশি খাঁজালি হয়ে গিয়েছিল। বেশ বিপরীত ব্যাপার মনে হচ্ছে না?

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। 'সংস্কৃতি বৈঠক'-এর আগে আমরা প্রতিষ্ঠা করি 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ'। আইপিটিএ বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রগতিশীল নাট্যকর্মীরা এই নতুন সংগঠনের মাধ্যমেই চট্টগ্রামে পুনঃস্থ করে 'ছেঁড়া তার,' 'দুঃখীর ঈমান,' 'পথিক'। কলিম শরাফী, কামেলা শরাফী দুজনেই ঐসব নাটকে অভিনয় করেছে। না, নভেরার নাটকে তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে সে সিনেমা দেখত। সব না, বেছে বেছে।

পরের বছর ১৯৫৯ সালেও নজরুলজয়ন্তীতে যোগ দিতে এল নভেরা, কিন্তু এবার নাচতে নয়, সে ধারা-বিবরণী পড়বে। এই কাজটা এতদিন আমারই মনোপলি ছিল, ধারা-বিবরণী লিখতাম আমি, বর্ণনাতেও আমার ভূমিকা। সংস্কৃতি বৈঠকের সদস্যরা তখন এমন নভেরা-ভক্ত হয়ে গিয়েছে যে তারা একবাক্যে বলল, নভেরা এ বছর ধারা-বিবরণী পড়বে। আমি আমতা আমতা করে বললাম, বেশ তো দুজনেই পড়ব নাহয়। কোনো অংশ নভেরা, কোনো অংশ আমি।

সদস্যরা যে-কারণেই হোক আমার প্রস্তাব উড়িয়ে দিল, নভেরা একাই ধারা বিবরণী পড়ল। ভালোই করেছিল সে, যার জন্য ঐ কাজটা পাকাপাকিভাবে হারাতে হলো আমাকে।

এইভাবে ধীরে ধীরে সে 'সংস্কৃতি বৈঠক'-এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তাই দেখে আমরা তার সব দোষ মাফ করে দিলাম। কিন্তু একদিন শুনলাম তারা কুমিল্লা চলে যাচ্ছে।

আশকার দিঘির গডস্ গিফ্‌ট বাড়ির সামনে সে এক দৃশ্য বটে। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছেলে রাস্তায়, পুকুরপাড়ে বসে, দাঁড়িয়ে আছে। সবাই যেন একটু বিষণ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোড়াগাড়িতে করে নভেরা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যখন রেলস্টেশনে গেল তখন তাদের অনেকে সেখানে গিয়েছিল। আমরা 'সংস্কৃতি বৈঠক'-এর পক্ষ থেকে তাকে একটা ফুলের স্তবক দিয়েছিলাম। সভাপতি হিসেবে সেটা আমিই দিলাম। বিষণ্ণমুখে সে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

না, চট্টগ্রামে যতদিন দেখেছি তাকে কোনোদিন বিষণ্ণ দেখি নি। খুব প্রাণচঞ্চল আর প্রফুল্ল ছিল। যখন কথা বলত আর কেউ কথা বলতে পারত না। শুনেছি পরে সে একটু গম্ভীর এবং কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। ঢাকায় যখন ১৯৫৯ সালে এস এম আলীর সঙ্গে তাকে দেখি তখন আমারও তাই মনে হয়েছে।

নভেরা কুমিল্লা যাওয়ার পর আমরা চট্টগ্রামে আর একটা নতুন সংগঠন গড়ে তুলি, 'বিশ্ব শান্তি পরিষদ,' সভাপতি আবদুল হক দোভাষ, সেক্রেটারি আমি। পরে অবশ্য আলী আকসাদ এই সংগঠনের প্রধান হয়ে যায়, কী করে হয় তা আমার কাছে এখনো রহস্য। তখন থেকে শান্তি পরিষদ ঢাকায়। এই ঘটনা নিয়ে চট্টগ্রামের প্রগতিশীল কর্মীরা বেশ ক্ষুব্ধ ছিল অনেকদিন।

১৯৫০ সালে পার্টির সিদ্ধান্ত হলো আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করতে হবে। এটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অংশ ছিল। আমরা চট্টগ্রামের রাস্তায়, বাড়িতে বাড়িতে স্বাক্ষর যোগাড় শুরু করে দিই। নয় লক্ষের বেশি স্বাক্ষর নিয়েছিলাম আমরা। স্বাক্ষর গ্রহণের উদ্দেশ্যে একদিন কুমিল্লা রওনা হলাম আমি। অন্য উদ্দেশ্য, নভেরার সঙ্গে দেখা। বেশি ঘোরাঘুরি করতে হলো না, তাদের বাড়িও খুঁজতে হলো না। দেখলাম রানীর দিঘির পাড়ের রাস্তায় একটি লোকের সাইকেলের পেছনে সে বসে আছে। চোখে সানগ্লাস, পিঠময় চুল ছড়ানো, সাদা শাড়ির ওপর কাজ-করা। একদল রাস্তার ছেলে তাদের পেছন ছুটছে। লোকটি জোরে জোরে সাইকেল চালিয়ে দূরে চলে যাবার চেষ্টা করছে। আমি আর নভেরার স্বাক্ষর নেবার চেষ্টা করি নি।

পরে শুনেছি ভদ্রলোক সরকারি অফিসার, নভেরাদের পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ, নভেরাকে নিয়ে প্রায়ই এইভাবে বেরিয়ে পড়েন। একসময় তাদের দুজনের বিয়েও হয়ে যায়। সেই বিয়ে বেশিদিন টেকে নি। আমি ঘটনাটি কল্পনায় এনে 'উদয়ন'-এ একটি গল্প লিখেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম 'নভেরা'।

খান আতা বললেন, নভেরা?

আপনি তো তাকে লন্ডনে দেখেছেন। নভেরাকে মনে নেই?

আমিনুল তাকালেন তার দিকে।

খান আতা নড়েচড়ে বসলেন। তারপর মনে করার চেষ্টা করে বললেন, হ্যাঁ। সে তো অনেকদিন আগের কথা। সেই ১৯৫২ সালে আমি, ফতেহ লোহানী মানে লেবু ভাই যখন লন্ডনে যাই, তারপর দেখা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুর রাহমান নড়েচড়ে বসলেন। তারপর আগ্রহের স্বরে বললেন, বলুন দেখি তার সম্বন্ধে। আমরা তাকে নিয়েই আলোচনা করছিলাম আপনি আসবার আগে। আশ্চর্য! আজকাল তার কথা কেউ বলে না। আমারও কিছু পুরনো স্মৃতি আছে সেই ১৯৫৬ সালের। এখন টুকরো টুকরো মনে পড়ছে।

খান আতা সোফায় হেলান দিয়ে সিলিঙয়ের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, তার সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা হয় নি আমার। সে ছিল হামিদুর রহমানের গার্লফ্রেন্ড। হামিদই একদিন পরিচয় করিয়ে দেয়। হামিদ তখন লন্ডনে সেন্ট্রাল আর্ট স্কুলে পড়ছিল, প্রথমে থাকত তার বড়ভাই নাজির আহমেদের ৭৭ সেন্ট স্টিফেন্স গার্ডেনসের বাড়িতে। পরে নিজের ফ্ল্যাটে চলে যায়।

শামসুর রাহমান বললেন, ঢাকায় ওরা প্রায় একসঙ্গে থাকত। লন্ডনেও কি তাই ছিল?

না। নভেরা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকত। তবে বেশির ভাগ সময় কাটাত হামিদের সঙ্গেই। ক্র্যানলি স্ট্রিটে তার ফ্ল্যাটে। তখন তার বড় বোন পিয়ারী বিবিসিতে পার্টটাইম চাকরি করত। নভেরার কী করে চলত জানি না।

আমিনুল বললেন, হামিদ তাকে সাহায্য করত। বিশেষ করে পিয়ারী চলে আসার পর।

হয়ত। তাদের দুজনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল সেটা জানতাম সবাই। অনেকটা আজকের দিনের লিভিং টুগেদারের মতো। দে ওয়ার এডভান্সড অফ দেয়ার টাইম।

আমিনুল হেসে বললেন, আর কারুর সঙ্গে তেমন সম্পর্ক ছিল না? মানে অন্য বাঙালি ছেলেরা নভেরার প্রেমে পড়ে নি? তার চোখে কৌতুক চক্‌চক্ করে।

কী জানি। তবে নভেরা খুব আলাদা ছিল। অন্যান্য বাঙালি মেয়ের মতো নয়। বেশ স্বাধীনচেতা। আমার কাছে একটু উড়নচণ্ডী বা বোহেমিয়ানও মনে হয়েছে।

আমিনুল হাতের সিগারেট থেকে ছাই ফেললেন অ্যাশট্রেতে, তারপর হেসে বললেন, বোহেমিয়ান তো বটেই। প্রায় সারাজীবনই।

খান আতা কিছুক্ষণ ভাবলেন। তার দৃষ্টি দেয়ালে আমিনুলের একটা পেইন্টিঙয়ে ওপর। তারপর বললেন, খুব ফরাসি প্রভাব ছিল তার ওপর। মনে হতো ওটাই তার স্বপ্নের দেশ। প্রায়ই প্যারিসের কথা বলত।

শেষপর্যন্ত সেখানেই তো রয়ে গেল পুরনো সব বন্ধন ছিন্ন করে। অবশ্য কোনো বন্ধনই সে বেশি শক্ত হতে দেয় নি। কোনো সম্পর্কই তার কাছে পার্মানেন্ট ছিল না। আমিনুলের স্বরে দুঃখবোধ।

শামসুর রাহমান বললেন, তাকে দেখলে আমার মনে হতো 'নহো মাতা, নহো কন্যা'। এই শীতের দুপুর তার স্মৃতিচারণের মোক্ষম সময়। চমৎকার একটি দিনে তার প্রসঙ্গ উঠেছে। বলুন দেখি নভেরাকে প্রথম কখন, কীভাবে দেখলেন। বলে তিনি খান আতার দিকে হেসে তাকালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজু আপা ফোনে বললেন, আতা, আসছ তো তোমরা সন্ধ্যায়? খান আতা ফোনে খুব রেগে বলল, আপনাদের বাসায় দাওয়াত রিফিউজ করেছি কবে?

ফোনের ওপাশ থেকে বিজু আপা বললেন, এসো।

গান বাজনা হবে তো?

হতে পারে। কবিতা আবৃত্তিও হতে পারে। তোমাদের ওপরই সব নির্ভর করছে।

না-না শুধু আমাদের ওপর কেন? আপনি আর সাইদুল ভাইয়েরও কৃতিত্ব রয়েছে। এই-যে লন্ডনের সব বাঙালিদের প্রতি মাসে ডেকে ডেকে বাসায় নিয়ে খাওয়াচ্ছেন এটা কি কম?

তুমি লজ্জা দিও না তো বাপু। কিইবা খাওয়াই। তোমরা এলে ভালো লাগে এই তো।

খান আতা বলল, আপনারা আছেন বলে লন্ডনের সব বাঙালি একত্র হচ্ছি নিয়মিত। চলে গেলে কী যে হবে আমাদের!

একদিন তো যেতে হবে? সরকারি চাকরি। ১৯৫০-এ এসেছি, এখন ১৯৫৩ সাল। যাওয়ার সময় প্রায় হয়ে এল। বিজু আপার শান্ত স্বর।

না-না এত তাড়াতাড়ি যাবেন না। আমরা পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ব। অনশন ধর্মঘট করব। কমার্শিয়াল কাউন্সিলর সাইদুল হাসানকে বদলি করা যাবে না।

শুনে বিজু আপা টেলিফোনের ওপাশে হাসলেন। বললেন, তোমার পাগলামি গেল না। এসো কিন্তু।

হামিদ এল দেরি করে। যখন কবিতা, আবৃত্তি, গান সব শেষ। বিজু আপা খাবার পরিবেশনায় ব্যস্ত।

খান আতা বলল, কিহে, তোমার দেরি হলো যে?

হামিদুর রহমান স্বর নিচু করে বলল, ডেট ছিল। কফি খেতে খেতে দেরি হলো।

খান আতা বলল, কোন্ দেশী?

বাঙালি।

বাঙালি? চিনি নাকি?

না। নতুন এসেছে।

নতুন? কী করে?

আর্টিস্ট। স্কাল্পচার শিখছে।

দারুণ। বাঙালি মেয়ে স্কাল্পচার শিখতে লন্ডনে এসেছে। পরিচয় হওয়া দরকার।

দেবো। আগে আমার সঙ্গে জমে উঠুক।

শুনে খান আতা হো-হো করে হাসল। তারপর বলল, ভয় পাচ্ছিস। নাহে আমি বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামিদ হাসিমুখে বলল, আরে সে কথা হচ্ছে না। মেয়েটা অন্য স্বভাবের। বেশ কাটা-কাটা কথা বলে। পাত্তা দিতে চায় না। এখনই তোমার সঙ্গে পরিচয় করাতে গেলে হয়ত বেঁকে বসবে। বলবে, আমি কি পণ্য?

পণ্য? শুনে খান আতা অবাক হয়ে তাকায়। ভেরি ইন্টারেস্টিং। অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। বাঙালি মেয়ে স্কাল্পচার শিখছে, পুরুষদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলে। ব্যাপার কী? দেখতে হয়।

বিজু আপা এসে বলেন, এই যে হামিদ এসেছ তাহলে।

হামিদ লজ্জিত স্বরে বলে, ক্লাস শেষ হতে দেরি হলো।

বিজু আপা বললেন, দেরি হয় নি। এই তো খাবার সার্ভ করা হয়েছে। অবশ্য তুমি কালচারাল পার্টটা মিস করলে।

উঠতে উঠতে হামিদ খান আতাকে চিমটি কাটল। ফিসফিস করে বলল, কাউকে বলিস না।

খান আতা হাসল মিটিমিটি। নভেরা যাই হোক, হামিদ তার সঙ্গে বেশ ভালোভাবে লটকেছে।

তারপর দেখা হলো নভেরার সঙ্গে। হামিদই নিয়ে গেল একদিন বিকেলে। না, তার ফ্ল্যাটে না। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের কাছে ফর্টিজ-এর বড় রেস্তরাঁয় অপেক্ষা করছিল নভেরা, একাই একটা টেবিলে বসে ছিল। সামনে শূন্য চায়ের পেয়ালা, যা দেখে মনে হলো সে বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসেছে। হামিদ হাসিমুখে সামনে গিয়ে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, সরি, দেরি হয়ে গেল।

নভেরা মৃদু হেসে বলল, তোমার সঙ্গে দেখাই দেরি হয়। একজন মেয়েকে এভাবে প্রতীক্ষায় রাখতে নেই। এদেশে এসে এইটুকুও শিখলে না? নাকি বাঙালি মেয়ে বলে এর প্রয়োজন নেই ভেবেছ? ডোন্ট ডু দ্যাট।

হামিদ তার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি মুখে নিয়ে বলল, তোমাকে বাঙালি কে বলবে?

আমি নভেরার দিকে তাকালাম। কালো ট্রাউজার, কালো ব্লাউজ, গলায় কালো রুদ্রাক্ষের মালা। চোখের নিচে ভ্রূর আদলে দীর্ঘ মেকআপের কালো বাঁকা একটা রেখা টানা। চুল উস্কখুস্ক উড়ছে বাতাসে, এমন ভাব। এ সবই ফরাসি স্টাইল, হালে ফ্রান্স থেকে লন্ডনে এসেছে। একশ্রেণীর তরুণীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। এখন যেমন পাঙ্ক স্টাইলের চুল আর মেকআপ করা ছেলেমেয়েদের দেখা যায়। তখন লন্ডনেও উস্কখুস্ক চুল, চোখের নিচে লম্বা কালো দাগ ফ্যাশন ছিল। স্ট্রিট ফ্যাশন। নভেরার সঙ্গে হামিদ আমার পরিচয় করিয়ে দিল। নভেরা হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। দেখলাম সবকিছুতে সে খুব স্বচ্ছন্দ। কোথাও জড়তা নেই। বললাম, হামিদ কেন কেউই আপনাকে বাঙালি ভাববে না।

নভেরা হেসে বলল, তার মানে এই নয় যে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে আমার কোনো সংকোচ আছে। বাঙালি মেয়ে বলতে যেমন জড়ভরত, লজ্জাশীলা, পুরুষের অনুগত একটি জীব বোঝায় তেমনি হবার কোনো ইচ্ছা নেই আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চেয়ার টেনে তার সামনে বসে বললাম, সে তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

নভেরা আমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল, যেন আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করছে। তারপর এক সময় মুখের শক্ত পেশি শিথিল করে নিয়ে হালকা স্বরে বলল, শুধু দেখতেই না, কাজে আর চিন্তাতেও বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে আমার কোনো মিল পাবেন না। বলে নি হামিদ?

হামিদ মেনু হাতে নিয়ে বলল, বলতে যাবো কেন? নিজেই টের পাবে একটু পর।

শুনে নভেরা ভ্রূ তুলে সপ্রশ্নে তাকিয়ে থাকল। ওয়েট্রেস এসে চায়ের কাপ রেখে গেল। সেইসঙ্গে বিল।

প্রসঙ্গ পাল্টে হামিদ বলল, আতা আমাদের মতোই লন্ডনপ্রবাসী, ভিজিটর নয়। তোমাকে নিশ্চয়ই ও আরো দেখবে।

শুনে আমি বললাম, হ্যাঁ। তা তো হতেই পারে। আমি এই দিক দিয়ে বেশ যাওয়া-আসা করি।

কী করেন আপনি? নভেরা হাত দিয়ে কমলা রং ন্যাপকিন ভাঁজ করে কিছু একটা তৈরি করতে করতে প্রশ্ন করল।

তেমন কিছু না। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ছোটখাট কাজ করি আর সিনেমা দেখি।

হামিদ বলল, আতা অভিনেতা। সে অভিনয়, সিনেম্যাটোগ্রাফি শিখতে এসেছে।

নভেরা বলল, সিনেম্যাটোগ্রাফি? চমৎকার বিষয়। আমি ভাস্কর হতে না চাইলে সিনেম্যাটোগ্রাফার বা চলচ্চিত্র পরিচালক হতে চাইতাম। হয়ত আমিই হতাম পৃথিবীর প্রথম মহিলা চলচ্চিত্র পরিচালক। যাক সে কথা। তা আপনার ছবিতে আমাকে রাখতে পারেন। নাচের দৃশ্যে। ক্লাসিক্যাল ড্যান্স সিকোয়েন্স যদি থাকে।

হামিদ বলল, নভেরা সাধনা বসুর কাছে কলকাতায় নাচ শিখেছে।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই মনে রাখব। কিন্তু নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না বলে মনে হচ্ছে।

নভেরা হাতদুটো জড়ো করে মুখের সামনে এনে বলল, কেন?

কিছুই তো শেখা হলো না। এমনিতেই সময় চলে যাচ্ছে। দিনের পর দিন।

নভেরা চায়ের কাপ হাতে দিয়ে বলল, উইল পাওয়ার, উইল পাওয়ারই সব। আপনার যদি থাকে তাহলে গন্তব্যে ঠিকই পৌঁছুবেন। সে তারপর হেসে বলল, উইল পাওয়ার আছে তো?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কিছু তো আছেই। না হলে এতদূর এলাম কী করে?

দ্যাটস রাইট। এতদূর এলেন কী করে? তাহলে বাকিটুকুও অতিক্রম করতে পারবেন। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, এই-যে জনপ্রিয় গানটি, যা এখন মুখে মুখে ঘুরছে, যা হবার তাই হবে, তা আমি মানি না। যা হবার তা আমার ইচ্ছা অনুযায়ী হবে। হ্যাঁ, ইচ্ছা। কি বলো হামিদুর?

হামিদ মাথা চুলকে বলল, কী জানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেরা ধমকের সুরে বলল, কী জানি মানে? আমরা যখন ছবি আঁকি, কিংবা মূর্তি গড়ি, নকশা করে নিই না? জীবনযাপনও নকশার ওপর হতে হবে। শিশুরাই নকশা ছাড়া ছবি আঁকে, পাগলরা কল্পনা ছাড়া জীবনযাপন করে।

অনেক এডাল্টও তাই করে। হামিদ বলল।

নট মি। মাই ডিয়ার, নট মি। নভেরার স্বরে দৃঢ়তা।

এরপর আরো কয়েকবার নভেরার সঙ্গে দেখা হয়েছে। হোবোর্নে যাবার পথে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। হামিদের সঙ্গে অথবা একা। খান আতা বললেন।

হঠাৎ করেই, না দেখা করতে গিয়েছিলেন? আমিনুল ইসলামের স্বরে কৌতূহল।

দেখা হয়ে যেত, হোবোর্ন দিয়েই আমার আসা-যাওয়া ছিল তখন।

তারপর? শামসুর রাহমান তার দিকে তাকান। তিনি কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন।

তারপর আর কি। দেখা হলে বলত, চলুন কফি খাওয়াবেন। আমি বলতাম, ব্যস্ত আছি। সময় নেই।

সত্যি বলছেন? আপনার মতো রোমান্টিক মানুষ এমনভাবে কথা বলতে পারে? শামসুর রাহমানের মুখে মৃদু হাসি।

খান আতা হাসলেন। স্ট্রাগলিং লাইফে সবই সম্ভব।

আমিনুল বললেন, লন্ডনে অনেকেই নভেরার প্রেমে পড়েছিল শুনেছি। তাদের কথা বলুন শুনি।

খান আতা বললেন, সেসব আমি জানি না। অনেক দিন আগের কথা। সবকিছু মনে নেই। তবে হামিদুরের সঙ্গে নভেরার একটা গভীর সম্পর্ক ছিল তা বুঝতাম। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, আবেগভরা প্রেম, এদের কিছু নয়। পরিণত বয়সের মানুষেরা প্রেমে পড়লে যেমন হয়, অনেকটা তেমন।

শামসুর রাহমান হেসে বললেন, প্রেম প্রেমই, বয়সভেদে তার আবেগের তারতম্য খুব হয় কি?

হয় না? তুমিই বলো। এইতো আজই 'ভোরের কাগজে' তোমার লেখা পড়লাম, বিভিন্ন বয়সে বহু জনের প্রেমে পড়েছ। তোমার নিজের ভাষাতেই তুমি একজন 'বহুবল্লভ'। কী মনে হয় তোমার?

শামসুর রাহমান মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, প্রেম, প্রেমই।

খাওয়ার টেবিলের পাশে চেয়ারে বসতে বসতে খান আতা হাসনাতকে লক্ষ্য করে বললেন, এই-যে জরুরি তলব দিয়ে নিয়ে এলেন এ কি নভেরা সম্বন্ধে জানার জন্য?

হাসনাত কিছু বলার আগেই শামসুর রাহমান বললেন, কারণ যাই হোক না কেন, নভেরাকে কেন্দ্র করে এই-যে সমাবেশ এর জন্যও আমরা নভেরার কাছে কৃতজ্ঞ হতে পারি।

তোমার সঙ্গে কীভাবে পরিচয়? খান আতা তাকালেন শামসুর রাহমানের দিকে।

যখন আমরা আশেক লেনে চলে আসি, সেই ১৯৫৭-এর দিকে। নভেরা থাকত হামিদের ভাগ্নের বাড়ির দোতলায়। হামিদই ঠিক করে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে যেতাম হামিদের সেই বাসায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫৭? না তখন আমার দেখা হয় নি। সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত। 'জাগো হুয়া সাবেরা'র শুটিং চলছিল। কী করত তখন নভেরা? খান আতা তাকান।

কী আর করবে? কাজ খুঁজত, কমিশন পাওয়ার চেষ্টা করত। পাবলিক লাইব্রেরিতে হামিদের সঙ্গে একটা কাজ পেয়েছিল। পরে শহীদ মিনারের কাজটাও দুজনে শুরু করে।

হামিদ কি একসঙ্গে থাকত ওর সঙ্গে? খান আতা তাকালেন শামসুর রাহমানের দিকে।

না। তবে আড্ডা দিত তার বাসায়। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা চলত। তখন আমিনুল আসত প্রায়ই। আমি তো যেতামই। বেশ জমত। নভেরা ছিল ভেরি লাভলি।

পাড়ার লোক, হামিদের আত্মীয়স্বজন কিছু বলাবলি করত না? খান আতার স্বরে কৌতূহল। তিনি একটা ছোট প্লেটে সামান্য খাবার নিয়েছেন।

আমিনুল বললেন, না, তেমন মনে হতো না। হামিদের একটা প্রভাব ছিল, তার পরিবারের তো বটেই। সেটাও গুঞ্জন না-ওঠার একটা কারণ হতে পারে।

তার আত্মীয়স্বজন কীভাবে নিয়েছিল দুজনের সেই খোলামেলা সম্পর্ক? মানে, একটা রক্ষণশীল পরিবার, তার ওপর পুরনো ঢাকার পরিবেশ, ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয় না? হাসনাত পানির গ্লাস হাতে নিতে নিতে বলে।

তার আত্মীয়রা বিশেষ কিছু ভাবত কিনা মনে নেই। জিগ্যেস করে দেখব। শামসুর রাহমান বললেন।

কাকে জিগ্যেস করবেন? আমিনুল তাকালেন তার দিকে।

হামিদের বোন, জহুরুল হক সাহেবের স্ত্রীকে।

শুনে আমিনুল ইসলাম হাসনাতের দিকে তাকালেন। তারপর হেসে বললেন, এই তো কত সোর্স বেরিয়ে আসছে। এভাবেই লোকের মুখের বর্ণনায় নভেরা বেরিয়ে আসবে।

শামসুর রাহমান হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন, আশ্চর্য লাগে। মরে গেলে একটা মানুষ অদৃশ্য হয়ে যায়, কোনোকিছুরই সে আর অংশ থাকে না। অথচ জীবনে কত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কত ঘটনা, কত সম্পর্ক, কত আলাপচারিতায় সে সম্পর্কিত হয়ে যায়।

আমিনুল ইসলাম বললেন, আমরা আজ যাকে নিয়ে আলাপ করলাম, নভেরা কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে নির্বিকার, উদাসীন ছিল। সে বলত, যেখানে জীবন শেষ, বাঁচা শেষ, সেখানেই মৃত্যু। তার কথা ভেবে লাভ কী? সি হ্যাড লাস্ট ফর লাইফ।

খান আতা বললেন, এবং জেস্ট ফর লাইফ। সে বেশ ফরাসি দর্শনের প্রভাবে পড়েছিল। সেই সময়ে অস্তিত্ববাদ খুব জনপ্রিয় ছিল। প্রায়ই বলত, I think, therefore I am. সার্ত্রের কথা। দেখা হলেই বলত, সিমন দ্য বুভুয়াঁর 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' পড়েছেন? পড়বেন। মেয়েদের মুক্তির ম্যানিফেস্টো। ফ্রান্সে যান, দেখবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েরা কতদূর এগিয়ে গিয়েছে। বিয়ের প্রতিষ্ঠানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বাধীনভাবে থাকছে, পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে।

আমিনুল বললেন, কঠিন বইপত্র পড়ার মতো লেখাপড়া তার ছিল না। এটা হামিদের প্রভাব, হয়ত নাজির ভাইয়েরও। কিন্তু ফরাসি সংস্কৃতি সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল এটা সত্যি। শেষপর্যন্ত ফরাসি দেশেই রয়ে গেল। একধরনের স্বেচ্ছা নির্বাসন বলা যায়।

দেশে আর ফেরেই নি? খান আতা তাকালেন আমিনুলের দিকে।

না। সেই ১৯৬০ সালে যে ঢাকা থেকে গেল তারপর আর একবার এসেছিল শুনেছি। আমার সঙ্গে তখন দেখা হয় নি।

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। ঘরের মধ্যে একটা চড়ুই পাখি ফরফর করে উড়ছে। উত্তর থেকে হাওয়া এল দরজার পরদা উড়িয়ে। বাইরে কোথাও রেডিও কিংবা ক্যাসেটে গান হচ্ছে। টিভিতে মুভি অব দ্য উইক হচ্ছে, তার সংলাপ শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় মেয়র নির্বাচনের মিছিল থেকে স্লোগান উঠছে। মানুষের কোলাহল উঠছে, নামছে। দরজার পরদা উড়িয়ে বাতাস আসছে ঘরের ভেতর, খুব ঠাণ্ডা নয়, সুন্দর একটা আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে আজ ছুটির দিন।

আমিনুল বললেন, মনে হয় শেষের দিকে দেশের প্রতি তার বেশ অভিমান জমেছিল। এখানে থাকতেই তো ফিরে এসেছিল লন্ডন থেকে। একটা অবলম্বন খুঁজেছিল। শুনেছি আর্ট কলেজে স্কাল্পচার ডিপার্টমেন্ট খুলে সেখানে পড়াতে চেয়েছিল। তাঁর চালচলনে ভয় পেয়ে সেদিন স্যারও সাহস পান নি। তাছাড়া পোস্ট ক্রিয়েট করা, বাজেট বরাদ্দ এসব বুরোক্র্যাটিক জটিলতা তো ছিলই। অবশ্য অবলম্বন পেলেই যে থেকে যেত তা জোর করে বলা যায় না।

খান আতা বললেন, আসলে ওর রক্তের মধ্যেই ছিল বোহেমিয়ান প্রবণতা। এ দেশে তার প্রশ্রয় কোথায়? তার কাঙ্ক্ষিত জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত দেশটিই সে বেছে নিয়েছিল। প্যারিস চিরদিনই বোহেমিয়ানদের স্বর্গ। নভেরা ভুল করে নি।

শামসুর রাহমান বললেন, 'জাগো হুয়া সাবেরা' ফিল্ম শুটিঙের সময় ফয়েজ আহমদ ফয়েজ যখন ঢাকায় আসেন তখনই কি তার সঙ্গে এস. এম. আলী আর নভেরার দেখা হয়?

না ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ১৯৫৪-তে যখন লন্ডন যান তখন এস. এম. আলীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। নভেরার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা বলতে পারব না। তবে শুটিঙের ফাঁকে ফাঁকে ঢাকায় এসে নভেরার স্টুডিওতে কাজ দেখতে গিয়েছেন।

খান আতা তাকালেন সবার দিকে। তারপর বললেন, 'জাগো হুয়া সাবেরা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে করলে হবে কি, ফয়েজ ভাই চরিত্র, উপসংহার সব বদলে দিয়েছিলেন। শ্রেণীসংগ্রামটাকে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। ফয়েজের আন্তরিকতা ছিল। কমিটমেন্ট ছিল। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালিদের পছন্দ করতেন। অনেককে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন লাহোরে। এস. এম. আলী, নভেরা, মুর্তজা বশীর।

নভেরাকে বোধহয় তিনি ডেকে নেন নি। সে এস. এম. আলীর সঙ্গে গিয়েছে। শামসুর রাহমান বললেন।

ঐ হলো, একই কথা। এস. এম. আলী লাহোরে না গেলে কি নভেরা যেত সেখানে? আমিনুল তাকালেন শামসুর রাহমানের দিকে।

খান আতা বললেন, যেত না। লজিক অনুসরণ করে বলতে হয়।

চারতলা বাড়ির নিচে সিঁড়ি। একটি মহিলা ওপরে উঠছে। হাসনাত তার দিকে তাকাতে তাকাতে সিঁড়ির নিচে দরজার সামনে এল। দেয়ালে পুরনো নকশী কাঁথা ফ্রেমে বাঁধানো। সে বেল টিপল। ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কণ্ঠস্বর : আহো মিয়া। দেরি কইরা ফালাইলা। ছটা বাজবার লাগতাছে।

হাসনাত দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। সামনে সাঈদ আহমেদ দাঁড়িয়ে, ঢোলা প্যান্ট, ফুল শার্ট। তার ওপর খয়েরি রঙের সোয়েটার।

হাসনাত : বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

সাঈদ আহমেদ পাইবা কেমনে। হেইতো দুই বছর আগে আইছ। আর আহো নাই।

হাসনাত চারদিকে তাকালো। বাঁশ-বেতের সোফাসেট, পুরনো, রঙ ওঠা। লাল সিটকভার বহু ব্যবহারে নেতিয়ে আছে। দেয়াল বরাবর বইয়ের আলমারি। ভেতরে তাকভর্তি বই। ওপরে টেরাকোটা দুটি ফ্রিজ-ফ্রেমে বাঁধানো। কামরুলের, মুর্তজা বশীরের ওয়াটার কালার, অয়েল পেইন্টিং। সাদেকিনের ক্যালিগ্রাফিতে আরবি লেখা কাগজের তৈরি টিয়াপাখি ঘুরছে বাতাসে। ঘরের ভেতর একধরনের ধূসরতা, আর ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ভাব।

হাসনাত সোফায় বসল। সাঈদ ভেতরে গেলেন। একটি পরিচারিকা ঘরে ঢুকল, সাঈদ আহমেদ এসে তাকে নিয়ে আবার ভেতরে গেলেন। একটু পর বেরিয়ে এসে হাসনাতের পাশের সোফায় বসলেন।

সাঈদ তোমার ভাবি এখনো শয্যাশায়ী। তার দেখাশোনা নিয়া হিমশিম খাইতাছি। আচ্ছা কও, পায়ে একটা পোক পড়ল, আর তারপরই এই তেলেসমাতি কারবার। ডাক্তারদের কথাও আর কী কমু, অপারেশন কইরা সেপটিক বানাইয়া দিল।

হাসনাত : অ্যাক্সিডেন্টের মতো। হঠাৎ করে হয়ে যায় এইসব ব্যাপার।

সাঈদ তাইতো দেখতাছি। তা মিয়া কও দেহি, কেমন আছ। সুটটা তো জবর পরছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত অফিস থেকে ফিরে কাপড় বদলাই নি।

সাঈদ খুব কাম করতাছো মনে হয়। প্রায়ই টিভিতে দেহি। তা বিকালে হাঁটাহাঁটি করতাছো তো?

হাসনাত না। ভেবে দেখলাম, এমনি সময় ফুরিয়ে আসছে, হাঁটাহাঁটি করে সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

সাঈদ (হো-হো করে হেসে) আরে জবর কইলা মিয়া। হাঁটাহাঁটি কইরা লাভ নাই। যহন যাওনের তহন যাওন লাগব। হাইটা কী লাভ। জবর কইছ মিয়া।

হাসনাত আপনার কোনো খোঁজখবর নেই।

সাঈদ থাকব না ক্যান। পরশু দিন থেইক্যা আবার টিভিতে বিদেশী নাটকের সিরিজ শুরু করছে। মাঝখানে বন্ধ আছিল। বাইরে আছিলাম। এবারে বুঝলা লোরকার 'ইয়ারমা' নাটক নিয়া প্রোগ্রাম হইল। টাইম বড় কম দেয়। খালি নাটক দেখাইবার চায়। কথা কওনের টাইম কম দেয়। আরে মিয়া নাট্যকার সম্বন্ধে কইতে হইব না? কয়জনে জানে লোরকার কতা অহন? বুঝলা, ১৯৫৮ সালে করাচিতে আমার হোস্টেলে আইসা উঠল মুর্তজা বশির। আমি তারে বশিরো কই। ইটালিতে আছিল হালায়। হে বুঝলা লোরকার কবিতা নিয়া পেইন্টিং করছে। বুঝো ব্যাপারখানা। এইডা কওন লাগে না? কিন্তু টিভি টাইম দেয় না।

হাসনাত আমি নভেরা সম্বন্ধে শুনতে এসেছি। আপনি তার সম্বন্ধে যা জানেন বলুন।

সাঈদ আহমদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। হাসনাতকে দেখেন। পরিচারিকাকে ডাক দিয়ে চা দিতে বলেন। তারপর হাসনাতের দিকে তাকিয়ে বলেন–

সাঈদ নভেরা? হু, জানুম না ক্যান। অনেক কিছু জানি। কয়েকটা সিটিং লাগব। এহন টাইম নাই। আইজ সতেরোই জানুয়ারি। হু। ফেব্রুয়ারির আগে বইতে পারুম না। তোমার ভাবির এই অবস্থা। তার ওপর দুইটা কামের কন্ট্রাক্ট সই কইরা ট্যাহা-পয়সা লইয়া ফালাইছি। হেইসব কাম শেষ করন লাগব।

হাসনাত আগামী শুক্রবারে আসি। এক ঘণ্টা হলেই হবে।

সাঈদ : না মিয়া শুক্রবারে হইব না। সামনের মাস। কইলাম না, হাত বান্দা।

(পরিচারিকা চা-বিস্কিট দিয়ে যায়। তারপর সাঈদ আহমেদের দিকে তাকিয়ে বলে)

পরিচারিকা : মিস্ত্রি আইছে।

সাঈদ : ক্যাডা আইল এহন?

পরিচারিকা : ইলেকট্রিক মিস্ত্রি।

সাঈদ ওহ ব্যাডার কাম শেষ হইছে তাহলে। (হাসনাতের দিকে তাকিয়ে) চা লও মিয়া। দেহি ইলিকট্রিক মিয়া কী কইবার চায়।

সাঈদ উঠে দরজার কাছে দাঁড়ান। অদৃশ্য ইলেকট্রিসিয়ানের সঙ্গে কথা বলেন।

কিছু পর টাকা পকেটে রাখতে রাখতে ফিরে এসে বসেন সোফায়। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঈদ   এক সিটিং-এ হইব না মিয়া। সময় লাগব। তুমি নভেরা আর হামিদরে মিলাইয়া লিখো। আরো ক্যারেক্টর আইব, লেবু ভাই মানে ফতেহ লোহানী, নাজির ভাই, এক ইংরেজ পেইন্টার, সব কেমিও রোল, নভেরাকে মাঝখানে রাইখাই এদের কথা কওন যাইব।

বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ান, ভেতরে গিয়ে একটা কাগজের চোঙা নিয়ে সোফায় বসেন। তারপর যত্নের সঙ্গে চোঙার ভেতর থেকে টেনে টেনে কাগজ বার করে বললেন,

সাঈদ আহমেদ   পড়ো। ফ্রেঞ্চ গভর্মেন্ট আমারে যে অর্ডার দিছে তার সাইটেশন।

হাসনাত হাতে নিয়ে দেখল, ফরাসি ভাষায় লেখা। একটু দেখে ফেরত দিল। সাঈদ আহমেদ এবার তার হাতে তুলে দিল একটি মেডাল।

সাঈদ   দুই দিকেই এনগ্রেভ করা। দেখতে পাইতাছ? হ, মিয়া জবর জিনিস, বুঝলা এইডাই হাইয়েস্ট অর্ডার। আর কেউ পায় নাই এই দেশে। সাব-কন্টিনেন্টে পাইছে কিনা কইবার পারি না, আমার জানার মধ্যে নাই।

বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ান, আবার ভেতরে যান এবং কিছু পর হাতে কয়েকটি বড় এনভেলাপ নিয়ে সোফায় এসে বসেন।

হাসনাত : নভেরা সম্বন্ধে কিছু কী?

সাঈদ   হইব, হইব। নভেরা আইব মিয়া, অ্যাহন এইগুলা দ্যাহো।

একটা বড় ছবি হাসনাতের হাতে দিয়ে বলেন,

সাঈদ   এই যে দ্যাহো ছবিটা, প্যারিসে ১৯৫৫ সালে মিউজিয়াম গিমেঁতে কালচারাল শোর পরে তোলা গ্রুপ ছবি। মাঝখানে ফেমাস কথক ডান্সার সেতারা বেগম, তার পাশে আমি, সেতার বাজাইছিলাম ঐ ফাংশনে। লন্ডনে মিউজিক শিখতেই গেছিলাম মিয়া। মিউজিয়াম গিমেঁ, বাংলার লগে লগে ইংরেজি নামটাও লিখো, গিমেঁ।

হাসনাত : নভেরার সঙ্গে কীভাবে দেখা হলো আপনার।

সাঈদ   নভেরা? হু। লিখো, ক্র্যানলি স্ট্রিট, চারতলা বাড়ি, তিনতলায় হামিদুর রহমান থাকে, থ্রি বেড রুম ফ্ল্যাট, তখনকার দিনে ছাত্ররা ভাবতেই পারে না অত বড় ফ্ল্যাটে থাকবে। কিন্তু হামিদ থাকত। সেইখানে গিয়া উঠলাম ১৯৫৪ সালে। নভেরার লগে হেইখানে দেখা। আমার রিসেপশনের জন্য হেইখানে ছিল সে। হামিদই আইতে কইছিল।

থামলেন সাঈদ। তারপর বললেন,

সাঈদ   থাক আউজকা। কয়েকটা সিটিং লাগব। কমু, সব কমু। স্পাইসিং লাগব, স্ক্যান্ডাল থাকতে হইব।

হাসনাত   সেসবের দরকার নেই। যা কিছু ঘটেছে তা থাকলেই যথেষ্ট। নভেরার জীবন এমনিতেই খুব ইন্টারেস্টিং। বলা যায় ফ্যাসিনেটিং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঈদ আরে মিয়া বানায়া স্পাইসিং, স্ক্যান্ডালের কথা কইতাছি না। নভেরার লাইফটাই মনে হইব স্ক্যান্ডালাস, ফুল অব স্পাইস। দিমু, ম্যাটেরিয়াল দিমু। অমন মেয়ে হইতে পারে ভাবোন যায়? বুঝলা লন্ডন থেইকা আশেক লেনে আইসা উঠল হামিদের লগে। পাড়ার লোকে জবর কানাঘুষা করে। কয় সাবে একজনরে লইয়া আইছে। তা তহন দিনকাল অন্যরকম আছিল। সাবদের ইজ্জত করত মাইনষে। সামনে কিছু কবার সাহস পাইত না। বড়ভাই নাসির মেজাজ খারাপ কইরা থাকতেন। তাও কিছু কবার পারে না। মা কইত, আরে সবুর করো, সব ঠিক হইয়া যাইব। কী যে ঠিক হইব হালায় ব্যাপারটা ঘিলুতে হামাইত না। আর মাইয়ার কী টেম্পার ট্যানট্রাম।

হাসনাত টেম্পার খারাপ ছিল নভেরার?

সাঈদ আরে মিয়া কইতাছি কী? চাকর-বাকররে ধমকি দিয়া পেশাব করাইয়া দিত। বড় মেজাজি মানুষ আছিল। হাই ব্রাউ। She did not know who she was.

হাসনাত সবার সঙ্গে মিশতেন না?

সাঈদ কইলাম না, হাই ব্রাউ। খুব সিলেকটিভ আছিল। যাদের ভালো লাগত তাদের সার্কেলে আবার খুব এন্টারটেইনিং। আরে মিয়া ভাবো ব্যাপারডা। সেই ১৯৫৬ সালে পুরান ঢাকার মতোন জাগায় এক জোয়ান মাইয়া আইসা উঠল হামিদের লগে। দিনরাত আড্ডা, ছবি আঁকা, হৈচৈ, জোয়ান পোলারা আইতাছে, যাইতাছে, তেলেসমাত কাণ্ড।

হাসনাত তার খাওয়া-দাওয়া, খরচ?

সাঈদ সব ফ্রি আছিল মিয়া। হের উপরে ফাংশনে যাওনের সময় বাড়িতে আইসা বোইনদের গহনা পইরা হামিদের লগে যাইত গিয়া। বুঝলা ব্যাপারখান। ফেরত দিত না, হাতে, গলাইয়া থাকত। বোনরা গাইগুই করে। মায়ে কয়, 'থাহুক না, দিব নে মনে কইরা।' ফেরত দিছে বইলা আমার মনে পড়ে না। যহন শহীদ মিনারে কাম শুরু করে দুইজনে, তহন সেহানেই বাঁশের বেড়া দিয়া একটা ঝুপড়ি বানাইয়া থাকন শুরু করল। পুরান ঢাকা থেইকা আওন যাওনে ঝামেলা। খাবার কিন্তু সাপ্লাই হইতো আশেক লেনের বাড়ি থাইকাই। মায়ে কইত, 'এই মাইয়াটার লাইগা সাহেবি খাবার লইয়া যাইবি। হে দেশী খাবার পছন্দ করে না।' মায়ের দরদ আছিল খুব নভেরার লাইগা।

হাসনাত আপনাদের ফ্যামিলির বেশ কনট্রিবিউশন আছে ওর ব্যাপারে।

সাঈদ আছে না? কমু সব। ম্যাট্রিক পাস মাইয়া, দেখতে সুন্দর আছিল, এইতো পুঁজি। তার একটা গাইড লাগে না? লাগে। নাজির ভাই আছিল সেই গাইড। পরে হামিদ। আমিও কিছু তালিম দিছি, কমু সব। লন্ডনে যহন পলাইয়া গেল তহন নাজির ভাইই দেইখা পরামর্শ দিল ছবি আঁকতে।

হাসনাত পালিয়ে গেল? কোথা থেকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঈদ She fled from her failed marriage. বাপ ষোলো-সতেরো বয়সেই বিয়া দিছিল এক অফিসারের লগে। ভাইগা চইলা গেল লন্ডন। সেইখানে তহন তার বড় দুলাভাই সিএ পড়ে আর বোন পিয়ারী কন্ট্রাক্টে বিবিসিতে খবর পড়ে। নাজির ভাইই পিয়ারীকে কন্ট্রাক্ট দিছিল। আরে, নাজির ভাই বাঙালিদের লাইগা কি না করছে।

হাসনাত আপনার বাসা খুঁজতে গিয়ে সেই অফিসারের বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। দুবছর তাদের বিয়ে টিকেছিল বলে উত্তরা ব্যাংকের আনিসুজ্জামান সাহেব বলেছেন।

সাঈদ না মিয়া দুবছর না, ছয় মাসও টিকে নাই। কনট্রিবিউশনের কথা কইলা না? বুঝলা নাজির ভাইই তারে ক্যাম্বারওয়েল আর্ট স্কুলে ভর্তি কইরা দেয়।

হাসনাত ঘড়ির দিকে তাকায়। সাঈদ তাকে দেখেন। তারপর বলেন,

সাঈদ এহন আমার যাওন লাগব।

হাসনাত মনে আছে। আপনার ডিনার।

সাঈদ ডিনার না। তোমার ভাবিরে নিয়া ক্লিনিকে যাওন লাগব।

হাসনাত আগামী শুক্রবারে এক ঘণ্টা দিতে পারবেন?

সাঈদ অহন কইতে পারুম না। ফোন কইরো।

হাসনাত হ্যাঁ, ফোন করে জেনে নেবো।

সাঈদ (উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছ যেতে যেতে) মিয়া যাই কও নভেম্বারে এক ঘণ্টায় ফিনিশ করন যাইব না। কয়েকটা সিটিং লাগব। (খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে) She did not know who she was. একটা ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডে থাকত। বুঝো ব্যাপারখান।

AMARBOI.COM

হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে নভেরা একটু হতাশ হলো, এয়ারপোর্ট তেমন বড় আর জাঁকজমকপূর্ণ কিছু নয় যেমন ভেবেছিল। সাদামাটা দেখতে, কতগুলো ব্যারাকের মতো একতলা দালান, উঁচু শুধু কন্ট্রোল টাওয়ার।

এরাইভাল থেকে বেরুতেই পিয়ারীর সঙ্গে দেখা হলো, সঙ্গে দুলাভাই। পিয়ারী এসে বুকে জড়িয়ে ধরল কয়েকবার। বলল, ডার্লিং, কেমন আছিস্।

তুই কেমন? দুলাভাই কেমন?

উই আর ফাইন, ফাইন। ওহ্ কী যে আনন্দ হচ্ছে তোকে দেখে। সবার কথা বল্, মা-বাবা সবার কথা। চিঠি অনেক পরে পরে পাই। আমিও তো নিয়মিত লিখি না। এত কাজ এখানে!

নভেরা বলল, হ্যাঁ, তাই নিয়ে অনুযোগ করেন। তুই, সুইটি মোটেও রেগুলার না চিঠি লেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় নারে, হয় না। এখানে ইচ্ছে থাকলেও চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না। অনেক বড় বড় কাজ এমনকি বাজে কাজেও ছুটোছুটি করতে হয়। চিঠি লিখব লিখব করেও লেখা হয় না। চল্ যাওয়া যাক। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, এই, তুমি নভেরার সুটকেসটা নাও। ছোটই আছে, বেশি ভারী হবে না।

আলম সুটকেস হাতে নিয়ে বলল, ভারী হলেও তুলতে হবে। শ্যালিকা যখন।

বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি করে তারা রওনা হলো। গাড়িতে বসে পিয়ারী বলল, তোকে এখানকার আন্ডারগ্রাউন্ড সব বুঝিয়ে দেবো। দেখবি খুব সোজা, আর কনভেনিয়েন্ট। ট্যাক্সি করে সব সময় ঘোরা যাবে না।

নভেরা ট্যাক্সির সামনের সিটে, পিয়ারী দুলাভাইয়ের মুখোমুখি বসে আছে। বাইরে লোকজন, গাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, লন্ডনের ডাবল ডেকার। হাউ নাইস। তারপর বলল, ট্যাক্সিও পছন্দ হয়েছে। ফ্যান্সি কিছু না, কাজের বস্তু চেহারাতেই বলে দিচ্ছে। আই লাইক দা ব্ল্যাক কালার। ভেরি সিরিয়াস, বিজনেস লাইক।

দুলাভাই বললেন, তোমার শাড়ির সঙ্গে মিলে গিয়েছে।

পিয়ারী বলল, তুই কি অন্য কালারের শাড়ি পরা একদম বাদ দিয়েছিস?

মোটামুটি। নভেরা দুদিকে তাকাতে ব্যস্ত। তার চোখের সামনে লন্ডনের দৃশ্য দ্রুত আসছে, অপসৃত হচ্ছে।

আজকে বৃষ্টি নেই, একটু রোদও উঠেছে। তাকে লন্ডন ওয়েলকাম জানাচ্ছে। পিয়ারী হাসল।

খুব বৃষ্টি হয় বুঝি? নভেরার চোখ বাইরের দিকে।

প্রায়ই হয়। আমাদের দেশের মতো ঝুপঝুপ করে মুষলধারে না, গুঁড়ি গুঁড়ি। প্রায়ই আকাশ মেঘলা থাকে। অনেক দিন সূর্যের মুখই দেখা যায় না।

নভেরা ভেতরে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, বেশ মজা তো। একটা ছাতা কিনতে হবে প্রথমেই।

সকালে উঠে দুলাভাই চলে যান তার ফার্মে, সেখানে তার সিএ-এর কাজ হাতেকলমে শেখা হচ্ছে। পিয়ারী বিকেলে যায় বিবিসিতে তার খবর পড়তে। দুপুর পর্যন্ত একসঙ্গে ঘুরতে কোনো অসুবিধে নেই। কয়েক দিনেই তার সঙ্গে ঘুরে পথঘাট চেনা হয়ে গেল। লন্ডনে ট্যুরিস্টরা এসে যা যা দেখে– লন্ডন মিউজিয়াম, পার্লামেন্ট বিল্ডিং, বাকিংহাম প্যালেস, ট্রাফালগার স্কয়ার, লন্ডন ফোর্ট, হাইড পার্ক সব দেখা হয়ে গেল।

ট্রাফালগার স্কয়ারের পাশেই ন্যাশনাল গ্যালারি, সেটাও দেখা হলো।

নভেরা বলল, এখানে আরো বেশি সময় নিয়ে আসতে হবে। এভাবে তাড়াহুড়ো করে দেখলে চলবে না। রয়াল একাডেমিতেও তাই।

পিয়ারী বলল, বেশ তো আসবি সময় নিয়ে। এখন তো চেনা হয়ে গেল।

ওয়েস্ট মিনিস্টার এবের সামনে রদাঁর ভাস্কর্যগুলো দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে থাকল নভেরা। বিড়বিড় করে কিছু বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিয়ারী বলল, আবার আসিস এখানে। চেনা হয়ে গেল। স্কাল্পচারে তোর যখন শখ।

রদাঁর মূর্তিগুলো নভেরার চোখের সামনে জেগে থাকল দেখার পর কয়েক দিন পর্যন্ত। এই করে ঘুরেফিরে দুসপ্তাহ কেটে গেল। একদিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে নভেরা বলল, আমি তো ট্যুরিস্ট হয়ে আসি নি। আমার ভর্তির কী হলো?

দুলাভাই মুখ তুলে তাকালেন। পিয়ারী বলল, সত্যি সত্যি পড়তে এসেছিস তুই? কী পড়বি?

নভেরা খাওয়া বন্ধ করে তাকালো দুজনের দিকে, তারাও তাকিয়ে আছে।

পড়তেই তো এসেছি। স্কাল্পচার। তোমাদের লিখি নি? তার স্বরে উষ্মা এবং বিস্ময় মেশানো। যেন এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না মোটেও।

লিখেছিস ঠিকই। কিন্তু মনে হয়েছে এখানে আসার একটা অজুহাত এটা। তুই যে সিরিয়াস ভাবতে পারি নি। তোর তো খেয়ালখুশির শেষ নেই।

নাউ, ইউ আর ইনসালটিং মি। রিয়েলি?

সরি, নভেরা, আই ডিন্ট মিন টু ইনসাল্ট ইউ। মনে এল তাই বলেছি। কিছু খারাপ ভেবে বলি নি।

নভেরা চুপ করে থাকে। তার মুখ নিচু হয়ে এসেছে, হাতের কাঁটাচামচ দিয়ে টেবিলক্লথে আঁকিবুঁকি করছে। এটা তার অস্থিরতার লক্ষণ, বিরক্তির প্রকাশ।

আলম স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলল, দুবোনে ঝগড়া না করে, ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করে ঠিক করে নাও। যদি পড়তে চায় তাহলে লেখালেখি করতে হবে। এখানকার আর্ট স্কুল, কলেজের নাম-ঠিকানা যোগাড় করে নাও প্রথমে।

নভেরা মুখ নিচু রেখেই বলল, ঠিক। আমিই সে সব করব। তোমাদের কষ্ট করতে হবে না।

পিয়ারী হেসে বলল, তুই এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেলি, একটুকুতেই রাগ।

একটুকু না, দিস ইজ টু মাচ। আমি এতদূর থেকে মনস্থির করে এসেছি, আর তোমরা এখনো নাম-ঠিকানা যোগাড় করো নি।

আরে তাতে কী হয়েছে। এটা ইংল্যান্ড, লন্ডন শহর। এখানে দুমিনিটে সব কাজ হয়ে যায়। আজই লেগে যাবো তোর কাজে। দেখ কত সময় নেয়।

ঠিকানা যোগাড় করতে সময় নিল না। কয়েকটা অ্যাপলিকেশন পাঠানো হলো। উত্তরও পাওয়া গেল তাড়াতাড়ি। সব রিগ্রেট, লিখেছে, 'তোমার প্রয়োজনীয় ডিগ্রি নেই, শিক্ষা নেই।' আবার নতুন করে অ্যাপলিকেশন করা হলো।

একদিন বিবিসিতে নিয়ে গেল পিয়ারী, হোবোর্ন স্টেশন থেকে ওপরে উঠে কিংস রোড দিয়ে হেঁটে কিছুদূর গেলে সামনে প্রায় ঐতিহাসিক একটা ভবন, সামনের স্তম্ভে ভাস্কর্য, বেশ সম্ভ্রম জাগায় এমন অভিজাত ভবনটি।

রিসেপশনে শ্যামলা রঙের এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন, রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিলেন। পিয়ারীকে দেখে এগিয়ে এলেন, হাত বাড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করমর্দন করলেন। তারপর নভেরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমি নাজির আহমেদ, তুমি নিশ্চয়ই নভেরা, পিয়ারীর কাছে তোমার কথা শুনেছি। চলো নিচে ক্লাবে যাওয়া যাক। কথা বলা যাবে।

ক্লাবে তখন ভিড় নেই। তারা একপাশে বসল। নাজির ভাইয়ের ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয়, সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় তাঁর কণ্ঠস্বর। ভরাট গলা, যখন কথা বের হয় মনে হয় কণ্ঠস্বর গমগম করে যেন প্রতিটি শব্দ ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। এমন জাদুকরি কণ্ঠস্বর আগে শোনে নি নভেরা। সে মুগ্ধ হয়ে পাশে বসে শুনতে থাকল। প্রথমে কাজের কথা বললেন নাজির আহমেদ। পিয়ারীকে দু-একটা কাগজ দেখালেন। তারপর নভেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, সরি। টকিং শপ। তুমি নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছ। আমাদের কথা শেষ। ওপরেই কথা বলা যেত। কিন্তু সেখানে অপরিসর ঘরে অন্যদের সামনে তুমি আরো অস্বস্তি বোধ করতে। এখন শুনি তোমার কথা। দাঁড়াও তার আগে আমি বলি কী জানি তোমার সম্বন্ধে। কনভেন্টে পড়েছ কলকাতায়, চট্টগ্রামে কলেজে ভর্তি হয়েছিলে কিন্তু পড়া শেষ করো নি, এখানে স্কাল্পচার শিখতে এসেছ। রাইট?

নভেরা হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল। নাজির আহমেদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন তোমার সমস্যা ভর্তি হওয়া। বেশ আলাপ করা যাবে। তার আগে বলো কে কী পান করবে। আমি নিয়ে আসছি।

আধঘণ্টা পর ফোন পেয়ে ওপরে উঠে গেলেন নাজির ভাই, সামনে টেবিলে অসমাপ্ত পানীয়। বললেন, বসো তোমরা। আমি জয়নুল ভাই আর নুরুল ইসলামকে নিয়ে আসি।

কিছু পরে তিনি এলেন সঙ্গে দুই ভদ্রলোক, একজন মসৃণ চেহারার একটু বেঁটেখাটো, অন্যজনের চেহারায় নানা কৌণিকতা, চোয়াল উঁচু, খেটেখাওয়া মানুষের মতো দেখতে।

নাজির আহমেদ বললেন, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি জয়নুল আবেদিন, ঢাকা আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল, আর এ নুরুল ইসলাম, এখনো কিছু করে না, ঢাকায় রেডিওতে নিউজ পড়ত।

নুরুল ইসলামকে নভেরা চেনে না, কিন্তু জয়নুল আবেদিনের নাম শুনেছে, আগে যদিও দেখে নি।

ওরা সবাই বসল, সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে, একটা বৃত্তের মতো হলো। ততক্ষণে ক্লাবে আরো অনেক বৃত্ত তৈরি হয়েছে, লোকজনের ভিড় বেড়েছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় আবছা দেখাচ্ছে সবাইকে।

জয়নুল আবেদিন শুনে বললেন, ছবি আঁকবা? ঢাকায় ভর্তি হও নাই? ডাইরেক্ট এসেছ? হু। ভর্তি হয়েছ এখানে?

নভেরা মাথা নাড়ল। নাজির আহমেদ সব খুলে বলল। জয়নুল বললেন, দেখি হাতটা দেখাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেরা বুঝতে না পেরে ইতস্তত করে।

জয়নুল বললেন, ঐখান থেকেই দেখাও।

নভেরা যেন আপত্তি সত্ত্বেও হাত বার করে দেখায়। অন্য কেউ হলে দেখাতো না। কিন্তু জয়নুল আবেদিন হাত দেখাতে বলছেন।

দূর থেকে হাত দেখলেন তিনি। স্পর্শ করলেন না। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, আর্টিস্টিক হাত, শিল্পী হতে পারবা।

কিন্তু অ্যাডমিশন হচ্ছে না যে? পিয়ারী বলল।

হবে, চেষ্টা করতে হবে। দেখি আমি কী করতে পারি। আসো একদিন সেন্ট স্টিফেন্স গার্ডেনসে। নাজিরের বাসায়। আমাদের তো ঐটা ঠিকানা এখন।

নুরুল ইসলাম হেসে বলল, আহার-বাসস্থান সব ফ্রি। নাজির ভাই না থাকলে কী যে হতো।

নভেরা দেখল ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরও খুব সুন্দর। রেডিওর ঘোষকদের যেমন হয়ে থাকে।

জয়নুল বললেন, নুরুল ইসলাম না থাকলে আমাদের কে যে রান্না করে খাওয়াতো! দারুণ হাত। তারপর পিয়ারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, পিয়ারী অনেক দিন আসো না দেখি? আসো বোনকে নিয়ে। হু, আর্টিস্ট হতে চায়, কিন্তু অ্যাডমিশন পাচ্ছে না। নাজির মাইয়াটার জন্য কিছু করা লাগে।

লন্ডন, আগস্ট, ১৯৫১

কয়েক মাস চলে গিয়েছে এখানে আসার পর। আর্ট স্কুল কিংবা কলেজে এখনো ভর্তি হতে পারি নি। বিবিসিতে নাজির ভাই, জয়নুল স্যারের সঙ্গে দেখা হবার পর প্রায় প্রতিদিন ৭৭ নং সেন্ট স্টিফেন্স গার্ডেনসে নাজির ভাইয়ের বাড়িতে যাই, কখনো সঙ্গে পিয়ারী থাকে, কখনো একা যাই। ঐ বাড়ির পরিবেশটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আরো অনেকেরই পছন্দ। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প নিয়ে আলোচনা হয়, রাজনীতিচর্চাও চলে। নাজির ভাইয়ের সবদিকে ইন্টারেস্ট।

জয়নুল আবেদিন প্রথম দিন হাত দেখে বলেছিলেন আমাকে দিয়ে ছবি আঁকা হবে, ভাস্কর্যের কথা তিনি বলেন নি। হয়ত ছবি বলতে ওটাও ধরেছেন। সেন্ট স্টিফেন্স গার্ডেনসের বাড়িতে যাওয়া-আসার পর থেকে আমার ছবি আঁকা শুরু হলো জয়নুল আবেদিন সাহেবের কাছে, তারপর থেকে আমি তাকে স্যার বলা শুরু করলাম। সেই আমার ছবি আঁকার হাতেখড়ি। স্কেচ, ড্রয়িং এসব দিয়ে শুরু। হাত, পা, মুখ টোরসো দেহের এইসব খণ্ড খণ্ড ছবি আঁকালেন আমাকে দিয়ে। তারপর পুরো মানুষের দেহ।

নাজির ভাই মাঝে মাঝে জয়নুল স্যারকে দেখে বলেন, কি কতদূর হলো? প্রগ্রেস হচ্ছে?

আবেদিন স্যার হেসে বলতেন, প্রগ্রেস হবে না? কে পড়ায়, কে ছাত্রী দেখবা না? নাজির ভাই হেসে বলতেন, স্কুলটা কার বাড়িতে তাও দেখতে হবে তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর কিছুদিন পর নাজির ভাই ফতেহ লোহানী আর নুরুল ইসলামের জন্য বিবিসিতে খবর পড়ার শর্টটার্ম কন্ট্রাক্টের ব্যবস্থা করে দিলেন, শুধু জয়নুল আবেদিন থাকলেন তার স্কলারশিপের প্রোগ্রাম আর অবসরে আমাকে ছবি আঁকা শেখানোর কাজ নিয়ে। মাঝে মাঝে পিয়ারী এসে যোগ দেয়। চমৎকার একটা আনন্দমুখর পরিবেশে দিন কাটছে এখানে। শুধু ঘুমোবার সময় রাতে ফিরি পিয়ারীদের বাসায়। পিয়ারী ঠাট্টা করে বলে, ঐ বাসায় থেকে গেলেই পারিস। কাটাস তো সমস্ত সময় ওখানেই।

লন্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

রাসেল স্ট্রিট টিউব স্টেশনে উঠে ডান দিকে যেতেই বৃটিশ মিউজিয়ামের সামনের দিক দেখা গেল। বিশাল, কারুকাজময় প্রাচীন ভবন, মিউজিয়াম হওয়ার মতোই।

নাজির ভাই বললেন, সমস্ত মিউজিয়াম দেখতে একদিন যথেষ্ট নয়। আজ আমরা শুধু গ্রিক, রোমান, ঈজিপসিয়ান ভাস্কর্যগুলো দেখব। গ্রাউন্ড ফ্লোরেই রয়েছে এসব। দেখা গেল প্রবেশপথেই এককোণে নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে, হাত উঠিয়ে রাখা। মার্বেলেই বসনের বিচিত্র ভাঁজ, সুডৌল হাতের কারুকাজ আর বেঁধে রাখা কেশরাশি নিখুঁত হয়ে ফুটে আছে। ত্বকের মসৃণ পেলবতা ভ্রম জাগায় সত্যি বলে। একই রকম আকর্ষণীয় মনে হলো দ্বিতীয় কক্ষে রাখা এক্রোব্যাটের মার্বেল মূর্তি। মনে হলো যেন এখুনি লাফ দেবে। চার নম্বর কক্ষে নগ্ন যুবক দুটির মূর্তিও অনবদ্য। গ্রিক ক্লাসিক্যাল পর্বে সম্পূর্ণ নগ্ন মূর্তির সংখ্যা কম। ছয় আর সাত নম্বর কক্ষে দেখা গেল কয়েকটি মার্বল ফ্রিজে যুদ্ধ, পশু শিকার আর ভোজন উৎসবের ভেতর দিয়ে রাজকীয় জীবনযাপনের দৃশ্যাবলি। লর্ড এলগিন পার্থেননের মন্দির থেকে যেসব ফ্রিজ আর মূর্তি এনেছিলেন সেসব রাখা আছে আট নম্বর কক্ষে। পার্থেননের পূর্বে, পশ্চিমে বেশকিছু ভাঙা মার্বল মূর্তি- দেবী এথেনা, আর পোসিডনের। এ সবই আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। কিন্তু যে মূর্তিটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে সেটি সাইক্লাডিক দ্বীপের সমাধিক্ষেত্রে পাওয়া মার্বলের নারীমূর্তি। খুবই সহজ আর সংক্ষিপ্ত এই মূর্তির প্রকাশভঙ্গি। এনাটমির বাহুল্য নেই, পেশিহীন হাত-পা, সাদামাটা একটি মানুষের দেহের কাঠামো। চোখ, ঠোঁট, স্তন কিছুই দেখানো হয়নি। স্টাইলাইজড হাত দুটি নেবে এসেছে পেটের কাছে অলসভঙ্গিতে। পা দুটি জোড়া। কেবল বাহুল্যবর্জিত নয়, দারুণভাবে সংক্ষিপ্ত।

নাজির ভাই কাছে এসে বললেন, জানতাম এটাই তোমাকে বেশি আকর্ষণ করবে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগের, কিন্তু দেখতে আধুনিক।

লন্ডন, অক্টোবর, ১৯৫১

নাজির ভাই বললেন, আমার ভাই হামিদ আসছে ঢাকা থেকে। সে আর্ট পড়বে। ঢাকা আর্ট কলেজে দুবছর পড়েছে। এখন এখানে পড়তে চায়। ভালোই হলো, তোমরা দুজনে অ্যাডমিশনের ব্যাপারে একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে আমি খুশি হলাম। ভাবলাম, যাক একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। শুধু চলাফেরার জন্য না, লেখাপড়ার জন্যও।

হামিদুর রহমান এসে ৩৩ সেন্ট স্টিফেন্স গার্ডেনসের বাসাতে উঠল। এর কিছুদিন পর জয়নুল আবেদিন স্যার চলে গেলেন। নুরুল ইসলাম, লেবু ভাইও নিজেদের থাকার জায়গা করে নিয়ে উঠে গেলেন। সেন্ট স্টিফেন্স গার্ডেনসের ফ্ল্যাটে থাকার লোক কমে গেল। কিন্তু প্রবাসী তরুণ বাঙালিদের আড্ডা আগের মতোই চলতে থাকল সেখানে।

হামিদকে নিয়ে আমি লন্ডনের মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারিগুলো আবার ঘুরছি। হামিদ এসব আগে না দেখলেও এদের খবর রাখে। তার লেখাপড়ার লেভেল আমার চেয়ে বেশিই মনে হলো। কথাবার্তায় একটা শৃঙ্খলা আছে। আমি বুঝতে পারছি এর সঙ্গ আমাকে উপকৃত করবে।

লন্ডন, জানুয়ারি, ১৯৫২

ক্যাম্বারওয়েল আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে গেলাম, সঙ্গে ছিল হামিদ। ফর্ম আগেই জমা দেয়া ছিল। নাজির ভাই প্রিন্সিপালকে ফোন করেছেন কয়েকবার। তারপর ইন্টারভিউয়ের ডাক এল। ইন্টারভিউ কেন? আমি তো চাকরি চাই নি।

নাজির ভাই বললেন, তোমার ডিগ্রি নেই, আমাদের দেশের স্কুল সম্বন্ধে এরা তেমন কিছু জানে না। তাই কিছু প্রশ্ন করে জেনে নেবে তোমার জানাশোনা সম্বন্ধে।

স্কাল্পচার ডিপার্টমেন্টের হেড মি. ফোগল আমাকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, স্কাল্পচার কেন শিখতে চাও?

আমি বললাম, যে কারণে আপনি শিখতে চেয়েছেন।

শুনে তিনি অনেকক্ষণ আমাকে দেখলেন। তারপর বললেন, স্কাল্পচারের সঙ্গে অন্য শিল্প মাধ্যমের তফাৎ কি?

আমি বললাম, ডিমেনশনের। স্কাল্পচার থ্রি ডিমেনশনের, অন্য আর্ট টু ডিমেনশনের, যদিও পারসপেকটিভের সাহায্যে থ্রি ডিমেনশনের ইফেক্ট আনার চেষ্টা করা হয়।

তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝলাম উত্তরে তিনি খুশি হয়েছেন। তিনি বললেন, একটা স্কাল্পচার দেখে কীসের ভিত্তিতে এর মূল্যায়ন করব আমরা?

আমি বললাম, এসথেটিকসের ওপর ভিত্তি করে। সৌন্দর্যানুভূতি সৃষ্টিতে সফল কিনা সেই বিচারে।

তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, সে তো বটেই কিন্তু সেই এসথেটিকস কোন্ ক্রাইটেরিয়ার ওপর ভিত্তি করে হবে তা জানা দরকার। এসব ডিটেইলস জানার জন্যই পড়াশোনা। তুমি যে জানো না, এতে আমি অবাক হচ্ছি না।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই হামিদ বলল, পাস না ফেইল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আই হ্যাভ নট ফেইলড সো ফার ইন লাইফ। পারহ্যাপস নেভার উইল।

হামিদ হেসে বলল, হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। ইউ গেট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট।

আমি বললাম, জয়নুল স্যারের ছবি আঁকা শেখানো, তোমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা খুব কাজে লেগেছে। না হলে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার সাধ্য ছিল না।

হামিদ বলল, থাক-থাক, ভদ্রতা করতে হবে না।

লন্ডন, এপ্রিল, ১৯৫২

হামিদ সকালে ফোন করল, তাকে খুব অস্থির মনে হলো। টেলিফোনে খুলে বলল না কিছু। তাড়াতাড়ি যেতে বলল সেন্ট স্টিফেন্স গার্ডেন্সে।

গিয়ে শুনলাম, নাজির ভাই তাকে প্যারিস যেতে বলছে, সেখানে আর্ট স্কুলে ভর্তি হোক এই তার ইচ্ছা। লন্ডনে নাকি পড়াশোনায় অনেক ব্যাঘাত। ছাত্ররা নানা এক্সট্রাকারিকুলার কাজে জড়িয়ে যায়।

শুনে আমি চুপ করে থাকলাম। কিছু একটা আঁচ করলাম। বললাম, বেশ তো যাও না। প্যারিস মানেই তো আর্ট, কালচার। ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন। তোমার ভালোর জন্যই বলেছেন।

হামিদ রেগে গিয়ে বলল, মাথায় থাক আমার ভবিষ্যৎ। আমার কাছে লন্ডনই ভালো।

প্যারিস হয়ত আরো ভালো লাগবে, আমার মুখে হাসি।

না লাগবে না। আমি জানি লাগবে না। আমি বুঝতে পারছি কেন নাজির ভাই আমাকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আই ডোন্ট লাইক ইট।

পছন্দ না হলেও হামিদকে প্যারিস যেতে হলো।

AMARBOI.COM

লন্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

হামিদ প্যারিস থেকে চলে এসেছে। তার সেখানে ভালো লাগে নি। একটা আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। ক্লাসে মন দিতে পারে নি। নাজির ভাইকে বলেছে ভাষাসমস্যার কথা। আমাকে শুধু বলেছে ভালো লাগে নি। নাজির ভাই বেশ অসন্তুষ্ট হলেন ওর ফিরে আসায়।

হামিদ লন্ডনে সেন্ট্রাল আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ক্লাসে যাচ্ছে নিয়মিত। প্রায় রোজই আমাদের দেখা হয়, কখনো দুপুরে রেস্তরাঁয়, কফি শপে, কখনো বিকেলে নাজির ভাইয়ের সেন্ট স্টিফেন্স গার্ডেন্সের বাড়িতে। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়, নাজির ভাই বিবিসি থেকে এসে যোগ দেন। হামিদের রান্না খাবার খেয়ে রাতে ফিরি আমি। হামিদ আমাকে পৌঁছে দিতে তৈরি হলে নাজির ভাই বলে ওঠেন, তুই পড়াশোনা কর। আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। হামিদ হেসে বলে, আর্টের জন্য আবার বাড়িতে পড়াশোনা কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজির ভাই ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলেন, চল্ তাহলে দুজনেই দিয়ে আসি।

টিউবে ঐ সময়ে যুগলদের ভিড়, সিনেমা দেখে অথবা নাচ শেষে ফিরছে। জড়াজড়ি করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। যদিও বসার জাগার অভাব নেই। চুমো খায় শব্দ করে। কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওদের এই নির্লিপ্ত বেপরোয়া ভাব আমার ভালোই লাগে। যা ভালো লাগছে তাই করছে।

লন্ডন, ডিসেম্বর, ১৯৫২

আকাশ আজকাল প্রায়ই দেখি না, মেঘেই ঢাকা থাকে। সূর্য একটু সময়ের জন্য উঠে পালিয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে সকাল, কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে বিকেল হতে না হতে আবার অন্ধকার নামে। বরফ পড়েছে কয়েক দিন আগে, গাছের পাতায়, ঘাসের ওপর এখনো সাদা হয়ে লেগে আছে। বেশ শীত পড়েছে।

নাজির ভাই চলে গিয়েছেন ঢাকা। বিবিসি-র সঙ্গে তার কন্ট্রাক্ট শেষ। হামিদ হোবোর্নের কাছে ক্র্যানলি স্ট্রিটে একটা থ্রি-বেড রুম ফ্ল্যাট নিয়েছে। এত বড় কেন? জিগ্যেস করাতে সে বলেছে, আর্টিস্টদের বাড়িতে জায়গা দরকার, কাজের জন্য তো বটেই। বন্ধু-বান্ধবদের থাকার জায়গা দেয়ার জন্যও। সে আমাকে তার ফ্ল্যাটের একটা এক্সট্রা চাবি দিয়ে বলল, এটা থাক তোমার কাছে। যখন খুশি ঢুকতে পারবে। আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করতে হবে না।

বাইরে আমাকে অপেক্ষা করতে হয় না, ফোন করেই আসি, অথবা দুজনে একসঙ্গে। ওর শেষের কথায় অল্প হাসছাম। সোজাসুজি কিছু বলতেও লজ্জা পায়। এই যে এত কাছাকাছি দুজন, তবু মাঝখানে একটা অদৃশ্য দেয়াল, আমারই তোলা। লন্ডন ব্রিজের মতো মাঝে মাঝে সেটা ওঠে, আবার নামে নিচে।

লন্ডন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩

এবার শহীদ দিবস করল লন্ডনের বাঙালি ছাত্র এবং অন্যান্য প্রবাসী বাঙালি। কনওয়ে হলে বেশ ভিড় হয়েছিল। বক্তৃতার পর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আবৃত্তি আর গান হয়েছে। আমি হামিদকে বলেছিলাম, আগামী বছর শহীদ দিবসে নাচের আয়োজন করা হলে আমি দায়িত্ব নেব। হামিদ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছে, নাচ? তুমি দায়িত্ব নেবে মানেটা কী? শহীদ দিবস কি নাচের জন্য?

আমি হেসে বলেছি, বল ড্যান্স না, এই ধরো নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে নাচ, বেশ প্রাসঙ্গিক হবে। তাই না?

হামিদ বলল, তা তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি? আমি বললাম, আমি কিছুই করব না তা কি হয়? আমিও তো বাঙালি।

খান আতা পাশ থেকে উঠে এসে বলেন, আমরা সবাই বাঙালি। প্রত্যেকেরই কিছু করা দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফতেহ লোহানী সামনের আসন থেকে বলেন, তা তো বটেই। পাঞ্জাবিগুলো পেয়েছে কী? সংখ্যাগরিষ্ঠের পাত্তা নেই, এমন দেশ আছে কোথাও?

লন্ডন, মার্চ, ১৯৫৩

শীত কমে গিয়েছে, গাছের পাতা সবুজ হচ্ছে ধীরে ধীরে। পাখি দেখা যাচ্ছে আবার। পার্কে, বাগানে ফুল ফুটছে, নানা রঙের সমারোহ নিয়ে বসন্ত আসছে।

পিয়ারী আর দুলাভাই ঢাকা চলে গেলেন। স্টেশনে গিয়ে বিদায় দিয়ে এলাম আমি আর হামিদ। পিয়ারী চোখ মুছে হামিদকে বলল, ওকে দেখবেন। আমার বোনটা ভীষণ ছেলেমানুষ। খুব আবদার করে। হামিদ হেসে বলল, জানি। এতদিনে ভালো করেই টের পেয়েছি। কিছু ভাববেন না। দুলাভাই হেসে বললেন, আমার এই শ্যালিকাটি ভাঙে কিন্তু মচকায় না। ওকে যত দুর্বল ভাবো তেমন সে মোটেও না। হামিদ আবার হেসে বলল, সেটাও জানি।

পিয়ারী আর দুলাভাই হাত নেড়ে ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকে গেল। আমরা দুজন হেঁটে এসে বাসে উঠলাম। আমরা ভিক্টোরিয়া স্টেশনে যাবো। সেখান থেকে টিউব।

লন্ডন, মে, ১৯৫৩

এখন সামার, সূর্য উঠছে ঝলমলিয়ে। যদিও মাঝে মাঝে ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের মতো আকাশ থেকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে। পার্কে এখন ফুলের ছড়াছড়ি। টিউলিপ, গ্লাডিওলি, রডোডেনড্রন, ক্রিসেনথিমাম আরো কত রকমের।

আমি এখন হামিদের ফ্ল্যাটে থাকছি। পিয়ারী চলে যাবার পর যখন আমার থাকার জায়গা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি তখন হামিদই প্রস্তাব দিল। তিনটা বেডরুমের মধ্যে একটা আমার জন্য ছেড়ে দিল সে। আমি এতে আপত্তি করার মতো কিছু দেখলাম না। অন্যরা কী বলবে সেটা নিয়েও মাথা ঘামালাম না। আমি যা ভালো বুঝি তাই করি, অন্যের যদি তাতে খারাপ লাগে তাতে আমার মাথাব্যথা নেই।

স্কুল নিয়ে দুজনেই ব্যস্ত। দুপুরে দেখা হয় অক্সফোর্ড স্ট্রিটে 'ফার্টিস' রেস্তরাঁয়, ওটাই আমাদের জন্য কাছাকাছি। বিকেলে টিউব স্টেশনেই অপেক্ষা করে দুজনে একসঙ্গে ফিরি ক্র্যানলি স্ট্রিটে। হামিদ রান্না করে, আমি টাবে শরীর ডুবিয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাই। হামিদ হাঁক-ডাক শুরু করলে টাওয়েলের জন্য হাত বাড়াই। যেদিন ভুলে যাই, হামিদ এসে শুকনো টাওয়েল দিয়ে যায়। ধমকের সুরে বলে, তোমার বাথ আর মেকআপে এত সময় লাগে কেন?

আমি হেসে বলি, আমি এনজয় করি। আমার একমাত্র বিলাসিতা।

লন্ডন, জুলাই, ১৯৫৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ জ্যাকব এপস্টিনের ক্লাস ছিল। গেস্ট টিচার হিসেবে তিনি এখন খুব বেশি ক্লাস নেন না, বয়স হয়েছে সত্তরের ওপর। স্কুলে মাঝে মাঝে আসেন। নিজের পছন্দমতো ক্লাস নেন। নিজের স্টুডিওতে কাজ করেন। ইচ্ছে হলে ছাত্রছাত্রীদের ডেকে নেন। আমাকে দেখে বললেন, ইন্ডিয়ান?

আমি বললাম, নো।

তার ধারণা শাড়ি-পরা মেয়ে মানেই ভারতীয়। ক্লাস শেষে তার কাজ করার ঘরে ডাকলেন। অসংখ্য অর্ধসমাপ্ত কাজ ছড়ানো। দেখতে দেখতে বললেন, অল স্কাল্পচার অফারস আস্ অপুরচুনিটি ফর এনজয়মেন্ট নট অনলি থ্রু সাইট, বাট অলসো থ্রু টাচ, ব্যালান্স অ্যান্ড একচুয়াল ফিজিক্যাল মুভমেন্ট। একটা স্কাল্পচারের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা তার দৃশ্যমান ফর্ম, কালার আর টেক্সচার দেখি, আরো দেখি স্পেসের ভেতর তার অবস্থান এবং মুভমেন্ট। একটা স্কাল্পচারের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এর কালার, ফর্ম, টেক্সচারের নতুন দিক আবিষ্কার করা যায়। এই যে নতুন ভিসুয়াল সেনসেশন তৈরি, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এন্ডলেস ইন্টারপ্রিটেশন, এটাই স্কাল্পচারের মূল চরিত্র। ক্লাসিক্যাল গ্রিক ভাস্কর্যই বলো, আর আধুনিক বিমূর্ত ভাস্কর্যই বলো, এই এন্ডলেস প্রোসেস অব চেঞ্জ থাকতে হবে। এই ধরনের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। বলতে বলতে তিনি মেটাল দিয়ে তৈরি একটা কাজ হাতে তুলে নিলেন। দেখতে দেখতে বললেন, এটার খুঁত কোথায় বলো তো?

আমি বোকার মতো তাকিয়ে থাকলাম। তিনি বললেন, এর খুঁত এই যে এখানে এখনো ব্যালান্স আসে নি। আধুনিক ভাস্কর্যে যেখানে বিমূর্ততা প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে এই ব্যালান্সের প্রয়োজন খুব বেশি। এই সেন্স অব ব্যালান্সই একটি ভাস্কর্যকে তার বস্তুগত সীমাবদ্ধতার বাইরে নিয়ে কল্পিত একটি স্পেসের ভেতর স্থাপন করে। এতে করে যারা দেখছে তাদের ভিসুয়ালাইজ করার ভঙ্গিটিই যায় বদলে। এই যে শিপটিং অব দা পাথ অব ভিসুয়ালাইজেশন এটাই ব্যালান্স আবার ব্যালান্সের জন্যই এই শিফটিং।

AMARBOI.COM

ফ্লোরেন্স, ডিসেম্বর, ১৯৫৩

ফ্লোরেন্স এসেছি, সঙ্গে হামিদ। তার বন্ধু আমিনুল এসেছে ঢাকা থেকে। এখানে পড়বে। ফ্লোরেন্স সব শিল্পীর কাছে তীর্থ-স্থান, ভাস্করদের কাছে তো আরো বেশি। এখানে এত বিখ্যাত ভাস্কর্য রয়েছে যে সেগুলো দেখেই সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। গিবার্টি, দোনাতেল্লো, মাইকেল এঞ্জেলো, চেল্লিনি এখানে চোখের সামনে, বইয়ের পাতায় ছবি নয়। সবার ওপরে 'ডেভিড'। মাইকেল এঞ্জেলোর অপূর্ব কীর্তি। আমি বারবার দেখতে যাই। মাংসপেশির ভেতরের শক্তি টানটান হয়ে আছে মার্বলে। অথচ দেখতে কী প্রকাণ্ড।

ভেনটুরিও ভেনটুরির কাছে কাজ শিখছি। এপস্টিন এর কাছে চিঠি দিয়েছিলেন, কাজ হয়েছে তাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামিদ একাডেমিতে কোর্স নিচ্ছে। কিছুদিন আমরা আলাদা ছিলাম। এখন একটা বাড়ি নিয়েছি। তিনজনে থাকছি, কাজ করছি, ঘুরছি। সুন্দর সময় কেটে যাচ্ছে, ফেরার পথে ভেনিস দেখতে হবে।

লন্ডন, জুলাই, ১৯৫৪

হামিদ ঘুম থেকে উঠে নিচে গিয়ে দুধের বোতল আর কয়েকটা চিঠি নিয়ে এসেছে। একটা চিঠি পড়া শেষ করে বলল, সাঈদ আসছে আগামী সপ্তাহে। এখানে থাকবে। সাঈদ আহমেদ হামিদের ছোট ভাই, আগেই শুনেছি। সেতার বাজানোর শখ, ইকনমিক্স পড়তে আসছে।

হামিদ বলল, সাঈদ এখানে এসে উঠলে তোমার থাকা ঠিক হবে না। খারাপ দেখাবে। আমি বললাম, খারাপ দেখাবে কেন, তিনটা বেডরুম আছে। হামিদ বলল, তবু। আমি বললাম, তাহলে? হামিদ বলল, চলো তোমার জন্য ফ্ল্যাট দেখা শুরু করি। আমি চুপ করে থাকলাম। হামিদ বলল, ভাড়ার জন্য ভেবো না। সে আমি দেখব।

অন্য কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানাতাম। হামিদের এই কথা আমার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হলো। এই এত মাস একসঙ্গে থাকার পর ধরেই নিয়েছি ও আমার জন্য সবকিছু করবে। হামিদ আমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হয়। তাতে আমি বাদ সাধতে যাই না।

লন্ডন, আগস্ট, ১৯৫৪

সাঈদ লন্ডন এসেছে। বেশ চটপটে ছেলে, মার্জিত রুচি। আর্ট সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আছে। নাটক, সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করে। তার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। দুভাই আমাকে নিয়ে মেতে আছে। মিসেস লিচফিল্ড বলেন, এরা বড় বেশি ফোন করে তোমাকে। তাও রাতের বেলা।

আসলে ওদের সকাল-সন্ধ্যা জ্ঞান নেই, যখন খুশি ফোন করে, চলে আসে। আমিও ক্লাস থেকে সোজা চলে যাই ক্র্যানলি স্ট্রিট রোডে হামিদের ফ্ল্যাটে। সেখানে এখন মহসিন বলে আর একজন বাঙালি ছেলে এসেছে। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে ভর্তি হয়েছে। সাঈদের সঙ্গে।

একদিন সাঈদ বলল, নাটক দেখবে? আমি বললাম, কোথায়?

সাঈদ বলল, হোবোর্নের কাছে স্টল থিয়েটারে। আলবার্তো রোসেলিনি তার নাটকের দল নিয়ে 'সেন্ট জোয়ান' নাটক মঞ্চস্থ করতে আসছেন, নায়িকা ইনগ্রিড বার্গমান।

শুনে লাফিয়ে উঠলাম। ইনগ্রিড বার্গমান আমার প্রিয় অভিনেত্রী। ঠিক যেমন গ্রেটা গার্বো। এখন গ্রেটা গার্বোর ফিল্ম দেখা যায় না। কিন্তু ইনগ্রিড বার্গমানের ফিল্ম হচ্ছে, সবগুলোই কয়েকবার দেখার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে বললাম, দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না। চলো, চলো।

দুভাই আমার কথায় হেসে অস্থির।

সাঈদ বলল, তুমি সিনেমা-পাগল জানতাম না।

আমি বললাম, সব সিনেমা না, কোনো কোনো সিনেমা। বিশেষ করে আমার প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী যে বইতে আছে।

হামিদ সাঈদকে বলল, সুইডিশ বই, সুইডিশ অভিনেতা-অভিনেত্রীর দিকে নভেরার একটা দুর্বলতা আছে। কারণটা জানি না। কারণটা জিগ্যেস করি নি।

আমি দুভাইয়ের দিকে তাকালাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, ওরা জীবনের ট্রাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে, কম কথায়, অল্প চাউনিতে এমনকি নীরবতা দিয়ে। ভেরি আর্টিস্টিক। গ্রেটা গার্বো, কিংবা বার্গমানের চোখের দিকে তাকালেই জীবনের পরিণতি যে ট্রাজেডিতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাঈদ বলল, দুঃখ-বিলাস পেয়ে বসেছে তোমাকে। দিস ইজ নট হেলথি। চলো আজ ব্রাইটনে যাওয়া যাক। সেখানে সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার স্পিরিট উৎফুল্ল হবে।

লন্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪

সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। ক্লাসে যাচ্ছি, স্টুডিওতে কাজ করছি, সন্ধ্যায় ফিরছি ক্র্যানলি স্ট্রিটে হামিদের ফ্ল্যাটে। কখনো হামিদ চলে আসে সেন্ট্রাল আর্ট স্কুল থেকে আমার স্কুলে। কাফেটেরিয়াতে একসঙ্গে যাই। আবার কখনো আমি চলে যাই ওর স্কুলে।

AMARBOI.COM

কাল ফিরতে দেরি হয়েছিল। সুদানিজ ছাত্র আবুদ খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। হামিদকে বলতে সে বেশ অসন্তুষ্ট হলো। তারপর বলল, কেন আমি কি খারাপ রান্না করি? আমি হেসে বললাম, কখনো বলেছি তুমি খারাপ রান্না করো? হামিদ গম্ভীর হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। আমি কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, ডোন্ট বি জেলাস। আমার কি অন্য বন্ধু থাকবে না? ক্লাসফ্রেন্ডরা যদি ইনভাইট করে, না করব?

হামিদ আমার হাত ধরল। হাতের মধ্যে মুখ লুকোলো। কিছু বলল না। আমি ওর চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কেটে দিলাম। ওকে এখন একটা ছেলেমানুষের মতো মনে হচ্ছে। আর ভীষণ বোকা।

প্যারিস, নভেম্বর, ১৯৫৫

এই নিয়ে তিনবার প্যারিসে। প্রতিবারই শহরটাকে নতুন বলে মনে হয়। এর এভেন্যু, পার্ক, বাড়িঘর, নদীর ব্রিজ সবই যেন ছবিতে আঁকার জন্য তৈরি। এখানে ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজনীতি, যুদ্ধ বিগ্রহের কথা মনেই পড়ে না। এটা ভালোবাসার শহর। মানুষকে, জীবনকে, শিল্পকে কাছে পাওয়ার শহর। কিছুই না করে শুধু যদি এভেন্যুর পাশে রাস্তার ওপর কাফেতে বসে বসে শুধু চেয়ে থাকা যায় তাও হয়ে ওঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোরম অভিজ্ঞতা। এই শহর আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। আমি সম্মোহিত হই। আমার রক্তের ভেতর এক ঘুমপাড়ানিয়া সুর জেগে ওঠে।

রদাঁর মিউজিয়ামে আগেও গিয়েছি। এবার হামিদ আর সাঈদকে নিয়ে গেলাম। ও কিছুক্ষণ দেখে ল্যুভ মিউজিয়াম দেখতে চলে গেল। হামিদ থাকল কিছুক্ষণ, তারপর সেও চলে গেল ল্যুভে। ওরা কেউ ভাস্কর না, তাই রদাঁর কাজে মুগ্ধ হয় কিন্তু অভিভূত হয় না। আমি আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে থাকি। তার থিংকার, দা কিস, দা গেটস অফ হেল, এডাম অ্যান্ড ইভ দেখে চোখ ফেরানো যায় না, মনোযোগ সূচ্যগ্রের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। রদাঁই আধুনিক ভাস্কর্যের পিতা, নতুন দর্শনের প্রবক্তা, নতুন যুগের দূত। তিনি ঘোষণা করলেন হেলেনিক, হেলেনিস্টিক, রেনেসাঁ এবং বারোক ভাস্কর্যের দিন ফুরিয়ে গিয়েছে এবং এখন থেকে ভাস্করদের নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে। তিনি নিজে ভাস্কর্যে ইমপ্রেসনিজমের আঙ্গিক ব্যবহার করলেন, মসৃণ নিখুঁত মোলায়েম মূর্তি তৈরি না করে তিনি মূর্তির গা অমসৃণ রেখে নানা কৌণিকতার সৃষ্টি করে আলোছায়া খেলার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি ভাস্করদের উপদেশ দিলেন ইউরোপের বাইরে, প্রাচীন মিশরে, পশ্চিম এশিয়ায়, ভারতে, চীনে, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় ভাস্কর্যের ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে। ভাস্কর্যে কেন যে তাকে আধুনিকতার পথিকৃৎ বলা হয় তা তাঁর কাজ দেখলেই বোঝা যায়। হেনরি মুরের পরই রদাঁ আমাকে প্রভাবান্বিত করেছে বেশি। প্যারিসে এসে রদাঁর মিউজিয়মেই আমার সময় কেটে যায়। আমি তাঁর মূর্তিগুলোকে ঘুরেফিরে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি।

রাতে পেনসিওনে হামিদ একটা বই পড়ে শোনালো, কবি রেইনে মারিয়া রিলকে যিনি রদাঁর সেক্রেটারি ছিলেন, তাঁর ভাষায়, মূর্তির ভেতর থাকা উচিত সেই চরিত্র যা দেখে বলা যাবে এখানে স্রষ্টার এক অনুভূতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এটা দেখতে এত মনোহর আর প্রকাশে এত তীব্র, এত জাগ্রত আর সচেতন যে মনে হবে প্রকৃতিই ভাস্করের কাছ থেকে নিয়ে কাজটি নিজের বলে দাবি করছে।

লন্ডন, ডিসেম্বর, ১৯৫৫

জ্যাকব এপস্টিন আমার একটা বাস্ট তৈরি করে দিয়েছেন, প্লাস্টার অব প্যারিসে। বললেন, বুড়ো হাতে এই মাধ্যমেই তোমার কাজটা করা সহজ হলো। ব্রোঞ্জে করার মতো ধৈর্য বা সময় নেই আমার। তোমার পছন্দ হলো কি না জানাবে।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বললাম, ওটা অমূল্য এক উপহার। আমি সারাজীবন সঙ্গে রাখব। তিনি হেসে বললেন, তাহলে তো ব্রোঞ্জেই করা উচিত ছিল।

সুদানের ছাত্র আবুদ দেখে চেঁচিয়ে উঠল। বলল, সেলিব্রেট করতে হবে। এপস্টিন সবার বাস্ট তৈরি করেন না। তার ফ্ল্যাটে পার্টির আয়োজন হবে আজ সন্ধ্যায়। আমি নিষেধ করলেও শুনল না। নিমন্ত্রণ জানালো আরো কয়েকজনকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব হৈচৈ হলো সেই সন্ধ্যায় আবুদের বাড়িতে। প্রায় নিমন্ত্রিতই আফ্রিকান, তারা খুব আনন্দপ্রিয়। প্রচুর মদ খায়, নাচে অক্লান্ত হয়ে। উৎসব যেন ওদের রক্তে মিশে আছে। ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হলো

ফরেস্ট হিলে আমার বাসার সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে। ভয় পেয়ে গেলাম। দুষ্কৃতকারী নয় তো? কী করব ভাবছি। এমন সময় লোকটি সামনে চলে এল। দেখলাম হামিদ। আমি অবাক হয়ে বললাম, এখানে এত রাতে কী করছ? হামিদ শুকনো গলায় বলল, তোমার অপেক্ষা করছি। ফোন করে করে কোনো সাড়া পাই নি সন্ধ্যা থেকে। চলে এলাম। তুমি এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে? আমি বললাম তাকে। শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আমি কেন পার্টিতে গেলাম জানতে চাইল। আবুদ সম্বন্ধে কটূক্তি করল।

আমি বললাম, সিন ক্রিয়েট করো না। আশপাশের বাড়ির লোকজন জেগে উঠবে। হামিদ রেগে বলল, উঠুক। আই ডোন্ট কেয়ার।

আমি হামিদের হাত ধরলাম। বললাম, ভেতরে এসো, ঘরে বসে কথা হবে। এত রাগতে নেই।

পরদিন মিস লিচফিল্ড বললেন, তোমার ঘরে কি কাল রাতে কেউ এসেছিল?

আমি বললাম, না তো।

মিস লিচফিল্ড সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, মনে হলো দুজনে হেঁটে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে। আমার শুনতে ভুল হয় না। তুমি ঠিক বলছ তো?

মিস্ লিচফিল্ডের উদ্বেগ আর অভিভাবকগিরি আমাকে বিরক্ত করে না। বরং ভালো লাগে। আমার জন্য কেউ ভাবছে এটা আমাকে সুখী করে। আমি মিস্ লিচফিল্ডের প্রশ্নের উত্তর দিই না। তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকি।

লন্ডন, জানুয়ারি, ১৯৫৬

পিটার ছেলেটা ভালো, ক্লাসফ্রেন্ডের মধ্যে ওকে বেশ পছন্দ আমার। খুব সিনেমা দেখার শখ, আর্ট ফিল্ম। ওর সঙ্গে ইঙ্গমার বার্গমান, ভিত্তোরিয়া ডি সিকা, রবার্তো রোসেলিনির বেশ কয়েকটা বই দেখলাম। পিটার প্রায়ই বলে সে ফিল্ম ডাইরেক্টর হবে। এরকম একটা ইচ্ছে আমার ভেতরেও আছে। দুজনে ফিল্মের খুঁটিনাটি নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করি। সোহোতে ওয়ার্দুর স্ট্রিটে ম্যাকাবার কফি শপে বসে বসে অনেক সন্ধ্যা কাটে আমাদের।

পরশুদিন সিনেমা দেখে ফেরার পথে পিটারের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। এর আগেও গিয়েছি কয়েকবার। কিন্তু পরশুদিন থেকে যেতে হলো।

সকালে ক্র্যানলি স্ট্রিটে ফিরে দেখি হামিদ বসে সিঁড়িতে, দুই চোখ লাল। আমার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকালো।

বলল, সারারাত ঘুমুই নি। তুমি কোথায় ছিলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম। শুনে খেপে গেল হামিদ। উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল, হাউ কুড ইউ, হাই কুড ইউ?

আমি বললাম, মূর্ছা গিয়েছিলাম পিটারের বাসায় পৌছানোর পর। না, কিছু খাওয়ার পর নয়, এমনিতেই। আমি তো মাঝে মাঝেই মূর্ছা যাই। পিটার আর কী করে, শুইয়ে রেখেছিল আমাকে।

শুনে হামিদ আরো খেপে যায়। কাছে এগিয়ে আসে যেন ভয়ঙ্কর কিছু করবে। আমি বলি, চলো ভেতরে যাই। এখানে এরকম করলে লোকজন এসে যাবে।

ভেতরে গিয়ে মুখোমুখি বসি আমরা। তার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে বলি, আই লাইক ইউ হামিদ। তার মানে এই নয় কাউকে পছন্দ করতে পারব না।

হামিদ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না, পারবে না।

আমি হেসে বলি, তা কী করে হয়? আমি তোমার স্ত্রী নই। আর স্ত্রী হলেও অমন শর্ত কখনই মেনে নেবো না আমি।

কেন মেনে নেবে না? সবাই নেয় তুমি কেন মানতে পারো না?

আমি সবাই নই। আই অ্যাম ডিফারেন্ট। পারহ্যাপস আই এম এ বিট মোর সেলফিস দ্যান আদারস। অল টোল্ড আই অ্যাম নট লাইক আদারস। এটা এতদিনে তোমার বোঝা উচিত ছিল। তোমার আমার একটা মিলিত জগৎ আছে, কিন্তু তার বাইরেও আমার একটা পৃথক সত্তা আছে।

হামিদ কিছু বলে না। কেবল আপত্তি তুলে মাথা নাড়ে।

আমি উঠে গিয়ে তার মাথায় হাত দিই, চুলে বিলি কাটি। তারপর আস্তে আস্তে বলি, তুমি আমার জন্যে অনেক কিছু করো, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ। তার বিনিময়ে আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চেও না।

হামিদ আমার হাতের মধ্যে মুখ রাখে। তাকে তখন খুব ছেলেমানুষ মনে হয়।

লন্ডন, মার্চ, ১৯৫৬

কখন যে তিনি ঘরে ঢুকে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছেন টের পাই নি। ফিরে দাঁড়ালাম যখন তিনি আস্তে করে হাসলেন। জ্যাকব এপস্টিন বললেন, তোমার কাজে হেনরি মুরের প্রভাব দেখছি। একই রকম ফর্ম, কমপোজিশন আর স্পেসের ব্যালান্স। কিছু কিছু কাজ যেখানে হাত-পাগুলো লম্বা করেছ, সেখানে জিয়াকমেতির প্রভাবও স্পষ্ট।

তার কথা শুনে আমি কাজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এ কথা আগেও শুনেছি অন্যদের কাছে, এখন তার মুখ থেকে শুনলাম। তিনি বললেন, অন্যের অনুসরণ স্বাভাবিক, তবে অনুকরণ করতে যেও না। সর্বাঙ্গে অরিজিন্যাল হওয়া মুশকিল, কারু-না-কারু প্রভাব থাকেই। ঐতিহ্যের কাছে আমরা সবাই ঋণী। কিন্তু এরি মধ্যে স্বকীয়তা অর্জন করতে হবে, নিজের স্টাইল বার করতে হবে। এটাই অগ্নিপরীক্ষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, কীভাবে সেটা সম্ভব? তিনি হেসে বললেন, অনুশীলন, অনুশীলন, অনুশীলন। আর কল্পনাশক্তির ব্যবহার। এই যে হেনরি মুর, তাঁর প্রথম জীবনের কাজে আমার প্রভাব ছিল। মায়া সভ্যতার কাছেও সে ঋণী, আফ্রিকা থেকেও সে অনুপ্রেরণা পেয়েছে। কিন্তু অন্তিমে নিজের স্টাইল বের করে এনেছে। এটাই তাঁর সাফল্য।

কয়েকদিন পর হামিদের সঙ্গে হ্যাম্পস্টিডে পার্কহিল রোডের ১১/এ বাড়িতে গেলাম। হেনরি মুর থাকেন এখানে, পাশেই তাঁর অনুরাগী শিল্প-সমালোচক হার্বার্ট রিডের বাড়ি। তাঁদের দুজনের কারু সঙ্গে দেখা হলো না। পার্কহিলের পেছনেই 'মলে' বারবারা হেপওয়ার্থ আর তাঁর স্বামীর বাড়ি। এক প্রৌঢ়া বাগানে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে তুলছেন। নাম বলতে সোজা হয়ে বললেন, আমিই বারবারা। শুনে আমরা অবাক। ওভারঅলের পকেটে কাদামাখা গ্লাভস রেখে দিয়ে করমর্দন করলেন। আমার পরিচয় পাওয়ার পর বললেন, খুব বেশি মেয়েরা ভাস্কর্যে এগিয়ে আসে না। তুমি এসেছ কেন?

আমি বললাম, ভাস্কর্যে মাতৃত্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয় বলে।

শুনে তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, উইটি আনসার। সব শিল্পকর্মেই কি সেই বোধহয় না?

আমি বললাম, ভাস্কর্যে এটা শুধু বোধেই সীমাবদ্ধ থাকে না, কংক্রিট রূপ নেয়। শুনে তিনি হেসে বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী। এসো তোমাকে আমার কাজ দেখাই।

সেদিনের পর আরো কয়েকবার গিয়েছি তাঁর বাড়ি। তিনি আমাকে পছন্দ করেছেন।

হামিদ আমাকে হার্বার্ট রিডের 'স্কাল্পচার অ্যান্ড ড্রয়িং' বই থেকে হেনরি মুরের উক্তি পড়ে শোনালো। তিনি লিখেছেন Beauty in the later Greek or Renaissance sense is not the aim of sculpture. Between beauty and expression there is a difference of function. The first aims at pleasing the senses, the second has spiritual vitality which for me is more moving and goes deeper than the sense. Because a work does not reproduce natural appearances it is not, therefore, an escape from life but may be a penetration into reality.

আমি হাততালি দিয়ে বললাম, ইউরেকা, পেয়েছি, পেয়েছি। হামিদ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, এটা বার করে তোমাকে শোনানোর জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

লন্ডন, মে, ১৯৫৬

বাবার চিঠি পেলাম। আমার জন্য চিন্তিত। কেন চিঠি দিই না? খুব কি ব্যস্ত? কবে ব্যস্ততা শেষ হবে? কবে ফিরে যাবো? জানতে চেয়েছেন। নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হয়। বাড়িতে নিয়মিত চিঠি দিই না। আমার জন্য বাবা-মার চিন্তা করার কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, তবু বাবা-মাকে চিন্তা করতে হয়। আর আমার জন্য তাদের চিন্তা একটু বেশি। আমি মেয়েটা যে একটু বেশ পাগলাটে, একটু বেশি বেয়াড়া। আমার সুখের জন্য বাবার দুশ্চিন্তার অবধি নেই।

হামিদ ফ্ল্যাট বদলেছে, একই বাড়িতে, ওপরের ফ্লোরে গিয়েছে। এক বুড়ো ইংরেজের সঙ্গে ফ্ল্যাট শেয়ার করে থাকছে দুই ভাই। কারণ জিগ্যেস করেছিলাম, কিছু বলে নি। আর্থিক কোনো সমস্যা কি দেখা দিয়েছে ওর? আমার খরচ ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে। পার্ট টাইম কাজ করে কিছু টাকা পেয়েছি। এখন কমাস ও সাহায্য না করলেও পারে। শুনে হামিদ হেসে বলেছে, এই তো আমাদের যাবার সময় হয়ে এল, এই বছরই তো শেষ।

শোনার পর থেকে আমি যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছি। দেশে ফেরার দিন আর কতদূর?

বুঝলা মিয়া হামিদ ঐ মাইয়াটার পেছনে মেলা টাকা খরচ করছে। বাড়ি থেইকা টাকা যাইত আর মনের খুশিতে খরচ হইছে। ছাত্রজীবনে থ্রি বেডরুম ফ্ল্যাট হুনছো কোনোদিন? শেষে হইল কি, ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে ফ্ল্যাটের ভাড়া দেওয়ার টাকা নাই, বাড়ি থেইকা আর টাকা আসে না, এখানকার কারবার বুইঝা ফালাইছে। বাড়িআলা আইল একদিন। ছয় মাসের ভাড়া বাকি, ব্যাপারটা কী? হামিদ মাথা চুলকায়। বাড়িআলা বলে, কী করো তোমরা? হামিদ জানায়, আর্টিস্ট। শুইনা বাড়িআলার চোখে পানি আইয়া পড়ে। বলে, আমারও শখ আছিল। বাপে লাগায়া দিছে রিয়েল এস্টেটে। এহন ভাড়া গুনতাছি। আর্টিস্ট তুমি? থাহো, আরো কিছুদিন থাহো। আস্তে আস্তে বাকি ভাড়া শোধ দিও।

এইভাবে আরো তিন মাস গেল। এরপর বাড়িআলা তার এজেন্ট পাঠাইল, হয়ত ভাবল নিজে আইলে আবার কান্দন লাগব। এজেন্ট আইসা উকিলের নোটিশ দিয়া গেল। একদিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হইব। কোর্ট নিষ্পত্তি করবে ভাড়ার ব্যাপারটা। টাইট অবস্থা মিয়া।

আমাদের ওপরে থাকে এক ইংরেজ বুড়া, পেনশনার। সে দেইখা কইল, বিপদে পড়ছ বুঝি? আসো আমার ফ্ল্যাটে। তিন বেডরুমের দুইটায় কোনো কাম নাই। খালিই থাকে। তোমাদের দিলাম। শুইনা অবাক। কয় কী ইংরেজের পো! ঠাট্টা করতাছে নাহি। ভাবগতিক দেইখা বুড়া কয়, একদিন নিচে আছাড় খাইয়া পইড়া গেছিলাম। তোমরা তুইলা আনছ উপরে। হেই কথা ভুলি নাই। শুইনা তাজ্জব। আমাদের সেই ঘটনা মনে নাই, রাতের বেলা নেশার ঘোরে কত লোকরে উঠাইতাছি নামাইতাছি, ক্যাডা খেয়াল রাখে কও? ইংরেজের পো মনে রাখছে। আর কী করা,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলদি সুটকেস নিয়া উঠাইলাম বুড়ার ফ্ল্যাটে। এজেন্ট আইসা তাজ্জব, একদিনও না, আধা দিনেই ফ্ল্যাট খালি।

এই যে ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যেও হামিদ নিয়মিত নভেরার খরচ চালিয়ে যেতে থাকল, বাড়ি থেকে টাকা আসা বন্ধ, হামিদ তখন এক ইহুদি স্বর্ণকারের দোকানে কন্ট্রাক্ট নিল, বাড়িতে বসে স্টোনের জুয়েলারি বানিয়ে দেবে। প্রতি একশো স্টোন ফিলিং-এর জন্য দশ পাউন্ড। তখনকার দিনে অনেক টাকা। আর ঐ সময়ে নভেরা হঠাৎ হঠাৎ টাকা চেয়ে নিতে শুরু করল। কয়েনসিডেন্সই বলতে হবে। তো আগেও চেয়েছে আমার খেয়াল হয় নি। একদিন এসে বলল, সুদানিজ ক্লাসফ্রেন্ডের কাছে ৩০০ পাউন্ড ধার করেছিল, এখন সে ফেরত চাইছে। না দিলে তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে হবে একমাস। শুনে হামিদ অস্থির। দিনরাত স্টোন জুয়েলারি বানায়। সব টাকা নভেরাকে দেয়। আমি বিবিসিতে সেতার বাজিয়ে যে টাকা পাই সেটা দুজনের খাওয়া-দাওয়ার জন্য খরচ করি।

আমার তখন বিতৃষ্ণা এসে গেছে। হামিদের কাণ্ডকারখানা আর ভালো লাগল না। নভেরাকেও মনে হলো খুব সেলফিস। ওর সব বোনই সেলফিস। বোনে বোনে খুব সদ্ভাব ছিল না ভেতরে ভেতরে। একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা ছিল নিজেদের মধ্যে কে বেশি জনপ্রিয় এই বিষয় নিয়ে।

১৯৫৬-এর মাঝামাঝি ঠিক করলাম, দেশে ফিরে যাবো। আমি তখন হামিদের ইমোশনাল আর ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস থেকে বিরক্ত এবং ফেড আপ। একটা মেয়েকে ভালোবাসলে কি এমনভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে? নভেরাও অবশ্য হামিদকে ভালোবাসত, কিন্তু হামিদের মতো অত গভীরভাবে না। তার আরো বন্ধু ছিল লন্ডনে, যাদের কথা মাঝে মাঝে হামিদকে বলে অস্থির করে তুলতো। হামিদ উঠেপড়ে লাগত কী করে নভেরাকে আরো সাহায্য করা যায়। পুরুষদের ব্যবহার করার জন্য নভেরার বেশ কতগুলো ট্রিকস ছিল। সে পুরুষদের সাইকোলজি ভালোভাবেই বুঝত।

আমি আসবার আগে একদিন এসে বলে, আমার ডিপ্লোমার থিসিস লিখে দাও। আমি বললাম, লিখে দেবো কিন্তু তুমি কী দিবা আমারে?

নভেরা অম্লানবদনে বলল, যা চাও তাই দিব।

বুঝলা ব্যাপারডা। সাঈদ তাকালেন হাসনাতের দিকে। এই ঘটনা হাসনাত আমিনুল ইসলামের কাছেও শুনেছে, তবে অন্যভাবে।

সাঈদ আহমেদ দরজার কাছে যেতে যেতে বললেন, আমি চলে আসি ১৯৫৬-এর আগস্টে, হামিদ আসে অক্টোবরে। নভেরা আসে ১৯৫৭-এর প্রথম দিকে। এসে ওঠে আওলাদ হোসেন রোডে আমাদের খালিবাড়িতে, কাছেই আশেক লেন যেখানে হামিদ থাকে। আবার লন্ডনের মতো হামিদের ওপর নির্ভর করে চলতে থাকে নভেরা। ওয়ান থিং এবাউট হার, সি অলওয়েজ ডিপেন্ডেড অন সাম ওয়ান। আর সব সময়ই কেউ-না-কেউ অপেক্ষা করত তাকে সাহায্য করার জন্য। শেষদিকে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে জানি না, অন্তত যে পর্যন্ত তার সম্বন্ধে খবর রাখি সি অলওয়েজ হ্যাড এ প্যাট্রন। আর বিভিন্ন কারণে সে বারবার প্যাট্রন বদলেছে। তার মধ্যে বেটার প্রসপেক্টস একটা। সি ওয়াজ এ গো গেটার।

দরজা বন্ধ করতে করতে সাঈদ বললেন, সি লিভড ইন এ ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড। সি ডিড নট নো হু সি ওয়াজ।

ফেড ইন... ঢাকায় এলিফ্যান্ট রোডের একটি ফ্ল্যাট, দেয়ালে তৈলচিত্র, ওয়াটার কালার, স্কেচ। ছোট টেবিলগুলোতে কাঠের আর পাথরের ভাস্কর্য। মুর্তজা বশীর আর হাসনাত কোণাকুণি বসে। বশীর পাইপ টানছে, তার হাতে একগুচ্ছ কাগজ, বাইরে মেয়র নির্বাচনের স্লোগান, মিছিলের কোলাহল, ফেরিঅলার ডাক।... মিডিয়াম শট... ক্লোজ শট... অডিও...

হাসনাত : নভেরা সম্বন্ধে আরো কিছু বলুন। তাকে প্রথম কোথায় দেখলেন?

বশীর (পাইপ ধরিয়ে নিয়ে) তাকে আমি প্রথম দেখি ঢাকায় ১৯৫৮ সালে। তখন আমিনুল ফ্লোরেন্স থেকে এসেছে। একদিন বলল, আরে হামিদ এসেছে, সঙ্গে নভেরা নামের একটা মেয়ে। দুজনে শহীদ মিনারে কাজ করছে। বলে আমিনুল হেসেছিল। শুনে আমার কৌতূহল হলো। সেই সময়ে একটা বাঙালি মেয়ে প্রায় সম্পর্কহীন একজন পুরুষের সঙ্গে এইভাবে থাকতে পারে ভাবতে অবাক লেগেছে বললে কম বলা হবে। প্রায় অবিশ্বাস্য। তাকে দেখতে পুরনো ঢাকায় হামিদদের বাড়ি আশেক লেনে গিয়েছিলাম। আমিনুলকে সঙ্গে নিয়ে।

(বলতে বলতে বশীর উঠে দাঁড়ালো। দেয়ালে তার নিজের পেইন্টিঙের কাছে গিয়ে দেখল, তারপর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল)

বশীর দেখলাম নভেরা খুব সুন্দরী, বড় বড় চোখ, কাজল দেওয়া, শরীর আকর্ষণীয়, একটু গোলগাল। কালো শাড়ি পরে আছে। সব মিলিয়ে সুন্দরী। কিন্তু আমার কাছে তাকে মনে হয়েছে প্রাণহীন। যেন একটা সুন্দর মৃতদেহ। যে কবার দেখেছি তাকে হাসতে দেখি নি, সব সময় বিষণ্ন থাকত।

হাসনাত লাহোরে যখন দেখা হলো তখনো কি একই ইমপ্রেশন?

বশীর হ্যাঁ। লাহোরে মল রোডে চ্যারিং ক্রসের কাছে ছিল আর্টস কাউন্সিল অফিস, অন্য নাম ছিল 'আলহামরা'। ১৯৬১ সালের প্রথম দিকে একদিন সেখানে গিয়ে নভেরাকে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে নভেরা বলল, চিনতে পারেন? ভদ্রতা রক্ষার জন্যই যেন বলা, কোনো উষ্ণতা ছিল না তার কথায়। দেখলাম সেই কালো শাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাই হিল জুতো।

হাসনাত সেদিন কি কোনো অনুষ্ঠান ছিল আর্টস কাউন্সিলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বশীর না। আর্টিস্টরা বিকেলে ওখানে যেত আড্ডা দিতে, একে অন্যের সঙ্গে দেখা করতে। পাশেই ছিল নেডুজ হোটেল। এস এম আলী থাকত সেখানে। পরে তারা দুজন গুলবাগে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল শুনেছি। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ছিলেন আর্টস কাউন্সিলের সেক্রেটারি। এস এম আলীর সঙ্গে তাঁর অফিসে, কখনো এস এম আলীর হোটেলে আড্ডা হতো। নভেরা মাঝেমধ্যে থাকত। তার সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গতা হয় নি। বোঝাই যেত এস এম আলী আর তার মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যাই হোক নভেরা আমাকে আকর্ষণ করে নি।

হাসনাত : খুব আশ্চর্যের কথা। যাক, তাকে শেষ কোথায় দেখেছিলেন?

বশীর প্যারিসে ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশ হবার আগেই আমি প্যারিসে চলে যাই সপরিবারে। ম্যুরালের ওপর একটা কোর্স নিলাম। দেশ স্বাধীন হলো। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অ্যামব্যাসিতে একটা রিসেপশনে গিয়ে হঠাৎ নভেরার সঙ্গে দেখা। বলল, কেমন আছেন? দেখলাম, কালো শাড়ি অপরিবর্তিত আছে। পিঠময় চুল ছড়ানো, একটু মোটা হয়েছে। হাতে লাঠি, দুহাত থরথর করে কাঁপছে। হয়ত পার্কিনসনস্ ডিজিজ। তাকে বেশ ক্লান্ত আর কিছুটা হতাশাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল। আমি বললাম, ভালো আছি আপনি কেমন আছেন? কী কাজ করছেন?

নভেরা বলল, দিন চলে যাচ্ছে। কাজ? হ্যাঁ, খুব বড় বড় কাজ করছি এখন।

আমি বললাম, এক্সজিবিশন করবেন না?

নভেরা চিন্তিতমুখে বলল, কী করে করব? কাজগুলো এত বড় যে বার করতে হলে স্টুডিওর দরজা-জানালা ভেঙে বার করতে হবে।

হাসনাত : বলেন কী! তাই বললেন?

বশীর হ্যাঁ। নভেরা একটা রহস্য। (বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল) চট্টগ্রামে আসছেন কবে? ২৫ শে জানুয়ারি? আচ্ছা তখন দেখা হবে। এর মধ্যে আমি নভেরা সম্বন্ধে আমার কাছে যা পত্র-পত্রিকা আছে খুঁজে বার করে রাখব। ...মিডিয়াম শট... ক্লোজ আপ শট... অডিও... ফেড আউট...

ঢাকা থেকে করাচি পিআইএ-র সুপার কনে, করাচি থেকে রোমে আলিটালিয়ার ডিসি সেভেনে, সেখান থেকে ট্রেনে ফ্লোরেন্স। দুদিনে সম্পূর্ণ এক নতুন জগতে পৌঁছে গেল আমিনুল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আলাদা, বাড়িঘর অন্য রকমের, মানুষগুলো ভিন্ন। সবচেয়ে যা বেশি চোখে পড়ল তা এখানকার জীবনযাপনের দ্রুতগতি। সবাই কাজে ব্যস্ত। আবার হাসছে, খেলছে, গান গাইছে অবসরে। জীবনের এখানে নানা বর্ণ, নানা ছন্দ, নানা গন্ধ।

১৯৫৩-এর আগস্ট। আমিনুল স্কলারশিপে এসেছে পড়তে, দুবছর থাকবে ফ্লোরেন্সে। এখানকার জীবন তার ভালো লাগল প্রথম দৃষ্টিতেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবার আগে লন্ডনে হামিদকে চিঠি দিয়েছিল, লিখেছিল লন্ডন হয়ে যাবে, দেখা করবে যদি সময় থাকে। কিন্তু আসতে হলো রোম হয়ে। ফ্লোরেন্স পৌঁছেই হামিদকে চিঠি দিয়ে জানালো সে। কয়েকদিন পরই হামিদের চিঠি এল। হামিদ লিখেছে, সে আর নভেরা আসবে। চিঠি পড়ে একটু বোকা বনে গেল আমিনুল। নভেরা কে? নাম শুনে ইটালিয়ান মনে হচ্ছে। যদিও মেয়ের না হয়ে শহর বা জায়গার নাম হিসেবেই বেশি মানানসই। হামিদ কি নভেরা নামের মেয়েটিকে বিয়ে করেছে? কই লেখে নি তো কখনো। চিঠির উত্তর দিল আমিনুল। আমন্ত্রণ জানানোর পর কৌতূহল নিয়ে লিখল, নভেরা কে?

কয়েকদিন পর হামিদের চিঠি এল। দু-এক কথার পর লিখেছে, নভেরা একটি বাঙালি মেয়ে, লন্ডনে ক্যাম্বায়ওয়েল আর্ট স্কুলে ভাস্কর্য শিখছে। তারপর লিখেছে, বাকিটা তুমি সামনাসামনি দেখলেই বুঝবে।

এতে রহস্য আরো ঘনীভূত হলো। বাঙালি মেয়ে, তার আত্মীয়া নয়, অথচ দুজনে একসঙ্গে আসছে ফ্লোরেন্সে। এদেশে বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড খুব সাধারণ ব্যাপার সে এটা জেনে গেছে, কিন্তু তাই বলে একসঙ্গে এত দূর চলে আসতে পারে সে ভাবতে পারে নি। তাও নভেরা ইটালিয়ান না হোক, বিদেশী কোনো মেয়ে হলে নাহয় কথা ছিল। যাই হোক, এরপর চিঠি দেওয়া হয় নি। ক্লাস শুরু হয়ে গেল। ছুটোছুটি করতে গিয়ে সময় চলে যায় হু-হু করে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে দেখে নিল ফ্লোরেন্স শহরের সব দর্শনীয় স্থান। ট্যুরিস্টদের মতো প্রথমে, তারপর দেখল আর্টের ছাত্র হিসেবে। উফিজি গ্যালারি, একাডেমি মিউজিয়াম, বিভিন্ন গির্জায় রাখা বিখ্যাত ছবি দেখে তৃপ্তি মেটে না তার।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে হঠাৎ একদিন হামিদ এসে হাজির ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে। সঙ্গে নভেরা। সুশ্রী ফরসা চেহারা, মাঝারি দৈর্ঘ্য, মুখে হেভি মেক-আপ। দারুণ স্মার্ট মেয়ে। চোখের নিচে কাজল, ওপরের ভ্রূ সরু করে আঁকা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কালো শাড়ি, কালো ব্লাউজ, তার ওপর বাদামি রঙের কার্ডিগান। মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব, চঞ্চলা নয় আবার রাশভারিও নয়,এই দুয়ের মাঝখানে ফেলা যায় এমন একটি ব্যক্তিত্ব। সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া। প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লাগার মতো।

আসবে লিখেছে, তাই বলে হুট করে দিন-তারিখ না-জানিয়ে এসে পড়বে ভাবতে পারে নি আমিনুল। যখন সে শুনল তারা তার সঙ্গেই থাকবে, হোটেলে কিংবা পেনসনে নয়, তখন প্রমাদ গুনতে হলো। হোস্টেলে সব রুম অকুপাইড, তাছাড়া ছাত্রছাত্রী না হলে জায়গা পাবার কথাও না। কোথায় রাখবে এই দুশ্চিন্তা তার যত, ওদের দুজনের সে বিষয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই। বেশ হালকা মেজাজে কথা বলছে, হাসছে, হাসাচ্ছে। আমিনুল ওদের দুজনকে তার ঘরে বসিয়ে রেখে হোস্টেল সুপারের কাছে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুপারের রুমে ঢুকে সে বলল, হঠাৎ করে আমার দুই কাজিন এসেছে লন্ডন থেকে। কয়েকদিন থাকবে, ফ্লোরেন্স দেখবে। কোথায় রাখা যায়?

হোস্টেল সুপার শুনে মাথা চুলকালো খানিকক্ষণ। তারপর হেসে বলল, সেনোর আমিনুল তুমিই একা নও। প্রায় ছাত্রেরই এই অবস্থা হয়। হুট করে তাদের কেউ-না-কেউ এসে যায়। ফ্লোরেন্স তো ট্যুরিস্টদের শহর। এত কিছু দেখার। তার ওপর আর্ট লাভার হলে তো কথাই নেই।

শুনে আমিনুল অন্ধকারে আলোর আভাস পেল। এরকম ঘটনা আগেও হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সমাধানও করে দিয়েছে হোস্টেল সুপার। কৃতজ্ঞস্বরে বলল, তাহলে ওদের ব্যবস্থা করা যাবে?

হোস্টেল সুপার বললেন, করা নিশ্চয়ই যাবে, দুটি তো মাত্র মানুষ। কিন্তু হোস্টেলে অবশ্যই নয়। শুনে ফেটে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে গেল আমিনুল। শুকনো গলায় বলল, তাহলে?

তিনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তোমার কাজিন ব্রাদার তোমার সঙ্গে থাকতে পারে কদিন। কিন্তু কাজিন সিস্টারকে তো আর তোমার সঙ্গে একত্রে থাকতে বলতে পারি না। এক কাজ করো, কেয়ারটেকারকে বলে দেখো। শুনেছি ওর নিচের ঘরটা খালি অথবা খালি হতে যাচ্ছে।

আমিনুল সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেল হোস্টেল কেয়ারটেকারের বাড়ি। হোস্টেলের কাছেই, তাই দশ মিনিটেই পৌঁছে গেল। ভাগ্য ভালো সে বাড়িতেই ছিল। তাকে বলল ঘরের কথা। শুনে কেয়ারটেকার থুতনি কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, এক সপ্তাহের জন্য দিতে পারি ভাড়া। এর বেশি না। একজন আগাম ভাড়া দিয়ে গিয়েছে। তাকে দিতে হবে।

শুনে সে হাতে স্বর্গ পেল যেন। হোক না এক সপ্তাহ, আপাতত বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। কেয়ারটেকারকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রায় দৌড়ে ফিরে এল হোস্টেলের ঘরে। ওরা দুজন তখন গল্পে মশগুল, নভেরা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা উঁচু করে দুহাতের মধ্যে মুখের চিবুক ধরে আছে। পা দুটো ওপরে তুলে নাড়াচ্ছে একটু পরপর। দারুণ নিশ্চিন্ত আর আয়েশি দেখাচ্ছে দুজনকেই। সব ঝামেলা আমিনুলের ওপর চাপিয়ে ওরা দুজন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে গল্প করছে। আমিনুলকে দেখে হামিদ বলল, কি রে হাঁপাচ্ছিস কেন? একটু যেন মুখ লালচে দেখাচ্ছে।

আমিনুল হেসে বলল, ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায় বাইরে হাঁটলে এমনই হয় দেখছি এখানে। যা হোক তোদের থাকার একটা ব্যবস্থা করা গেল। খুব সন্তোষনজক না, তবে সাময়িক হিসেবে দেখলে খারাপও না।

সব শুনে নভেরা উঠে বসল। তারপর বলল, এদেশেও দেখছি মেয়েদের ব্যাপারে বেশ বৈষম্যমূলক ব্যবহার।

আমিনুল বুঝতে না পেরে বলল, কেমন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেরা বলল, হামিদকে তোমার সঙ্গে থাকতে না দিয়ে আমাকে থাকতে বলতে পারত। হামিদ যেত কেয়ারটেকারের কেয়ারে।

শুনে হামিদ হো-হো করে হাসল। তারপর চোখ টিপল আমিনুলের দিকে তাকিয়ে।

নভেরা ঠাট্টা করছে নাকি বুঝতে পারল না সে। বোকার মতো তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বলল, দূর তা কী করে হয়। কাজিন ব্রাদার, সিস্টার এদেশেও একসঙ্গে থাকে না বোধ করি।

আহা, থাকলে দোষ কী। মানুষ হিসেবে দেখলে মেয়ে আর পুরুষের বাইরের সম্পর্কটা বড় হয়ে ওঠে না। ফ্রান্সে কিন্তু এমন না। সার্ত্রে আর সিমন বুভোয়াঁ একসঙ্গে থাকছে বিয়ে ছাড়াই। লেফট ব্যাঙ্কের কাফেতে ওদের দুজনকে প্রায়ই দেখতাম।

তথ্যটা আমিনুলের জানা ছিল না, যদিও ঢাকায় থাকতেই সার্ত্রে, এক্সিসটেনসিয়ালিজম এইসব নাম ইনটেলেকচুয়াল বন্ধুদের কাছে প্রায়ই শুনেছে। সে প্যারিস যায় নি, কিন্তু লেফট ব্যাঙ্ক যে ইনটেলেকচুয়ালদের আড্ডার কেন্দ্র তা শুনেছে।

ঢোক গিলে বলল, গিয়েছেন নাকি ফ্রান্সে?

নভেরা বলল, কয়েকবার। বিউটিফুল কান্ট্রি। ওয়ান্ডারফুল পিপল। খুব আর্ট মাইন্ডেড। আর প্যারিস? প্যারিস হলো রিয়েল রাঁদেভুঁ ফর লাভারস আর হ্যাভেন ফর আর্টিস্টস্। যান নি আপনি?

আমিনুল বলল, না। এই তো ইউরোপে এলাম। ইটালিই ভালো করে দেখা হয় নি এখনো।

নভেরা বলল, ইউ আর লাকি। ফ্লোরেন্সে আসার স্বপ্ন দেখে সব শিল্পী। আপনি শুধু আসেন নি, থাকবেন অনেক দিন।

আমিনুল হেসে বলল, ছাত্র হয়ে এসেছি। পড়াশোনার চাপ। ঘোরার সময় পাবো কিনা কে জানে।

খুব পাবেন। তবে ইচ্ছে থাকতে হবে। তারপর একটু হেসে বলল, লন্ডনে আসবেন। আমরা থাকতে থাকতে আসবেন। এখন আমাকে ফ্লোরেন্স দেখান।

আমিনুল বলল, কী দেখবেন তার একটা প্ল্যান তৈরি করে নিলে হয় না?

নভেরা বলল, সব দেখব, বিশেষ করে ভাস্কর্য। দোনাতেল্লো, বার্নিনি, বেল্লিনি, মাইকেলএঞ্জেলোর ভাস্কর্য। বতেচেল্লি, কারাভাজ্জিও, মাসাচ্চো ওরা তো আছেনই।

হামিদ বলল, তার আগে রেনেসাঁ আর ফ্লোরেন্স সম্বন্ধে জানতে হবে। এইসব ছবি আর ভাস্কর্যের ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। সেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অনেক ফ্যাক্টর কাজ করেছে। জানা থাকলে শিল্পকর্মগুলোর তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রেনেসাঁ মানেই হিউম্যানিজম, ইনডিভিজুয়ালিজমের পর।

নভেরা হেসে বলল, হামিদ খুব ইনটেলেকচুয়াল। ওর সব ভাই-ই তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনুল বলল, হ্যাঁ। আপনি ঠিক ধরেছেন।

নভেরা হাসিমুখে বলল, ধরতে যাবো কেন? গত দুবছর থেকে লন্ডনে নিজের চোখে দেখছি, শুনছি। ওরা সবাই খুব ইন্টারেস্টিং। খুব স্টিমুলেটিং ওদের কমপ্যানি।

আমিনুল সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, বিলক্ষণ।

ভিয়া দেল্লা আর্টিস্টিতে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া গেল। একটা ঘর আর একটা বড় স্টুডিও। বাড়িউলি প্রৌঢ়ার নাম ফিওমা হুগো, চাবি দিয়ে তাদের তিনজনকে বলল, এটা আর্টিস্ট ভিলেজ, কজন থাকে, কে আসে যায় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু হৈচৈ করো না। অন্যরা বিরক্ত হয়ে নালিশ করতে পারে।

শুনে নভেরা বিরক্ত হলো। ভেতরে ঢুকে আমিনুলকে বলল, কেন আমাদের দেখে কি মনে হয় হৈচৈ করার মতো মানুষ?

হামিদ হেসে বলল, মিসেস হুগো হয়ত সবাইকেই এই কথা বলে। তারপর বলল, কবি দান্তের বাড়ির কাছে, তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য বলতেই হয় কিছু।

আমিনুল বলল, বাড়ি তো পাওয়া গেল, কিন্তু খাবার-দাবার? রান্নাবান্না করবে কে?

নভেরা তাকালো তার দিকে, তারপর হেসে বলল, কেন হামিদ রাঁধবে। ও চমৎকার রান্না করে। একটু বেশি টমাটো দেয় তবে।

আমিনুল বলল, বেশ একটা সমস্যার সমাধান হলো। কিন্তু আর একটা রয়ে গেল। বলে সে বেডরুমের দিকে তাকালো।

তারা সবাই শূন্য স্টুডিও ঘরে দাঁড়িয়ে, ভেতরে বেডরুমের দরজা খোলা। সেখানে একটা বড় বিছানা দেখা যাচ্ছে, লোহার তৈরি, পুরনো স্টাইলের।

আমিনুল ইতস্তত করে বলল, কে কোথায় শোবে? বিছানা দেখছি একটা, এদিকে আমরা দুজন কাজিন ব্রাদার্স, একজন সিস্টার।

শুনে নভেরা হাসল। তারপর ভেতরের ঘরটা ঘুরে এসে বলল, চমৎকার ব্যবস্থা। বিছানাটা বেশ বড়। আমরা তিনজনই শুতে পারব।

শুনে আমিনুল হাঁ করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। দেখে মনে হলো না ঠাট্টা করছে। তবু বিশ্বাস করার মতো কথা না। চোখ কপালে তুলে বলল, তিনজনে এক বিছানায়! যাহ্, তা কী করে হয়।

খুব হয়।

কে কোথায় শোবে? আমিনুল হঠাৎ বোকার মতো প্রশ্ন করে।

আসুন দেখাচ্ছি। নভেরা হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। ঘরে গিয়ে চাদরবিহীন তোশকের ওপরে শুয়ে পড়ে ঠিক মাঝখানে, তারপর দুই হাত দুদিকে রেখে বলে, এখানে বাঁয়ে আপনি, ডানে হামিদ। মাঝখানে আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনুল হামিদের দিকে তাকালো। সে মিটিমিটি হাসছে। আমিনুল মাথা নেড়ে বলল, দূর তা কী করে হয়। আমি স্টুডিওতে বিছানা করে নেব, আপনারা দুজন শোবেন ঐ বিছানায়।

নভেরা বিছানায় উঠে বসল, স্প্রিং নড়ছে, সেও নড়ছে। তারপর আদেশের ভঙ্গিতে বলল, আমি যা বলছি তাই হবে। যদি না শোনেন তাহলে আমি অন্য বাড়ি ভাড়া করতে যাবো।

হামিদ হেসে বলল, হবে, তাই হবে। আমিনুল নতুন এসেছে দেশ থেকে, এসব ব্যাপারে লজ্জা পায় এখনো। ঠিক হয়ে যাবে।

আমিনুল তবু ইতস্তত করে। বলে, এভাবে শুলে ঘুম আসবে? দূর, তার চেয়ে আমি স্টুডিওতে থাকি।

খুব ঘুম হবে। যা ঠাণ্ডা পড়েছে, একা শুলে ঠাণ্ডায় জমে যাবেন। তবে হ্যাঁ, আমাদের তিনজনের তিনটা আলাদা কম্বল থাকবে। ওটাই পরদা। বলে নভেরা হাসল।

প্রথম রাত খুব আড়ষ্ট হয়ে শুলো আমিনুল, ঘুম এল না চোখে। এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, অভূতপূর্ব এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকল সারারাত।

খুব ভোরে প্রথমে উঠল নভেরা। ঘরের ভেতর আলো-আঁধারি। সে বিছানা থেকে নিচে নেমে বলল, আমার দিকে কেউ তাকাবে না এখন। শাড়ি দিয়ে আড়াল করে নিই আগে।

ঘরের ভেতর শাড়ির খসখস শব্দ শোনা গেল, দ্রুত পায়ের শব্দ। তারপর সে উল্লাসে বলে উঠল, হ্যাঁ, তাকাতে পারো। আমি পরদার এপাশে এখন। চেঞ্জ করে নিই, মেক-আপ শেষ করি। শেষ হলে বলব। তখন নামবে বিছানা থেকে।

হামিদ কম্বলের ভেতর থেকে বলল, নভেরার এটা অভ্যাস। লন্ডনেও এমন করে। মেক-আপ ছাড়া মুখ কাউকে দেখতে দেয় না। শাড়ি বদলানোর জন্য এমন করছে না সে। নভেরা উইদাউট মেক-আপ চিন্তা করা যায় না।

নাস্তা শেষ করে নভেরা বলল, আমাকে ভেনটুরিও ভেনটুরির কাছে নিয়ে যাবে না?

হামিদ বলল, তার সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার?

নভেরা বলল, না। কথা বলার সময় পেলাম কোথায়?

হামিদ বলল, কথা বলে নাও। ব্যস্ত মানুষ, বিখ্যাত ভাস্কর, তার স্টুডিওতে হুট করে গেলে তো চলবে না। হয়ত দেখাই করবে না।

খুব করবে। জ্যাকব এপস্টাইন তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছেন। আমার সঙ্গে আছে। ঠিকানা ফোন নম্বর সব নিয়ে এসেছি।

তাকে প্রথমে ফোন করো। জ্যাকব এপস্টিনের রেফারেন্স দাও। বলো যে তুমি তাঁর ছাত্রী, তিনি তোমাকে ভেনটুরির কাছে ট্রেনিং নেওয়ার কথা বলেছেন।

না প্রথমে ট্রেনিঙের কথা বলব না। হয়ত রাজি হবে না। বলব দেখা করতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামিদ আমিনুলের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে তো কেমন বুদ্ধিমতী? নভেরা সব পুরুষকে বশ করে ফেলার কায়দা জানে।

নভেরা শুনে ভ্রূ কুঁচকালো। তারপর বলল, আমি স্কিমিং টাইপের তাই বলতে চাইছ কি?

বলতে চাইছি তুমি খুব প্র্যাকটিকাল। হামিদ তার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, কাল যাওয়া যাবে। আজ আমরা মাসাচ্চিওর ছবি দেখতে যাবো। পার্সপেকটিভের জনক মাসাচ্চিও। উফিজি গ্যালারিতে বতিচেল্লির ভেনাস দেখা হলো, সে তো চোখের সুখ। শেখবার জন্য মাসাচ্চিওর ছবি দেখতে যেতে হবে।

নভেরা বলল, আমাকে আবার 'ডেভিড' দেখতে হবে।

হামিদ অবাক হয়ে বলল, কোন্‌টা, দোনাতেল্লোর না মাইকেলএঞ্জেলোর? মাইকেলএঞ্জেলোর।

এই নিয়ে কবার হবে? এত দেখার কী আছে? আরো কত ভাস্কর্য রয়েছে ফ্লোরেন্সে।

মাইকেলএঞ্জেলোর 'ডেভিডের' মতো নেই। দেখে যেন তৃপ্তি মেটে না।

কেন? হামিদ তাকায়।

তুমি বোকার মতো প্রশ্ন করো মাঝে মাঝে। 'ডেভিডের' সামনে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায় কী প্রচণ্ড শক্তি আর সাহস চৌদ্দ ফুট উঁচু ঐ মার্বল মূর্তির ভেতর থরথর করে কাঁপছে, যেন জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো এখনি ছিটকে আসবে। অথবা আরো ভালো তুলনা হয় যদি একটা চেপে রাখা স্প্রিঙের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পেশিতে শক্তি টানটান হয়ে আছে, সমস্ত শরীর সতর্ক অথচ চোখে-মুখে কী নির্লিপ্তি, কী প্রশান্তি, কী গভীর আত্মবিশ্বাস।

দোনাতেল্লোর 'ডেভিডে' কি এই অভিব্যক্তি নেই?

না। পায়ের কাছে গলিয়াথের ছেঁড়া মুণ্ড রেখে দোনাতেল্লোর 'ডেভিডের' বীরত্ব খুব বাহ্যিক, অবভিয়াস করে তোলা হয়েছে। তার 'ডেভিডে' স্বতঃস্ফূর্ততা নেই, একটু যেন অকওয়ার্ড। মাইকেলএঞ্জেলোর 'ডেভিডের' তুলনা হয় না। আশ্চর্য, এসব তোমার চোখে পড়ে নি।

আমরা সব একচক্ষু হরিণের মতো। আমি পেইন্টার, তাই পেইন্টিঙের সৌন্দর্য খুঁজছি, মুগ্ধ হচ্ছি। তুমি শুধুই স্কাল্পচারের। হামিদ হাসল।

আমিনুল বলল, এই হয় শিক্ষানবীশ হলে। ট্যুরিস্টদের মতো সবকিছু একই দৃষ্টিতে, সমান মনোযোগ দিয়ে দেখা হয় না।

নভেরা উঠে দাঁড়ালো। কালো শাড়ির ওপর ধূসর কার্ডিগান চাপিয়ে নিয়ে বলল, চলো যাওয়া যাক। কোথায় আছে তোমার মাসাচ্চো?

আমিনুল হাতের ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বলল, আরনো নদীর উত্তরে সান্তা ম্যারিয়া নভেলা গির্জায়।

হামিদ হেসে বলল, নভেরা গির্জা বললে পারতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনুল নভেরার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার নামটা খুব ইটালিয়ান। না দেখলে আপনাকে ইটালিয়ানই ধরে নেবে। কে রেখেছিল এই সুন্দর নামটা?

বাবা।

সান্তা ম্যারিয়া নভেলা গির্জায় মাসাচ্চোর 'হোলি ট্রিনিটি' ছবিটি ঝোলানো। বেশ কয়েকজন দর্শক দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ দেখার পর হামিদ বলল, মাসাচ্চোর 'ট্রিবিউট মানি' দেখতে যেতে হবে।

সেটা কোথায়? নভেরা তাকালো।

সান্তা ম্যারিয়া দেল কারমিনে। আর একটা গির্জায়। আমিনুল বলল।

আজ কি শুধু গির্জায় ঘুরতে হবে? নভেরা তাকালো হামিদের দিকে।

গির্জা মানেই আর্ট মিউজিয়াম। রেনেসাঁর আগে গির্জাকে কেন্দ্র করেই ছিল শিল্পকর্ম। সুতরাং না গিয়ে উপায় কী। তারপর থেমে বলল, সান্তা ম্যারিয়া গির্জায় অনেক ছবি আছে। 'ট্রিবিউট মানি' ছাড়াও সেখানে আছে মাসাচ্চোর 'এক্সপালসান্ অফ অ্যাডাম অ্যান্ড ঈভ'।

ভিয়া রোসানা দিয়ে তারা তিনজন হাঁটছে। নভেরার হাতে ম্যাপ। সে বলল, পিয়াৎসালে মাইকেলএঞ্জেলো চলো। সেখানে পার্কে বসে লাঞ্চ খাবো। ওপর থেকে ফ্লোরেন্স শহর দেখব, শুধু ছবি দেখে দেখে চোখ টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে।

হামিদ বলল, যেতে চাও, চলো। কিন্তু ছবি দেখে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছ এ কথা বলো না। 'ডেভিডের' দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে পারো, তখন কিছু হয় না।

'ডেভিড' দেখার সময় চোখ খুব ব্যবহার করতে হয় না। ইউ ইউজ ইওর ইনার আই। নভেরা হাঁটতে হাঁটতে বলে। তারা পিয়াৎসা ডি পিট্রি ডানে ফেলে কোস্টা মান জিওজিও-তে মোড় নিল।

পিয়াৎসালে মাইকেলএঞ্জেলো বেশ উঁচুতে, রেলিং ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে আরনো নদী, নদীর ওপারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সান্তা ম্যারিয়া দেল ফিওরি, যেখানে ব্রুনেলেস্কির জগদ্বিখ্যাত ডোম। লাল টাইলের ডোমের ওপর থেকে নেমে এসেছে শাদা মার্বল যেন ডোমের পাঁজর। পাশে হালকা সবুজ রং।

নভেরা দেখতে দেখতে বলল, ঐ গির্জায় নির্মাণকুশলতার সঙ্গে শিল্পবোধের যে অপূর্ব সমন্বয় তার তুলনা হয় না। এখান থেকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। আকারে বিশাল কিন্তু মন ভোলায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে।

আমিনুল বলল, উঁচু যে কাম্পানিল, ওটার ডিজাইন করেছিলেন জিওত্তো। তার মৃত্যুর পর কাজটি সমাপ্ত করে আন্দ্রেয়া পিসানো।

হামিদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যে স্থাপত্যে আগ্রহী জানতাম না। ভেরি গুড। ফ্লোরেন্সে সবকিছুই জানা দরকার, শুধু পেইন্টিং নিয়ে থাকলে চলবে না। আজ থেকে আমিও সবকিছু দেখব। লাইক এ রেনেসাঁম্যান। কি বলো নভেরা?

নভেরা তখন তন্ময় হয়ে ফ্লোরেন্স শহরের দিকে তাকিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন করার পর ভেনটুরিও ভেনটুরি সকাল দশটায় যেতে বললেন নভেরাকে। তাঁর স্টুডিও ভিয়া ভেনেসিয়ায় হেঁটে যেতে বিশ মিনিট লাগবে। হামিদের দিকে তাকিয়ে নভেরা বলল, তোমরা ওর বাড়ি পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলো। ভেতরে আমি একাই যাবো।

কেন? আমরাও যেতে পারি। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলাম, ফ্লোরেন্সের একজন বিখ্যাত ভাস্কর, পরিচিত হলে মন্দ কী?

না থাক। অন্তত আজ না। তোমাদের কথা বলি নি। আমি যেন একাই এসেছি এমন ধারণা দিলাম।

নভেরাকে ভেনটুরির স্টুডিওর কাছে পৌঁছে দিয়ে ওরা দুজন ভিয়া লা মারমোরার দিকে মোড় নিল। তাদের গন্তব্য পিয়াৎসা বেল আর্টি যেখানে একাডেমি অব আর্টস। হামিদ তিন মাসের জন্য একটা কোর্সে ভর্তি হবে, ম্যুরাল শিখতে চায়। আমিনুল তার প্রফেসরকে বলে রেখেছে। তিনি জানিয়েছেন বিদেশী ছাত্রদের জন্য এ ধরনের শর্ট কোর্স আছে, সেখানে এখনো কিছু সিট খালি। হামিদ ভর্তি হতে পারবে।

দুপুরে ভেনটুরিওর স্টুডিওর সামনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও নভেরার দেখা পাওয়া গেল না। হামিদ ঘন ঘন ঘড়ি দেখল। তারপর নিজের মনেই বলল, অবাক কাণ্ড। বারোটায় আসতে বলেছিল, এখন একটা বাজে, গেল কোথায়?

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দুজনে লাঞ্চের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কাফেটারিয়াতে ঢুকল। স্প্যাগেটি খেতে খেতে হামিদ বলল, নভেরা আমাদের নেয় নি কেন বুঝতে পেরেছ?

আমিনুল বলল, না।

হামিদ বলল, ও পুরুষদের সম্পর্কে বোঝে। ভেনটুরির সামনে আমাদের দুজনকে নিয়ে উপস্থিত হলে তার প্রতিক্রিয়া কি খুব ভালো হতো? প্রথমেই বিরূপ হয়ে যেত। শুকনো ভদ্রতা করে বিদায় দিত। ট্রেনিঙের ধারে কাছেই যেত না।

আমিনুল ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, দারুণ। এত বুদ্ধি।

হামিদ স্প্যাগেটি পেঁচিয়ে নিতে নিতে বলল, শুধু বুদ্ধিমতী নয়, রহস্যময়ী। তারপর কাঁটা চামচ মুখের কাছে নিয়ে বলল, রহস্যময়ী না হলে মেয়েদের আকর্ষণীয় মনে হয় না।

তোমাকে মনে হয় খুব আকর্ষণ করেছে। আমিনুল তাকালো।

অবশ্যই। নভেরা সবাইকে আকর্ষণ করে।

আমিনুল বলল, তোমাদের ব্যাপারটা কী? এই যে একসঙ্গে ঘুরছ, এত মাখামাখি। তোমরা কি বিয়ে করবে?

হামিদ হাসল। তারপর মধুর স্বরে বলল, কেউ কিছু বলতে পারে না। আমাদের সম্পর্কটাও রহস্যময়। অনেকটা নভেরার কারণেই। সি ফ্যাসসিনেটস মি। আর নট ইউ ফ্যাসিসিনেটেড?

আমিনুল কিছু বলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেনটুরিও ভেনটুরি নভেরার দিকে তাকালো অনেকক্ষণ। খাম খুলে চিঠিটা পড়ল। পড়া শেষ হলে চোখ তুলে তাকালো। তারপর বলল, আমার সময় নেই। তবে তুমি আমার কাজ দেখতে পারো। সপ্তাহে তিনদিন আসবে, দেখবে আমি কীভাবে কাজ করি, দরকার পড়লে সাহায্য করবে। এইটুকুই করতে পারি তোমার জন্য। তুমি এপস্টিনের চিঠি নিয়ে এসেছ, না বলতে পারি না। এসো আমার স্টুডিও দেখবে।

স্টুডিও দেখে নভেরা অবাক। ঘরভর্তি মূর্তি, কোনোটা শুরু হয়েছে, কোনোটা অর্ধসমাপ্ত, সবই বড় বড় আর কার্টুন চরিত্রের মতো। ভেনটুরি বলল, এগুলো করছি ফ্লোরেন্সের একটা পার্কের জন্য। ছোট ছেলেমেয়েরা এইসব স্কাল্পচারের সঙ্গে খেলবে, এদের গা বেয়ে উঠবে, ফুটো দিয়ে মাথা গলিয়ে নামবে। বিনোদনের জন্য তৈরি। কিন্তু এসব দেখতে দেখতেই ওরা স্কাল্পচারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলবে। এটাই সিক্রেট।

সিক্রেট? নভেরা বুঝতে না পেরে তাকালো।

সিক্রেট অব স্কাল্পচারস পপুলারিটি। দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত কিংবা বিস্ময়ে হতবাক হলে চলবে না। পরিচিত আপনজনের মতো সাহচর্য দিতে হবে স্কাল্পচারকে। দৈনন্দিন জীবনের অংশ হতে হবে। চলো তোমাকে ফ্লোরেন্সের কয়েকটি পার্ক দেখিয়ে নিয়ে আসি। সেখানে আমার কিছু স্কাল্পচার আছে।

নভেরা ভেনটুরির সঙ্গে বের হলো। তখন বেলা এগারোটা। এক ঘণ্টা হলো সে এখানে এসেছে। প্রথমে তারা গেল গার্ডিনো ভেলা ঘেরা দেস্কায়, বড় একটা পার্ক, ভিয়া ভেনেসিয়ার পুবদিকে অল্প দূরত্ব। এখানেই পিয়াৎসালে দোনাতেল্লো। এক ঘণ্টা পর ট্যাক্সি নিয়ে তারা রওনা হলো জিয়ার্দিনো টরিজিনানির উদ্দেশে আরনো নদী পার হয়ে। সেখানে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দুজনে এল পিয়াৎসা দেল্লা সিনোরিয়ায়।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ভেনটুরি বললেন, এটা ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে বিখ্যাত জায়গা। একদিকে প্যালাৎসো ভেক্কিও, তার পাশে উফিজি গ্যালারি, কাছেই লোগগিয়া দেই লানৎসি, এদিকে রয়েছে ক্যাথিড্রাল, জিওত্তোর কাম্পানিল, ব্রুনেলেসকির ডোম, নেপচুন ফোয়ারা আর ঐ যে ছোট গোলাকার ভবন, ব্যাপটিস্ট ট্রি। তুমি নিশ্চয়ই উফিজি গ্যালারি গিয়েছ? 'বার্থ অফ ভেনাস,' 'প্রিমাভেরা' সব দেখা হয়েছে?

নভেরা বলল, হ্যাঁ।

ভেনটুরি বলল, চলো তোমাকে লোগগিয়া দেই লানৎসিতে চেল্লিনি, আর জিয়ামবোলোনার ভাস্কর্য দুটি দেখাই। খোলা জায়গায় আছে বলে লোকে ওদের দিকে ভালো করে তাকায় না।

হাঁটতে হাঁটতে তারা প্যালাৎসো ভেক্কিওর পাশে একদিকে খোলা ভবনটির পাশে এসে দাঁড়ায়। ভেতরে উঁচু বেদিতে কয়েকটি মূর্তি। নিচে কিছু ছেলেমেয়ে বসে আছে। এক হাতে তরবারি অন্য হাতে কাটা মুণ্ড হাতে শিরস্ত্রাণপরিহিত প্রায় উলঙ্গ মূর্তিটি উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

ভেনটুরি বললেন, চেল্লিনির তৈরি 'পারসিয়ুস উইথ দা হেড অব মেডুসা,' মেডুসার দিকে তাকালে অন্ধ হয়ে যেতে হয় তাই কেটে ফেলার পরও পার্সিয়ুস তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। কিন্তু টেকনিকের জন্য যেটা উল্লেখযোগ্য তা হলো তার প্রসারিত হাত ম্যাস এবং স্পেসকে এককের মধ্যে বেঁধে ফেলেছে। হাতের নিচে শূন্যতার যে স্পেস সেটিও এই স্কাল্পচারের অংশ। মার্বলে এই আলোছায়ার এবং শূন্যতার অন্তর্ভুক্তি অসম্ভব ছিল। ব্রোঞ্জ মিডিয়ামের যে কী বিপুল সম্ভাবনা তা আর আগে এমনভাবে কেউ দেখাতে পারে নি। সিম্পলি সুপার্ব। আর ঐ যে পাশে দেখছ তিনটি মূর্তি, এঁকেবেঁকে উপরে উঠছে যেন সিঁড়ি দিয়ে অথবা সিলিন্ডারের ভেতর তারা গতিশীল, এটা জিয়ামবোলানার রেপ অব সাবাইন ওম্যান। মার্বলে গতিবেগ, দ্রুত যাত্রা, ভীতিকর পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলার এটা এক সুন্দর নিদর্শন। বিষয়টা অবশ্য নিদারুণ। রোমান সৈন্য স্যাবাইন এলাকায় গিয়ে নারী অপহরণ করে আনত সেই উপকথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। টেকনিকে মৌলিকত্ব নেই, ফার্স্ট সেঞ্চুরি এডিতে গ্রিসের রোডসে 'লাউকুন' নামে এই ধরনেরই উপরের দিকে উত্থিত দেহ নিয়ে ভাস্কর্য করেছিলেন তিন গ্রিক ভাস্কর, শুধু বিষয়টা ভিন্ন ছিল।

নভেরা ঘুরে দাঁড়ালো। বাঁয়ে প্যালাৎসে ভেক্কিওর সামনে মাইকেলএঞ্জেলোর 'ডেভিড'-এর কপি। কারা যেন তার শিশ্নে লাল রং দিয়েছে, সে খুকখুক করে হাসল।

ভেনটুরিও দেখল। তারপর হেসে বলল, ট্যুরিস্টদের কাজ। কত রকমের ট্যুরিস্ট আসে। ভালোর দিক এই যে, ওরা ভাস্কর্যের সঙ্গে রং নিয়ে খেলা করেছে। না ভাঙলেই হয়। তারপর নভেরার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। চলো কোথাও বসা যাক।

তারা রেস্তরাঁতে খাওয়া শেষ করেছে, বেলা আড়াইটা বাজে। ভেনটুরি তার দিকে তাকিয়ে আছে, কিছু বলছে না, কী যেন ভাবছে। সেই সময়েই ব্যাপারটা ঘটল। নভেরা ঢলে পড়ল প্রথমে তার কাঁধে, পরে তার কোলে। ভেনটুরি হতভম্ব হয়ে গেল ঘটনার আকস্মিকতায়। কী করবে ভেবে পেল না। ওয়েটার তাকে চেনে, দৌড়ে এল। ভেনটুরি বলল, ট্যাক্সি ডাকো। মূর্ছা গেছে। এখুনি নিয়ে যেতে হবে।

নভেরা চোখ মেলতেই দেখল ভেনটুরি তার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে গভীরভাবে দেখছে। তাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। নভেরা দেখল সে বিছানায় শুয়ে আছে। পাশে বসে আছে ভেনটুরি। সে আস্তে বলল, আমি কোথায়? ভেনটুরি আরো কাছে এল। স্বস্তির সঙ্গে বলল, আমার বাড়িতে। এখুনি ডাক্তার আসবে। তুমি কথা বলো না। চুপ করে থাকো।

নভেরা হেসে বলল, ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমার মাঝে মাঝে এমন হয়। ফেইন্ট হয়ে যাই।

কেন? কোনো সিরিয়াস অসুখ আছে নাকি তোমার?

আই ডোন্ট নো। কিন্তু কোনো অসুবিধা বোধ করি না। অন্যকে হয়ত বিব্রত করা হয়, যেমন আপনাকে করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, না আমার কোনো অসুবিধা হয় নি। কিন্তু তোমার এই মাঝে মাঝে ফেইন্ট হওয়াটা মোটেও ভালো না। চিকিৎসা করানো দরকার।

নভেরা উঠে বসল। হেসে বলল, তেমন সিরিয়াস কিছু না। আপনি ভাববেন না। আমি এখন যাই।

এই অবস্থায়? ভেনটুরির শঙ্কিত স্বর।

কোনো অসুবিধা হবে না। আমার অভ্যাস আছে। নভেরা উঠে দাঁড়ালো।

ভেনটুরি বলল, ইউ সারপ্রাইজ মি। মনে হচ্ছে ইউ নিড কেয়ার। সাম ওয়ান হ্যাজ টু টেক কেয়ার অফ ইউ। আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি। তুমি এসো যখন খুশি।

নভেরা হাসল। তারপর ধন্যবাদ দিয়ে রাস্তায় বেরুলো। পথের মোড়ে হামিদ আর আমিনুল অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখে এগিয়ে এল। হামিদ ব্যগ্র স্বরে বলল, কী ব্যাপার? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

হঠাৎ ফেইন্ট হয়ে গিয়েছিলাম।

হামিদ আমিনুলের দিকে তাকালো।

ভেনটুরি বলল, আমি প্রতিদিন আরনো নদী অতিক্রম করি, বেশ রিফ্রেশিং, পিয়াৎসালে মাইকেলএঞ্জেলো থেকে ফ্লোরেন্স শহর দেখি, তারপর পায়ে হেঁটে 'পন্টে ভেক্কিও' ওল্ড ব্রিজে যাই। জার্মানরা সব ব্রিজ বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল, শুধু পন্টে ভেক্কিও ছাড়া। ওটা একটা নিছক ব্রিজ মনে হয় না আমার কাছে, মনে হয় যেন একটা ফাংশনাল ভাস্কর্য। পথচারী হাঁটছে, যানবাহন যাচ্ছে আবার পাশেই দোকানপাটে পসরার বিকিকিনি, ভেরি হিউম্যানিস্টিক।

নভেরা বলল, ব্রিজটা সুন্দর, কিন্তু সব সময় ট্যুরিস্ট গিজগিজ করে। দুষ্টু লোকও থাকে ভিড়ের মধ্যে। আমার নিতম্বে চিমটি দেয় যখনই পারাপারের জন্য হাঁটি ব্রিজ দিয়ে।

শুনে ভেনটুরি হাসে। তারপর বলে, ইটালিয়ানরা সুন্দর নিতম্ব পছন্দ করে। শুধু তোমাকেই যে এমন করে তা মনে করো না।

নভেরা বলল, শুধু কি তাই। পিছু নেয় যখন একা একা হাঁটি। কথা বলতে চায় গায়ে পড়ে। লন্ডনে এমনটা দেখি নি।

ভেনটুরি আবার হাসল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের নাম 'ল্যাটিন লাভার' কি এমনিতে হয়েছে। চলো যাওয়া যাক। তোমাকে ব্যাপটিস্ট ট্রি গিবার্টির ব্রোঞ্জ রিলিফ দেখিয়ে আনি।

নভেরা বলল, কয়েকবারই দেখেছি।

ভেনটুরি দরজা খুলে বেরুতে বেরুতে বলল, আমার সঙ্গে দেখো নি।

পিয়াৎসা ডেল ডুয়োমোর পশ্চিমে পিয়াৎসা জিওভানিতে ব্যাপটিস্টারি যার অন্য নাম সেন্ট জন গির্জা। প্যাগানদের মন্দির ছিল বলে কথিত, পরে খ্রিস্টীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাসনাগারে রূপান্তরিত। ফ্লোরেন্স অধিবাসীরা তাদের পৃষ্ঠপোষক সেন্ট জনের নামে উৎসর্গ করে এই গির্জা। একাদশ শতাব্দীর পর নবজাতকদের ব্যাপটিজম থেকে শুরু করে রিপাবলিকের শাসক, কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট, গিল্ডের সদস্য সবার অভিষেক হয় এখানে। ব্যাপটিস্টারি নাম এইভাবেই জনপ্রিয় হয়। রেনেসাঁ আমলে সিদ্ধান্ত হয় এর তিনটি গেটে তৈরি হবে ব্রোঞ্জ-দরজা। এই কাজের জন্য পিসা থেকে ডেকে আনা হলো আন্দ্রিয়া পিসানোকে। এই যে দক্ষিণের গেটে জোড় দরজা যার ওপরে দেখছ লেখা আছে 'আন্দ্রিয়া, সন অব নিনো, ১৩৩০,' এটা তার করা। এখানে বিভিন্ন প্যানেলে 'লাইফ অব দা ব্যাপটিস্ট' রিলিফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। নিচের সুন্দর রমণী-ফিগারগুলো 'ভার্চু'র প্রতিনিধিত্ব করছে। এইসব কাজে কমপোজিশনের যে সহজ সাধারণ ভাব এটি আন্দ্রিয়া পেয়েছিলেন জিওত্তোর কাছ থেকে। দরজার চারদিকে যে ফ্রিজ এটা অবশ্য ভিট্টোরিও গিবার্টির করা। উত্তর আর পূর্বের গেটের দরজায় ব্রোঞ্জ রিলিফের কাজ তারই পিতা লরেঞ্জো গিবার্টির করা। তাকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই কাজটা পেতে হয়েছিল, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ব্রুনেলেস্কির মতো বিখ্যাত স্থপতি-ভাস্কর। তার প্যানেলের বিষয়বস্তু খ্রিস্টের জীবন, তার শিষ্যদের জীবন। বার্জেলো মিউজিয়ামে গিবার্টি আর ব্রুনেলেস্কি দুজনেরই ব্রোঞ্জ মডেল রাখা আছে। ও তুমি ইতিমধ্যে দেখেছ? শুনে গিবার্টির কাজের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি গথিক কমপোজিশন বেছে নিলেও প্যানেলের মডেলিং-এ পার্সপেকটিভের ব্যবহার করেছিলেন, যা মাসাচ্চো তাঁর পেইন্টিঙে প্রথম করেন। দরজার চারদিকে ফ্রিজও তিনিই করেন, যার অনবদ্য অলঙ্করণ আর বিশদ বর্ণনাভঙ্গি এখনো মুগ্ধ করে দর্শকদের। এই দরজা করতে গিবার্টির লেগেছিল একুশ বছর, ১৪০৩ থেকে শুরু করে ১৪২৪। আজকাল এত দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার কথা ভাবা যায় না। গিবার্টির কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফ্লোরেন্সের নগরপতিরা তাঁকে পুবের দরজাজোড়াও করতে দিল। এটা সম্পূর্ণ করতে লেগেছিল সাতাশ বছর। মাইকেলএঞ্জেলো এই দরজার ব্রোঞ্জ রিলিফের কাজ দেখে বললেন, এ তো স্বর্গের দরজা। সেই থেকে এর নাম 'গেটস অব হেভেন'। এই দরজায় পুরনো টেস্টামেন্ট থেকে দশটা গল্প বলা হয়েছে এক একটা প্যানেলে। লিওনার্ডো ব্রুনির পরামর্শেই এই বিষয় বেছে নেয়া হয়। এর একটা বিশ্বজনীন আবেদন আছে, কেননা ওল্ড টেস্টামেন্টে ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম আর জুডাইজম সব ধর্মের ইঙ্গিত আছে। এখানে প্যানেলের রিলিফ কাজগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন উচ্চতা, কোনোটা ফ্ল্যাট, কোনোটা মাঝারি উঁচু, কোনোটা উঁচু, এইসব উচ্চতার সমন্বয়ে গিবার্টি একটা পিকটোরিয়াল ইফেক্ট সৃষ্টি করেছেন, মানুষগুলোকে স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ করে দিয়ে স্পেসের মাত্রা এনে দিয়েছেন। রিলিফ ভাস্কর্যে এটা পথিকৃৎ হয়ে রয়েছে।

ভেনটুরি হাঁটছে, তাঁর গলার মাফলার উড়ছে বাতাসে। নভেরা ব্যাপটিস্টারির দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। আগেও দেখেছে। কিন্তু এখন যেন নতুন মনে হচ্ছে।

ভেনটুরি বললেন, বার্জেলো প্রাসাদে দোনাতেল্লোর ডেভিড নিশ্চয়ই দেখেছ। মাইকেলএঞ্জেলোর তুলনায় অবশ্যই খাটো, কিন্তু ভাস্কর্য হিসেবে অনবদ্য। হ্যাঁ মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে তোমার এটা ভালো লাগে নি। লাগত যদি মাইকেলএঞ্জেলোর ডেভিড না দেখতে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় মাইকেলএঞ্জেলো যে মার্বলের খণ্ডে 'ডেভিড' খোদাই করেন সেটি বাজে, কোনো কাজে লাগবে না বলে ফেলে দেয়া হয়েছিল। ফ্লোরেন্সবাসীর কাছে সেই পাথরের মূর্তিই এখন 'জায়ান্ট'।

ভিয়া দেল্লা আর্টিস্টিতে যখন ফিরল নভেরা তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। হামিদ রান্না করছে, আমিনুল এসে দরজা খুলে দিল। নভেরা হাতের ব্যাগ, বইপত্র টেবিলে রেখে বলল, বাব্বাহ্, খুব ঘুরলাম আজ। ভীষণ টায়ার্ড। দাও তো এক কাপ গরম কফি।

হামিদ বলল, বেশ দেরি করে ফিরছ, ভেনটুরি খুব খাটিয়ে নিচ্ছে মনে হয়।

তাই তো দেখছি। তবে ঘুরে বেড়ানোর খাটুনি। সব মিউজিয়াম আর গ্যালারিতে আবার যাওয়া হচ্ছে। কী সুন্দর তার বর্ণনা, যেন সব মুখস্থ।

হামিদ বলল, এতদিন ফ্লোরেন্সে থাকলে আমাদেরও মুখস্থ হয়ে যেত।

নভেরা হেসে বলল, লোকটা বেশ মজার। রসিকতা বোধ আছে। বলে সে নিতম্বে চিমটি কাটার প্রসঙ্গে ভেনটুরির মন্তব্য উল্লেখ করল।

হামিদ ঘুরে দাঁড়ালো। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল তাকেই তো ল্যাটিন লাভার মনে হচ্ছে। সাবধানে থেকো। কবে হয়ত বলবে, স্টুডিওতেই থেকে যেতে।

বলেছেই তো। সেদিন রাত হয়ে গেল, ভেনটুরি দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে বলেছিল, থেকে গেলেও পারো। আমার এখানে এত জায়গা। কোনো অসুবিধা হবে না।

তাতো হবেই না। হামিদ উনোনের দিকে তাকিয়ে বলে। তাকে অসন্তুষ্ট মনে হয়।

আমিনুল হাতের বইটা দেখিয়ে নভেরাকে বলল, ভাসারির 'লাইভস অব দা পেইন্টারস' পড়ে দেখো কী লিখেছে মাইকেলএঞ্জেলো সম্বন্ধে।

কী লিখেছে? নভেরার স্বরে কৌতুক।

তিনি টোমাসো ক্যাভালিয়েরি নামে এক তরুণ অভিজাতের প্রেমে পড়েছিলেন এবং তার জন্য কবিতা লিখেছিলেন।

অভিজাতের সঙ্গে প্রেমে পড়ায় দোষের কিছু দেখছিনে। আর কবিতা লেখা তো শিল্পচর্চারই অংশ। নভেরা বলল।

ক্যাভালিয়েরি মেয়ে নয়, পুরুষ। আমিনুলের মুখে হাসি। যেন খুব মজা পেয়েছে। তারপর বইতে মুখ রেখে বলল, ক্যাভালিয়ের ছাড়াও অন্য আরো তিনজন পুরুষের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি।

নভেরা বলল, প্রেম সব সময়ই দৈহিক হতে হবে কেন? এমনও তো হতে পারে যে তিনি ঐসব ব্যক্তিদের চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ঐ আকর্ষণ ছিল একান্তই হামিদ যাকে বলে, প্লেটোনিক। দেহাতীত, আধ্যাত্মিক ধরনের কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামিদ বলল, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে এই প্লেটোনিক প্রেম হোমোসেক্সুয়ালিটিরই সুন্দর অবদমন ছাড়া কিছু নয়। সেকেন্ড বেস্ট টু ফিজিকাল ইন্টারকোর্স।

কিন্তু তুমিই তো প্রায়ই বলো প্রেমের একটা পর্বে দেহ প্রধান হয়ে যায়, কিন্তু তার চূড়ান্ত, পরিশীলিত রূপ হলো এক অনন্য আবেগ আর মননশীলতার প্রকাশ। আমার কাছে এটা বেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। সে তো ঠিকই। দেহের গুরুত্ব আছে, তার চাহিদা আছে, কিন্তু মানুষ দেহসর্বস্ব নয়।

তাহলে মানুষ আর পশুতে তফাৎ কোথায়? হামিদ হাত মুছতে মুছতে বলল।

এখন রাত। ঘরের ভেতর আলো নেই, জানালার পরদা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। অন্ধকার হালকা হয়ে এসেছে ঐ আলোর আভায়। আমিনুল জেগে আছে, তার আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। কেমন যেন অস্থির লাগছে। পাশেই নভেরা শুয়ে, কালো কম্বল বুক অবধি টেনে দিয়েছে, মুখের প্রোফাইল দেখতে পাচ্ছে সে আবছাভাবে। নভেরা আর তার পাশে হামিদ। দুজনে ঘুমুচ্ছে। আমিনুলের নাকে নভেরার চুলের ঘ্রাণ, তার মাথা ঝিমঝিম করছে। দুজনের মাঝে কম্বলের দেয়াল, তার ভেতর দিয়েই সে অনুভব করে এক মসৃণ উত্তাপ যা দেহ থেকে দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অনুভূতি রোজ হতেই হয়, তখন জেগে ওঠে, ঘুম আসে না। আজ শোবার পর থেকেই উন্মনা হয়ে আছে, তার ঘুম আসে না। নভেরা হঠাৎ আড়মোড়া ভাঙে। তারপর কম্বলের ভেতর থেকে একটি হাত এসে আমিনুলের পেটের ওপর পড়ে এবং সেখানেই থাকে। আমিনুল আড়ষ্ট হয়ে যায়, তার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়। যেন তেপান্তরের মাঠে ঘোড়ার খুর ছুটে চলেছে। রক্তের ভেতর বর্ষায় নদীর কুলকুল ঢেউ। তার শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। নভেরা ঘুমের ভেতর কী যেন বলে, খুব অস্পষ্ট স্বরে, কিছু বোঝা যায় না। তাকে অবিকল শিশুর মতো মনে হয়। তারপর যেন এক যুগ পর নভেরা তার দিকে মুখ করে শোয়ার জন্য পাশ ফেরে। নভেরার চুল আমিনুলের মুখে এসে পড়ে। ঝাঁঝালো গন্ধে নাক গরম হয়ে ওঠে। সে মস্তিষ্কের কোষে চাপা যন্ত্রণা অনুভব করে। শেষ রাতে তার ঘুম আসে। সকালে নভেরা উঠে যখন শাড়ির পরদা তৈরি করে ঘরের মাঝখানে, কাপড় বদলায়, প্রসাধন করে তখনো আমিনুল ঘুমিয়ে।

নাস্তা খেতে খেতে হামিদ বলল, বুঝলা আমিনুল কাল পিয়েরো দেল্লা ফ্রান্সিসকোতে মাসাচ্চোর ফ্রেসকো দেখলাম, তোমাদের দুজনের কেউ ছিলে না। দারুণ অভিজ্ঞতা। রিয়েলি এ জিনিয়াস, এ পাইওনিয়ার। জিওত্তোর থ্রি ডিমেনশনাল রিয়েলিজমকে কীভাবে টেকনিকালি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, না দেখলে বুঝবা না। মিলিয়ে দেখতে হবে। পার্সপেকটিভের ধারণা যে-আর্কিটেকচার থেকে, তার সংজ্ঞা তিনি ব্যাপক করে দেখিয়েছেন এই ছবির কাঠামোতে। সব ফরম, মানুষসুদ্ধ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির যে বিশুদ্ধতম আর্কিটেকচার তারই অন্তরঙ্গ অংশ। এই যে বিশ্বজগতের, প্রকৃতির অন্তর্গত শৃঙ্খলার কাঠামো এটা তিনি প্রকাশ করেছেন স্পেসের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু আর ফিগারকে পছন্দমতো স্থাপন করে। এক ধরনের রিক্রিয়েশন, নতুন করে রূপ দান।

আমিনুল বলল, যেমন সেজান বলেছে, আই ডু নট ওয়ান্ট টু রিপ্রডিউস ন্যাচার, আই ওয়ান্ট টু রিক্রিয়েট।

প্রায় সব শিল্পীই তাই চেয়েছে, চায়, চাইবে ভবিষ্যতে। টেকনিক ব্যবহারে এখন কোনো সমস্যা নেই। এর জন্য আমরা জিওত্তো, মাসাচ্চোর কাছে ঋণী। হামিদ তাকালো দুজনের দিকে।

নভেরা বলল, ব্রুনেলেস্কির কাছেও ঋণী। স্থপতি-ভাস্করদের ভুলে যাচ্ছ কেন তোমরা।

না, না ভুলব কেন। তুমি তো আছই সামনে। হামিদ হাসল।

মিসেস হুগো ঘরে এলেন তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। তরুণী বয়সের মেয়েটি, রঙিন স্কার্ফ দিয়ে চুল বেঁধেছে, ফুলের নকশা-করা লম্বা স্কার্ট, কালো শাল দিয়ে ওপরটা জড়ানো।

হামিদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী ভাগ্যি আমাদের, একসঙ্গে মা-মেয়ের দেখা পাওয়া গেল। কী খাবে বলো?

মিসেস হুগো বলল, কিছু না। আমার মেয়ে নভেরাকে দেখতে এসেছে। বিদেশী মেয়ে স্কাল্পচার করে শুনে তার খুব আগ্রহ হয়েছে।

কেন তুমি কি স্কাল্পচার করতে চাও? নভেরা তাকালো।

মেয়েটি লজ্জায় মুখ নিচু করল।

নভেরা তার হাত ধরে কাছে নিয়ে বলল, তোমার একটা বাস্ট করে দেবো। কয়েকটা সিটিং দিতে আসতে হবে।

মা-মেয়ে চলে গেলে নভেরা বলল, আমিনুল, মেয়েটা চমৎকার। সুন্দরী এবং নম্র স্বভাবের। তোমার সঙ্গে মানাবে, তুমি ওকে গার্ল ফ্রেন্ড করে নাও।

হামিদ বলল, আমিনুল এখনো লাজুক। সবে তো দেশ থেকে এসেছে। ওর এপ্রেনটিসশিপ শেষ হয় নি এখনো।

আমরা এখানে থাকতেই শেষ হতে হবে। আর ঐ মেয়েই হবে আমিনুলের গার্ল ফ্রেন্ড। বুঝলা আমিনুল, আমরা দেখে যেতে চাই যে তুমি ওকে নিয়ে ঘুরছ, পিয়াৎসা দেল্লা সিনেরিয়ায় চুমু খাচ্ছ। আর সব তরুণ-তরুণী যেমন করে। নভেরা আমিনুলের দিকে তাকায়।

আমিনুল বইপত্রের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে চলে যায়। তার কান ঝাঁঝাঁ করছে।

সেদিন হামিদের ক্লাস ছিল না। নভেরা ভেনটুরির স্টুডিওতে গিয়েছে কিনা জানে না আমিনুল। ক্লাস শেষে বিকেলে বাড়ি ফিরে এল। বাইরে থেকে দেখল ভেতরে আলো জ্বলছে। কৌতূহলী হয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পরদার ফাঁক দিয়ে ভেতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঁকি দিয়ে দেখল। যে-দৃশ্য দেখল তাতে তার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা। সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল, কী করবে ভেবে পেল না।

হামিদ দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ নগ্ন, সোজা হয়ে না, এক পায়ে ভর দিয়ে, এক পা সামান্য এগিয়ে দিয়ে, অনেকটা মাইকেলএঞ্জেলোর 'ডেভিড'-এর মতো, হাত একটা কোমরে রাখা অন্যটা কাঁধ স্পর্শ করেছে। অদূরে দাঁড়িয়ে নভেরা, হাতে প্লাস্টার, সামনে স্কাফোল্ডে লোহার শিকের চারদিকে প্লাস্টার দিয়ে গড়ে উঠেছে নগ্ন পুরুষের মূর্তি। ভঙ্গিটি ঠিক হামিদ যেভাবে দাঁড়িয়ে। দুজনে কেউ কথা বলছে না। একজন নিশ্চল দাঁড়িয়ে, অন্যজন ঘুরে দেখছে, হাত দিয়ে প্লাস্টার লাগাচ্ছে। দুজনের দৃষ্টি স্বাভাবিক।

এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হলো আমিনুল। একটি নারী, একজন নগ্ন পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে নির্বিকার হয়ে কাজ করে যাচ্ছে এটা তার কাছে যেন অভাবনীয়। ক্লাসে প্রফেসনাল মডেল হলে অন্য কথা, সেখানে অনেকেই থাকে। নির্জন ঘরে হামিদ আর নভেরাকে দেখে ঠিক ক্লাসের কথা মনে করতে পারল না সে। ওদের দুজনের সম্পর্কের একটা দিক সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। নিজের অজান্তেই অস্ফুট স্বরে বললে, অদ্ভুত।

বাড়িতে না ঢুকে আমিনুল ফিরে চলল, লগগিয়া দেই লানৎসিতে গিয়ে বসে থাকবে কিছুক্ষণ, চেল্লিনির মূর্তির নিচের সোপানে, যেমন বসে থাকে অনেকে। অথবা যাবে পাওলো উচ্চিলোর 'ব্যাটল অব সান রোমানো' ছবিটা দেখতে, মেডিসি প্যালেসে। যার এক অংশ আছে লন্ডনে, অন্য অংশ প্যারিসে ল্যুভে।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে দেখল তখনো ভেতরে হামিদ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আর নভেরা দেখে দেখে তার স্ট্যাচু তৈরি করছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে, তার বেশ শীত করছে। আমিনুল কিছুক্ষণ ইতস্তত করে দরজায় গিয়ে বেল টিপল। একটু পর দরজা খুলল হামিদ, একটা ড্রেসিং গাউন পরেছে সে। তাকে দেখে বলল, এসো, এসো। আজ এত দেরি যে। গার্ল ফ্রেন্ড নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি?

নভেরা হাতের প্লাস্টার পরিষ্কার করতে করতে বলল, সব সিক্রেট কি আমিনুল বলবে? বেচারা।

এইভাবে জুন ১৯৫৪ এসে গেল। ওরা ভেনিস যেতে চেয়েছিল কিন্তু টাকার অভাবে যেতে পারল না। লন্ডনে যাবার আগে নভেরা বলে গেল, আমিনুল তুমি কিন্তু অবশ্যই আসবে। হামিদের বড় ফ্ল্যাট কোনো অসুবিধা হবে না।

সেপ্টেম্বরে এক একজিবিশনে আমার দুটো ছবি বিক্রি হলো। এক একটার জন্য সাড়ে বারো লাখ লিরা পেলাম। টাকা পেয়ে একটা ভেসপা মোটর স্কুটার কিনলাম। প্রথমে ভেনিস গেলাম, বিয়েনাল দেখতে। সেখানে ইন্দোনেশীয় পেইন্টার আফেন্দির সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে ক্যাম্পে থাকলাম কয়েকদিন, ঘুরেফিরে দেখলাম, গন্ডোলায় চড়লাম। তারপর ভেসপা নিয়ে প্যারিস হয়ে লন্ডন রওনা হলাম। লন্ডনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছে ক্রানলি স্ট্রিটে হামিদের বাড়ি খুঁজে বের করে দরজায় বেল টিপলাম, তার দরকার ছিল না, দরজা খোলাই। ওপর থেকে সাঈদ বলল, ওপরে আসুন। ওপরে উঠে দেখি শুধু সাঈদ না, মোহসিন বলে আরো একজন আছে। পরে তিনি ফরেন সেক্রেটারি হয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় হামিদ নিয়ে গেল নভেরার ফ্ল্যাটে ফরেস্ট হিলে। তার ল্যান্ডলেডি বেশ জিজ্ঞাসাবাদ করল। ওপরে উঠতে উঠতে হামিদ বলল, বেটি রোজই অমন করে। আমাকে চেনে, তাও প্রশ্ন করে। স্বভাবটাই অমন, স্পিনস্টার হলে যা হয়।

নভেরা দরজা খুলেই ভেতরে বোধ করি বাথরুমে ঢুকে গেল। আমরা চেয়ারে, বিছানায় বসলাম। নভেরা ঘরে ঢুকল, তার চোখের ওপর ব্যান্ডেজ। আমি বললাম, কি ব্যাপার অ্যাকসিডেন্ট নাকি? খুব জখম হয়েছে মনে হয়।

হামিদ হেসে বলল, অ্যাকসিডেন্ট না। নভেরা চোখের ভ্রূ প্লাক করেছে। একশো পাউন্ড খরচ করে।

শুনে আমি অবাক হয়ে নভেরার দিকে তাকালাম। সে হামিদের পাশে বসতে বসতে প্রসন্ন স্বরে বলল, কি, গার্ল ফ্রেন্ড হয়েছে তো মেয়েটা? কটা চুমু খেয়েছ এই পর্যন্ত।

মোট বিশ দিন ছিলাম হামিদের ফ্ল্যাটে। রোজই দেখা হতো নভেরার সঙ্গে, তার বেড সিটিং রুমে। চোখে ব্যান্ডেজ থাকার জন্য সে বাইরে বেরুতো না। আর্ট স্কুলেও যাওয়া বন্ধ। তার ফ্ল্যাটে সাঈদের সঙ্গেও গিয়েছি। বেশ আড্ডা হতো। নভেরার কতগুলো ট্রিকস ছিল পুরুষদের মুগ্ধ করার জন্য। এই যেমন হঠাৎ বলত, ঠাণ্ডা লাগছে, গ্যাস জ্বালাতে হবে হিটিংয়ের জন্য, কার কাছে দশ শিলিং আছে দাও তো। একজন হয়ত বার করল দশ শিলিং। নভেরা তখন উঠে গিয়ে মিটারে কয়েন দিতে চেষ্টা করবে, উঁচু হওয়ার জন্য পারবে না। তখন যে কয়েন দিয়েছে তাকে বলবে, 'এসো আমাকে তুলে ধরো ওপরে, এমনিতে কয়েন দিতে পারছি না।' সে তখন উঠে গিয়ে নভেরার কোমর ধরে উঁচু করে তুলবে। নভেরা মিটারে কয়েন ফেলতে দেরি করছে, সবাই তাকিয়ে আছে, আফসোস করছে এমন ভাব।

তাদের দেখে কী মনে হয়েছে?

মনে হয়েছে সবাই নভেরার প্রেমে পড়েছে, তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। আমি? হ্যাঁ, আমাকেও আকর্ষণ করেছে বৈকি। কিন্তু বন্ধুর গার্ল ফ্রেন্ড তাই বেশি দূর এগোই নি।

ফ্লোরেন্সে যখন এক বিছানায় তিনজন তখন কী মনে হতো?

কী আর মনে হবে, একজন পুরুষের ঐ বয়সে যা মনে হওয়ার তাই। বলে আমিনুল থামলেন। তারপর দুষ্টুমির হাসি মুখে নিয়ে বললেন, ফ্লোরেন্সে একদিন দুপুরে ফিরে দেখি নভেরা একা শুয়ে। শাড়ি এলোমেলো হয়ে আছে, চুল ছড়িয়ে আছে বালিশের চারদিকে, ঘরের ভেতর বেশ ঠাণ্ডা। আমি কাঁপতে শুরু করেছি। ধীর পায়ে বিছানার পাশে দাঁড়ালাম। শ্বাস-প্রশ্বাসে নভেরার বুক উঠছে, নামছে। মসৃণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রীবায় অপূর্ব ভঙ্গি। আমি নিচু হয়ে তার শরীরের ওপর কম্বল বিছিয়ে দিলাম। সে হঠাৎ জেগে উঠল। হকচকিয়ে উঠে বসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর মূর্ছা গেল। মূর্ছা গেল না ভান করল বোঝা গেল না।

ঢাকা এয়ারপোর্টে হামিদ ছিল, নভেরা তার সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে উঠল। পাশে তেজগাঁও রোডের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন মনেই হয় না এত বছর লন্ডনে ছিলাম। তা আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

হামিদ বলল, কেন আমাদের বাড়ি? আশেক খান লেনে। চিঠিতে জানিয়েছি তোমাকে।

ও হ্যাঁ। আশেক লেনে। তোমাদের অসুবিধা হবে না তো? হামিদের দিকে না তাকিয়েই বলল নভেরা। সে তেজগাঁও রোডের দুদিকে নিচে জমি দেখছে।

বাহ্। পাঁচ মাস দেখা হয় নি। এর মধ্যে দেখছি তুমি বেশি ভদ্র হয়ে পড়েছ। অসুবিধা হবে কিনা জানতে চাইছ। ব্যাপারটা কী?

নভেরা দুদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকল। মৃদু হেসে বলল, অভদ্র ছিলাম বুঝি কখনো? অন্যের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবি নি বুঝি আগে? তার স্বরে কৌতুক।

হামিদ হেসে বলল, তোমাকে তুমি নিজে আমার চেয়ে বেশিই চেনো। যাক সে কথা, এখন বলো শেষের কটা মাস কেমন কাটল?

দারুণ কাটল। পড়াশোনায়, পরীক্ষা নিয়ে এমন ব্যস্ততা যে টেরই পেলাম না কীভাবে দিন যেত, রাত আসত। যাক ডিপ্লোমাটা যে শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল সেটাই আনন্দের। অবশ্য ঐ একটা কাগজের কোনো দাম নেই আমার কাছে, শেখাটাই বড়। তবু একটা স্মৃতি হিসেবেই-বা ডিপ্লোমার কাগজটা কম কী! তারপর দুদিকে তাকিয়ে বলল, এই পাঁচ বছরে ঢাকার কিছুই পরিবর্তন হয় নি।

ট্যাক্সি জিন্নাহ এভিন্যু পার হয়ে নওয়াবপুর রেল ক্রসিঙে আটকে গেল, একটা ট্রেন যাচ্ছে। ঘট-ঘটাং শব্দ হচ্ছে, বগিগুলো আসছে একটার পর একটা। নভেরা সামনে ঝুঁকে দেখতে দেখতে বলল, বা! কী সুন্দর। অনেক দিন পর ট্রেন দেখলাম। লন্ডনে আন্ডারগ্রাউন্ডে শুধু ট্রেনের কিছু অংশ দেখতে পেতাম। ওটাকে দেখা বলে না।

নওয়াবপুরের দুদিকে পুরনো বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে থাকল নভেরা। ট্যাক্সি, পথচারী, রিকশা, দুএকটা ঘোড়ার গাড়ি পাশ দিয়ে এগুচ্ছে। খুব একটা ভিড় নেই। দেখতে দেখতে নভেরা বলল, প্রায় কিছুই বদলায় নি। শুধু আমরা বদলে যাচ্ছি।

হামিদ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

নভেরা হেসে বলল, অবাক হচ্ছ কেন। আমরা কি বদলে যাচ্ছি না?

হামিদ নভেরার কালো শাড়ির দিকে তাকালো, পিঠময় ছড়ানো চুল দেখল, লম্বা করে টানা ভ্রূ জোড়ার ওপর চোখ পড়ল, প্রসাধন-চর্চিত মুখ আর রুদ্রাক্ষের মালা পরা মরাল গ্রীবা দেখল। তারপর হেসে বলল, না। কেউ কেউ বদলায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশেক লেনে হামিদদের অনেকগুলো বাড়ি। বিরাট পরিবার, চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো ভাইবোন নিয়ে। আওলাদ হোসেন রোডে তার ভাগ্নের এক বাড়ি খালি ছিল, নভেরা গিয়ে উঠল দোতলায়। একটু পরই কাছের এক বাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে এলেন হামিদের মা। নভেরাকে দেখে খুব খুশি হলেন। পাশে বসে থাকলেন জড়িয়ে ধরে, মেয়েদের হাঁকডাক করে এটা-সেটা আনতে বললেন। কাণ্ড দেখে নভেরা অবাক, হামিদ মুখ টিপে হাসে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সঙ্গে থাকলেন হামিদের মা। চাকরানীদের দিয়ে ঘর সাজালেন, চাকর দিয়ে কিনতে পাঠালেন টুকিটাকি জিনিস। রাতের বেলা বেরুবার সময় বললেন, একা থাকবা, কষ্ট হইব না তো? নাহয় চলো আমাদের সঙ্গে থাকবা। তুমি তো আমার মাইয়াদের মতো।

নভেরা হেসে বলল, কিছু ভাববেন না। একা থেকে খুব অভ্যেস আছে আমার। তাছাড়া আপনারা যা করেছেন তাতে কোনোকিছুর অভাব হবে না বলেই মনে হচ্ছে। আপনি চিন্তা করবেন না।

হামিদের মা মেয়েদের নিয়ে চলে গেলেন। যাবার আগে চাকরদের, চাকরানীদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন কী কী করতে হবে, কে জেগে পাহারা দেবে, এইসব।

নভেরা হামিদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার মা খুব ভালো মানুষ। কিন্তু আমার জন্য এত চিন্তা কেন? খুব ছেলেমানুষ মনে করেছেন নাকি?

হামিদ হেসে বলল, মার কাছে সবাই ছেলেমানুষ। আব্বা পর্যন্ত।

পরদিন মা হামিদকে বললেন, বাবা নভেরার বাবা-মা কবে আসবে?

হামিদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, তারা আসতে যাবে কেন?

বারে, না আসলে কথাবার্তা হবে কেমন করে। আমরা কি চাটগাঁ যামু?

তারপর থেমে নিয়ে বলেন, হ, যাওনের হইলে যামু।

হামিদ বোনদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, বুঝতে পেরেছি। ও ব্যাপারে মাথা ঘামিও না। নভেরা এখানে থেকে ছবি আঁকবে। আমরা দুজনে একসঙ্গে সারাদিন ছবি আঁকব।

শুনে মা চুপ করে থাকেন। বোনরা মুখ টিপে হাসে। একটু পর মা বলেন, এইভাবে একটা মাইয়া একা একা থাকব, লোকে কইব কী?

হামিদ হেসে বলল, কিছু বলবে না। আমরা বিলাত-ফেরত। বিলাত-ফেরতদের নিয়া লোকজন মাথা ঘামায় না।

শুনে তার মা চুপ করে থাকেন। তারপর নিজ মনেই বলেন, হ, আস্তে আস্তে ঠিক হইয়া যাইব। মাইয়াডা ভালা। বেশ দিলখোলা। পছন্দ হইছেরে বাপ। বলে তিনি মেয়েদের দিকে তাকান। তাকিয়ে থেকে বলেন, অরে তোরা ভাবীর মতোন দেখবি, ইজ্জত করবি। ভালা মাইয়া, গুণী মাইয়া।

বড়ভাই নাসির মাকে বলেন, উহুঁ, এ ঠিক হচ্ছে না। হামিদ যে কী করে তার ঠিক নেই। সমাজ আছে না? কী বলবে সবাই? বিয়ে করলে নাহয় এক কথা। ছবি আঁকার জন্য একটা অনাত্মীয় মেয়েকে এনে তুলবে নিজেদের মহল্লায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা পানের খিলি মুখে পুরে হেসে তাকান তার দিকে। তারপর বলেন, ঠিক হইয়া যাইব। ভাবিস না এত। বিলাত-ফেরত পোলা, মাইয়া, তারা কি আর দশজনের মতো হইব নাহি?

শুনে বোনেরা মুখ টিপে হাসে।

কয়েকদিন খুব লোকজন আসল নভেরাকে দেখতে। মনে মনে বিরক্ত হলেও দেখা করল সে সবার সঙ্গে। হামিদের বন্ধুদের মধ্যে এল আলাউদ্দিন আল আজাদ, শামসুর রাহমান, দুজনেই সাহিত্যিক। আলাউদ্দিন আল আজাদ বলল, দারুণ সাবজেক্ট আপনারা দুজন। আপনাদের নিয়ে লিখতে হবে। শামসুর রাহমান কিছু বলে না, শুধু অল্প করে হাসে, যেন বা একটু লাজুক, অথবা প্রেমে পড়েছে কারু।

একদিন সন্ধ্যায় আলাউদ্দিন আল আজাদ এসেছে। অন্ধকারে বসে আছে নভেরা আর হামিদ। আজাদ ঘরে এসে অবাক হয়ে বলে, একি, এ যে অন্ধকার। আলো কোথায়?

নভেরা হৈচৈ করে বলে, আলো জ্বালাবেন না, আলো জ্বালাবেন না। অন্ধকারে আপনার ভয়েস কেমন শুনি।

বলে কী! আজাদ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে দুজনকে দেখার চেষ্টা করে। তারপর বলে, আপনাদের নিয়ে না লিখলেই হবে না। নামও ঠিক করে ফেলেছি, তেইশ নম্বর তৈলচিত্র।

অন্ধকারের মধ্যে নভেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, চমৎকার নাম।

একদিন শামসুর রাহমান এসেছে। দরজা খুলতেই দেখে নভেরা সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে মেক-আপ নেই। তাকে সবসময় মেক-আপেই দেখেছে। এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে। নভেরা তাকে দেখে বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান আমি নিজেকে ঠিক করে নেই। এখন তাকাবেন না। বলে সে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। শামসুর রাহমান অবাক হয়ে হামিদের দিকে তাকিয়ে থাকল। হামিদ হাসছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা আড্ডা হয়। ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকা। কখনো নিমন্ত্রণে যায় দুজনে। যাবার আগে হামিদের বোনদের গহনা পরে। অনেকক্ষণ ধরে সাজে। যখন বের হয় পথে তখন লোকজন হাঁ করে থাকে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। হামিদের মা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন। পান চিবুতে চিবুতে মেয়েদের বলেন, হইব, আস্তে আস্তে ঠিক হইব। তোরা বড়ই অস্থির।

কুমুম হক এল স্বামীকে নিয়ে আওলাদ হোসেন রোডে। অনেকক্ষণ গল্প করল, দুপুরে খেলো হামিদ আর নভেরার সঙ্গে। একান্তে পেয়ে কুমুম হক বলল, তুই আমাদের বাসায় না উঠে এখানে উঠলি কেন? নভেরা বুঝতে না পেরে বলল, তাতে কী হয়েছে? কুমুম বলল, বারে, আমরা তোর আপনজন সেখানে না গিয়ে এখানে উঠলি, লোকে কী বলবে? নভেরা ঠোঁট ওল্টালো। তারপর বলল, ওহ্ সেই কথা। তা সুইটি তুমি তো জানোই, লোকের কথায় আমার কিছু আসে যায় না। আমি যা খুশি তাই করি, যা আমার ভালো লাগে তাই পেতে চাই। কুমুম ঠোঁট কামড়ালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর আস্তে আস্তে বলল, সে তো জানি। কিন্তু মনে রাখতে হবে লন্ডনে যা করেছিস, যেভাবে চলেছিস, ঢাকায় সেভাবে চলাফেরা করা যায় না। ছোট শহর, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও তেমন প্রসারিত হয় নি। আর এ তো পুরনো ঢাকা, রক্ষণশীলতার ডিপো।

নভেরা মাথা নাড়ল। তারপর হেসে বলল, মোটেও না। এই যে এতদিন হলো এখানে আছি কেউ তো কিছু বলে নি। এমনকি রাস্তা দিয়ে যখন আমি আর হামিদ হেঁটে যাই তখনো লোকে সম্মানের চোখে দেখে।

কুমুম হক বলল, ভেবে দেখিস তবু।

হামিদকে নিয়ে চট্টগ্রামে গেল নভেরা, উঠল নিজেদের বাড়িতে আশকার দিঘির পাড়ে। বাবা-মা খুশি হলেন। খেতে খেতে একদিন বললেন, বাবা হামিদ, এখন তো কথাবার্তা বলতে হয়। তোমার বাবা কি বড়ভাই আসবেন, না আমরা যাবো ঢাকা?

প্রথমে বুঝতে পারে না হামিদ। তারপর লজ্জা পেয়ে চোখ নামায়। নভেরা বলে, কী যে বলো বাবা। এখন কি এইসব আসা-যাওয়ার ব্যাপার আছে নাকি? তাছাড়া কার জন্য? আমাদের জন্য? তুমি এখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না। আমরা ঠিকই করি নি বিয়ে করব কিনা। একসঙ্গে ঘুরলেই কি বিয়ে করতে হবে? এসব বড্ড সেকেলে কথা। আমাদের নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না তো। উই আর ফাইন।

নভেরার মা উঠে গেলেন কিছু একটা আনার জন্য। তার বাবা পানি খেলেন গ্লাস শূন্য করে। তারপর হামিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি সত্যিই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না বাবা। আমি সেকেলে মানুষ, তাছাড়া বয়স হয়েছে।

নভেরা উঠে গিয়ে বাবার পেছনে দাঁড়ালো। তারপর দুহাতে তার মুখ জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমার জন্য এত ভেবো না তো। নিজের ভালো-মন্দ চিন্তা করার ক্ষমতা আমার আছে।

তার বাবা একটা হাত ধরে সামনে নিলেন, যেন দেখছেন, তারপর বললেন, তোকে নিয়ে আমার চিন্তা যেতে চায় না। কেন বল তো?

দুজন ঢাকায় ফিরে শুনল জয়নুল আবেদিন স্যার তাদের খুঁজছেন। সেগুনবাগিচায় তাঁর আর্ট স্কুলে গিয়ে দেখা করল তারা। না, চাকরি না, একটা কাজের কমিশন। পাবলিক লাইব্রেরির দেয়ালে ম্যুরাল আর রিলিফের কাজ হবে, আবেদিন স্যারই পূর্ত মন্ত্রণালয়কে বলে রাজি করিয়েছেন। উদ্দেশ্য সদ্য বিলেত ফেরত শিল্পী দুজনের অভিজ্ঞতা ব্যবহার আর সেইসঙ্গে একটা পাবলিক বিল্ডিঙের শিল্পকর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সবাইকে জানানো। শুনে খুব খুশি হলো দুজন, ধন্যবাদ জানালো আবেদিন স্যারকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি হেসে বললেন, আরে তোমাদের দুজনের জন্য তো কিছু করতে হয়। বিলেত থেকে এসে বসে বসে সময় কাটাচ্ছ, কোনো মানে হয় না। তারপর নভেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যে-কাজ শিখে এসেছ, স্কাল্পচার, বড় শক্ত জিনিস, এদেশে কদর নাই। উল্টা মুখ ফিরায় নাম শুনলে। তা কী করন যায় আর, শিইখা যখন আইছ, কামতো করন লাগে। যাও এইটা ভালো করে শেষ করো। লোকের পছন্দ হলে, এ ধরনের কাজের চাহিদা বাড়বে।

বাড়িতে ফিরে বইপত্র খুলে বসল দুজন। অন্যান্য দেশে এ-ধরনের পাবলিক বিল্ডিঙে কোন্ ধরনের কাজ হয়েছে তার নমুনা দেখল পাতা উল্টে উল্টে। লোকজন এসে তাদেরকে ব্যস্ত দেখে অবাক হয়। কী হলো দুজনের? হঠাৎ এত সিরিয়াস কেন? চা খেয়ে দুচারটা কথা বলে বিদায় নেয় বন্ধু-বান্ধব। দুজন এখন বাইরে কোনো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছে না। বাড়ির লোকজন এখানে এসে সাবধানে চলাফেরা করে, আস্তে কথা বলে। হামিদের মার কড়া নির্দেশ, তাদের যেন কেউ বিরক্ত না করে। সময়মতো খাওয়া তো আসেই, খাবারের পরিমাণও বেড়ে যায়। না বললেও সবাই বোঝে একটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে।

সেই সময় ঘটল কাণ্ডটা। এ বাড়িতে অনেক বাঁদর, তারা সারাদিন লাফিয়ে লাফিয়ে ছাদ থেকে দেয়ালে, দেয়াল থেকে ঘরের বারান্দায় চলে আসে। একটা বাঁদর তাদের দুজনের খুব ভক্ত হয়ে পড়ে। কোথাও যায় না, এ বাড়িতেই ঘোরাঘুরি করে। একদিন বিরক্ত হয়ে হামিদ বাঁদরটাকে কিছু বলল, আর ছুঁড়ে দিল একটা ইটের টুকরো। বাঁদরটা ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ছাদে গিয়ে লাফ দিয়ে ইলেকট্রিক তারে হাত স্পর্শ করে মরে ঝুলে থাকল। দেখে নভেরার কান্না আর থামে না। রাগ করে হামিদের সঙ্গে কোনো কথা বলল না পুরো দুদিন। মা এসে বললেন, রাগ কইরা লাভ কী? যার যাওনের সে তো গেছেই। কী করন যায়, তকদির। হামিদ কি বুঝতে পারছে বাঁদরে এমন কাণ্ড করব গিয়া? নভেরা স্বাভাবিক হলো। দুজনে বসে আলোচনা করল বিষয়বস্তু নিয়ে, টেকনিক নিয়ে, উপকরণ নিয়ে। ঠিক হলো হামিদ 'বোরআক কেন্দ্র করে ম্যুরাল করবে, নভেরা করবে দুটো রিলিফের কাজ। 'বোরআক ঐশী বাণী লাভের প্রতীক, স্রষ্টার সান্নিধ্যে যাওয়ার বাহন। লাইব্রেরিতে বেশ প্রাসঙ্গিক হবে বিষয়টা। একরা বিসমে রাব্বেকা, পড়ো তোমার প্রভুর নামে।

নভেরা বেশ চিন্তায় পড়ল। রিলিফের আঙ্গিক তার আয়ত্তে, ভাস্কর্যেরই ওটি একটি ধারা। গ্রিক, রোমান, হেলেনিক, রেনেসাঁ যুগের অনেক রিলিফ কাজ দেখেছে সে, ছবিতে আর সামনাসামনি। রিলিফের সুবিধে অনেক; মানুষের, প্রাণীর, বস্তুর সমাহারে একটা কাহিনী বর্ণনা করা যায়। সে কি একটা কাহিনী বলতে চাইবে? কোন্ ধরনের কাহিনী প্রাসঙ্গিক হবে এখানে? পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, লোক-কথা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী? এইসব ভাবতে ভাবতে তার বেশ সময় চলে গেল। হামিদ ততদিনে কাজ শুরু করেছে পাবলিক লাইব্রেরিতে। নভেরা তার সঙ্গে যায় প্রতিদিন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কাজ দেখে। আর্ট স্কুলের ছেলেমেয়েরা আসে। তাদের সঙ্গে কথা বলে। আশেক লেন থেকে খাবার এলে দুজনে কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় বসে খায়। তার আনমনা ভাব দেখে হামিদ বলে, কী হলো? খুব ভাবছ দেখি আজকাল? কাজও শুরু করলে না।

নভেরা সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলে, হ্যাঁ শুরু করব। একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। খুব ধকল গিয়েছে গত এক বছর।

নভেরা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বাঁশের টুকরো। বাঁশ দেখে মনে মনে উচ্চারণ করল দুই অক্ষরের শব্দটা। তারপরই প্রায় জোরে বলে ফেলল, বাঁশখালী। হ্যাঁ, তাইতো বাঁশখালী, যেখানে তাদের গ্রামের ছবি, সেটাই হবে রিলিফের ভাস্কর্যের বিষয়। গ্রামের মানুষ, হাতি, ঘোড়া সব প্রাণী আর দৃশ্য ফুটিয়ে তুলবে লাইব্রেরির দেয়ালে। গ্রামের যে জীবন, যে চালচিত্র নাগরিক জীবনকে, সংস্কৃতিকে ধারণ করে আছে তার উপস্থিতি থাকা দরকার শিক্ষার্থীদের সামনে। তারা যেন শিকড়ের সন্ধান পায়। উৎসের প্রতি বিমুখ না হয়। গ্রামই আমাদের শক্তি এ-কথা মনে রাখতে হবে। আবিষ্কারের আনন্দে সে লাফিয়ে ওঠে। পাবলিক লাইব্রেরিতে নভেরার কাজ শুরু হলো। দুজনে সকালে চলে আসে আশেক লেন থেকে নাস্তা করে, সারাদিন কাজ চলে। দুপুরে বাড়ি থেকে খাওয়া আসে। বিকেলে চা-নাস্তা। হামিদের মা সব দেখে দেন। চাকর-বাবুর্চিদের বলেন, এই, ঠিক সময় খাওয়া লইয়া যাইবি। আর নভেরার লাইগা ইংলিশ খাওয়া নিবি। হে দেশী খাওয়া খাইতে পারে না।

নভেরা হেসে হামিদকে বলে, তোমার মা যে কী। বিদেশী খাওয়া পছন্দ করি মানে দেশী খাবার খাই না এমন মনে করেছেন কেন?

হামিদ সিঁড়ি দিয়ে লাইব্রেরির ওপরে উঠতে উঠতে বলে, মা এক একজন সম্বন্ধে একটা ধারণা করে ফেলেন। সেইমতো কাজ করেন।

পাবলিক লাইব্রেরির কাজ দেখতে এলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার জব্বার সাহেব, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম, আর আবেদিন স্যার তো মাঝে মাঝেই আসেন। একদিন সঙ্গে নিয়ে এলেন পিঠময় লম্বা চুল ছড়িয়ে রাখা, আলখাল্লা পরা একটি লোক। আবেদিন স্যার পরিচয় করিয়ে দিলেন, সুলতান, বাঙালি শিল্পী, করাচি থেকে এসেছে, বহুদিন প্রবাসে ছিল। দেখেই নভেরার ভালো লাগল, ব্যতিক্রমী মানুষ, আর দশজনের মতো না। যখন শুনল সুলতান আর্ট স্কুলে একটা ঘরে রউফ নামে এক ছাত্রের সঙ্গে থাকে তখন সে বলে বসল, আসুন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আওলাদ হোসেন রোডের যে বাড়িতে আমি থাকি তার নিচেরটা খালি আছে। কি বলো হামিদ?

হামিদ নভেরার দিকে তাকালো, সুলতানকে দেখল, তারপর হেসে বলল, হ্যাঁ, এত কষ্ট করে থাকবেন কেন? চলে আসুন।

সুলতান বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনাদের কষ্ট হবে না?

নভেরা বলল, না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে না আপনি কষ্ট দিতে পারেন। নিন চা খান, বলে মাটির খুরিতে ফ্লাস্ক ঢেলে চা খেতে দিল সুলতান আর আবেদিন স্যারকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটির খুরি দেখে সুলতান বলল, ওয়ান্ডারফুল। পরদিনই সুলতান এসে উঠল আওলাদ হোসেন রোডের বাড়িতে। সে ভালো বাঁশি বাজায়, গভীর রাত পর্যন্ত দুজনে বসে বসে তার বাঁশি শোনে। সারাদিনের কাজের ক্লান্তি ভুলে যায় বাঁশি শুনতে শুনতে। তিনজনে খুব জমে ওঠে।

একদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে এস. এম. আলী বলে এক সাংবাদিক এল, যুবক বয়সের, বেশ স্মার্ট। হামিদের সঙ্গে আগেই পরিচয়, নভেরা তাকে এই প্রথম দেখল। বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় চোখ, মুখমণ্ডলে গ্রিকদের মতো বৈশিষ্ট্য, কথা বলে বেছে বেছে, পোশাকে, আচার-আচরণে মার্জিত রুচির ছাপ। নভেরার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর বলল, লন্ডনে থাকতেই আপনার কথা শুনেছি, কেন যে দেখা হলো না সেটাই রহস্য।

হামিদ হেসে বলল, বেটার লেট দেন নেভার। বরং এই ভালো তুমি স্কাল্পট্রেস নভেরাকে দেখছ, ছাত্রী নভেরাকে নয়।

নভেরা মাটির খুরিতে চা ঢেলে দিল। আলী অবাক হয়ে বলল, মাটির কাপ কেন? ভালো কাপ নেই আপনাদের জন্য?

নভেরা হেসে বলল, ভালো বলতে কি শুধু চিনেমাটির কাপ বোঝায়? এই মাটির কাপেও চা খাওয়া যায়। একটা সুন্দর ফ্লেভার পাবেন, যা অন্য কাপে নেই। দেশের মাটির গন্ধ।

আলী নভেরার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে দেখে কিন্তু প্রথমে কেউ ভাবতে পারবেন না যে আপনি এ ধরনের কথা বলতে পারেন।

নভেরা বলল, হ্যাঁ অনেকে তাই মনে করে। একেবারেই ভুল। চলুন আমার কাজ দেখবেন।

তারা দুজন উঠে দাঁড়ালো। হামিদ চা খেতে খেতে বলল, আমাদের কাজের ওপর একটা রিভিউ লিখে ফেলো। একেবারে নতুন, এ ধরনের কাজ আগে হয় নি।

যেতে যেতে আলী বলল, লিখব।

১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারি এসে গেল। পাবলিক লাইব্রেরির কাজ শেষ হওয়ার পথে। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের ভাষা, শিল্প, সাহিত্য আন্দোলন বেশ অগ্রসর। প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই শহীদ মিনারের একটা ডিজাইন ফাইনাল করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হবে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার আবদুল জব্বারকে আহ্বায়ক করে একটা কমিটি হলো। সদস্য শিল্পী জয়নুল আবেদিন, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম। উপদেষ্টা দুজন বিদেশী– ডেনমার্কের স্থপতি দুলুরান আর ম্যাকোনেল। কমিটি থেকে ডিজাইনের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হলো। জয়নুল আবেদিন হামিদ আর নভেরাকে বললেন, তোমরা ডিজাইন দাও, আমার যেন মনে হচ্ছে তোমাদেরটাই নির্বাচিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকে ডিজাইন দিলেও আবেদিন স্যারের কথাই ঠিক হলো। হামিদ আর নভেরার ডিজাইনটাই চূড়ান্ত নির্বাচনে টিকে গেল। ডিজাইনটারই গুণে জিতেছ তোমরা। তোমাদের কেউ খাতির করে নি, বললেন আবেদিন স্যার। তাঁর সামনে ডিজাইনের মডেল আর হাতে স্কেচ। ডিজাইনের ওপরে তিনটি স্তম্ভ নিচু হয়ে আছে একটু। মাঝখানে স্টেইনড গ্লাস, তার ভেতরে একটা বড় চোখ তাকিয়ে আছে। রেলিঙে বাংলা বর্ণমালার মিছিল, মার্বলের চত্বরে শহীদের লাল পায়ের দাগ, পাশে দানবের বড় বড় কালো পায়ের ছাপ। জয়নুল মডেল থেকে হাতের স্কেচে দৃষ্টি ফেরালেন। পাতা উল্টে গেলেন। মিনারের আন্ডারগ্রাউন্ডে ম্যুরালে আঁকা ভাষা আন্দোলনের ছবি।

তিনি তাকালেন দুজনের দিকে। তারপর বললেন, মিনারের সামনে আর সিঁড়ির দুপাশে কী যেন থাকবে বলছিল নভেরা? এখানে দেখছি না কিছু। নভেরা এগিয়ে এসে স্কেচটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে ফোয়ারা হবে, আশেপাশে কিছু সেমি অ্যাবস্ট্রাক্ট মানুষের মূর্তি, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই তৈরি হবে।

আবেদিন স্যার মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর বললেন, ভালো দেখাবে। তবে দেখো মূর্তিগুলো যেন মিনারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে যায়। প্রধান আকর্ষণ হতে হবে চত্বরের ওপর ঐ স্তম্ভ তিনটির।

নভেরা হেসে বলল, আউটডোর ভাস্কর্যের এই এক সমস্যা। তাকে আকর্ষণীয় হতে হবে, আবার স্থাপত্যের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হলে চলবে না। সেইজন্যেই বুঝি রেনেসাঁ যুগে ব্রুনেলেস্কির মতো ব্যক্তি ছিলেন একাধারে স্থপতি আর ভাস্কর।

জয়নুল আবেদিন কিছু বললেন না। মডেলটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

ডিজাইনটা শেষ করতে দুজনের প্রায় এক মাস লেগেছে। আবার দিনরাত কাজ, নিজেদের মধ্যে আলোচনা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় না-রাখার মতো। ছুটোছুটি করতে হয়েছে এখানে-সেখানে। আর্ট স্কুলের লাইব্রেরিতে বই পড়া, ডেনিস স্থপতি দুলুরানের সঙ্গে তাঁর অফিসে আলোচনা, স্থপতি মাযহারুল ইসলামের কাছে গিয়ে সমস্যা তুলে ধরা। দুলুরানের কাছেই যেতে হয়েছে কয়েকবার, মিনারের স্থাপত্য বিষয়ে, বিশেষ করে স্কেলের ব্যাপারে তাঁর উপদেশ নিতে হয়েছে। শেষের দিকে গ্রিক স্থপতি সংস্থা ডক্সিডিয়াসিসও সাহায্য করল। তারা কয়েকবার পার্থেননের কথা বলল, উঁচু বেদির ওপর স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, খুব শ্রদ্ধা জাগায় এই দৃশ্য।

স্টেইন্ড গ্লাসের ভেতর চোখের আইডিয়া নভেরার, এর উৎস ফ্রান্সে আর ইংল্যান্ডে তার দেখা গথিক ক্যাথিড্রাল। স্ট্রাকচারের ডিজাইনে আর্কিটেকচারের চেয়ে স্কাল্পচারাল বৈশিষ্ট্য বেশি। যেন অভয় দিচ্ছে কেউ দাঁড়িয়ে থেকে, নিরাপত্তার আশ্বাস দিচ্ছে। একই সঙ্গে মাথা উঁচু করে রাখার দৃপ্ত অহংকার ফুটে উঠেছে। দুজনে অনেক রাত জেগে তর্ক করেছে, আলোচনা করেছে ডিজাইনের খুঁটিনাটি নিয়ে। সব বিষয়েই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলো না কেউ। শেষ করার পর হামিদ হেসে বলল, শিল্পকর্মে কোন্ শিল্পী সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পেরেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেরা টেবিলে রাখা মডেলের দিকে তাকিয়েছে, হাতের ডিজাইন দেখেছে, কিছু বলে নি। তার খুঁতখুঁতে ভাবটা মন থেকে দূর হতে চায় না। মনে হলো সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন পূর্তমন্ত্রী। খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হলো শহীদ দিবস। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অনেকেই এল আওলাদ হোসেন রোডের বাড়িতে হামিদ আর নভেরার সঙ্গে দেখা করতে। এই প্রথম শিল্পী জীবনের সার্থকতা অনুভব করল দুজন।

কাজ শুরু হয়ে যাবার পর প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফেরে দুজন। পরে ঠিক হলো, শহীদ মিনারের পাশেই তর্জার বেড়া আর টিনের ছাউনি দিয়ে একটা অস্থায়ী ডেরা তৈরি করে থাকবে, খাবার আসবে আশেক লেন থেকেই। হামিদের মা কড়া হুকুম দিলেন চাকরদের, 'এই তোরা নভেরার লাইগা ইংলিশ খাবার নিবি। মাইয়াটা দেশী খাবার খাইতে পারে না।' চাকরদের তখন ব্যস্ততা আরো বেড়ে যায়। বোনরা মুখ টিপে হাসে। বড় ভাই নাসির বলেন, কামডা কি ভালো হইতাছে আম্মা? অহন দেহি একঘরে থাহন শুরু করছে। তার মা হেসে মুখে পানের খিলি পুরে বলেন, হইব, সব ঠিক হইব।

১৯৫৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত শহীদ মিনারের কাজ চলে। শেষ হবার আগেই বন্ধ হয়ে গেল, মার্শাল ল জারি হওয়ার ফলে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলো, কেন্দ্রে আর পূর্ব পাকিস্তানে।

হামিদ আর নভেরার হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়ার মতো দশা হলো। শুধু যে তাদের এখন কিছু করার থাকল না তাই নয়, একটা ঐতিহাসিক মনুমেন্ট তৈরি করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হলো তারা, এই দুঃখেই মুহ্যমান হলো বেশি।

মার্শাল ল ঘোষণার পর ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে নভেরা এয়ারপোর্টের কাছে এম. আর. খান নামে এক ব্যবসায়ীর নতুন তৈরি বাড়ির সামনে একটা স্কাল্পচারের কমিশন পেল।

ভদ্রলোকের প্রচুর টাকা, তাকে পাট দপ্তরের কর্মকর্তা আবদুর রব সাহেব উদ্বুদ্ধ করলেন শিল্পকর্মে পৃষ্ঠপোষকাতর জন্য। বললেন, তোমার বাড়ি রাস্তার পাশে। চারদিকে খোলা মাঠ, গাছপালা, বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগে, যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠেছে, একটা কিছু রাখো সামনের লনে, সুন্দর দেখাবে। ভদ্রলোক রাজি হলেন। নভেরা আর হামিদ এসে দেখে গেল বাড়ি, তার চারপাশ, প্রাকৃতিক দৃশ্য। ঠিক হলো হামিদ বাড়ির সামনের দেয়ালে তৈরি করবে কিছু ছোট ছোট ফ্রিজ, সামনে থাকবে নভেরার স্কাল্পচার। স্কাল্পচারটার বিষয়বস্তু কি হবে তা নিয়ে দুজনে অনেক আলোচনা হলো। এক সময়ে নভেরা বলে উঠল, অফকোর্স। স্কাল্পচারটা ভুঁইফোড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে পরিবেশের সঙ্গে। ভদ্রলোক পাকা দালান করেছেন ঠিকই কিন্তু চারদিকে গ্রামীণ পরিবেশ, জলাভূমি, ধানখেত, গাছপালা। সুতরাং গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে ভাস্কর্য। হামিদ তার দিকে তাকিয়ে থাকল। নভেরা হাসিমুখে বলল, একটা দাঁড়িয়ে থাকা গরু, সামনে পেছনে মানুষ। হামিদ বলল, ভদ্রলোকের পছন্দ হবে? নভেরা বলল, পছন্দ না করে উপায় নেই। আমি তাকে কোনো চয়েস দিচ্ছি না।

দুদিনে ক্লে মডেল তৈরি করে ফেলল নভেরা। একটা দাঁড়িয়ে থাকা গরু আর দুটো মানুষের সেমি অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি, চারটা স্তম্ভ নেমে এসেছে নিচে পায়ের প্রতীক হিসেবে। গরুটির সামনে, পেছনে আর মাঝখানে গোলাকার ছিদ্র, গরু আর মানুষের চোখগুলিও ছিদ্র দিয়ে তৈরি। গরুটির গা অমসৃণ, এখানে-ওখানে কৌণিকতা। গায়ের অংশ হয়েই মানুষ দুটি দাঁড়িয়ে, আলাদা কিছু নয়।

হামিদ বলল, ব্রিলিয়ান্ট কম্পোজিশন, ভেরি মডার্ন ফরম্। শুধু ছিদ্রগুলো হেনরি মুরের প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। নভেরা হাসিমুখে বলল, বেশ তো বলুক না লোকে হেনরি মুর অব পাকিস্তান। তারপর মডেল দেখতে দেখতে বলল, হেনরি মুর সিমেন্ট দিয়ে কাজ করেন নি, গরু আর মানুষ একই অবয়ব থেকে তৈরি করেন নি। ইট ইজ ডিফারেন্ট।

এম. আর. খানের বাড়িতে স্কাল্পচার করার সময় নভেরা কাছেই মণিপুরী পাড়ায় একটা বাড়ি ভাড়া নিল। হামিদই ঠিক করে দিল, পুরনো ঢাকা থেকে রোজ আসতে কষ্ট হয়, সময়ও লাগে। হামিদ তার পুরনো গাড়ি নিয়ে প্রতিদিন সকালে আসে, দেয়ালে ম্যুরালের কাজ করে। রাতে জিন্নাহ এভেন্যুতে ক্যাসবাহ রেস্তরাঁয় আড্ডা দিতে যায় নভেরাকে নিয়ে। কখনো সে আগে যায়, নভেরা পরে যোগ দেয়। আমিনুল, এস. এম আলী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর আসে। কখনো যোগ দেয় নভেরার কাজিন ব্রাদার রসুল নিজাম। এইভাবে ১৯৫৮ শেষ হয়।

১৯৫৯ সালের এপ্রিলে হামিদ আমেরিকায় ম্যুরালের ওপর কোর্স করার জন্য স্কলারশিপ পেয়ে নভেরাকে বলল, কি করব? যাবো?

নভেরা বলল, অবশ্যই যাবে। চমৎকার সুযোগ।

হামিদ বলল, তোমাদের ছেড়ে থাকতে খারাপ লাগবে।

নভেরা হেসে বলল, ছয় মাস দেখতে দেখতে চলে যাবে।

হামিদ নভেরার জন্য বেইলি রোডে একটা দোতলা বাড়ির ওপর তলা ভাড়া করে দিল। তার পুরনো গাড়িটা রেখে গেল তার কাছে, সে ব্যবহার করবে। সব ব্যবস্থা করে সে ফিলাডেলফিয়া চলে গেল। নভেরা নতুন বাড়িতে উঠে স্টুডিও সাজিয়ে নিল। তাকে এখন অনেক স্কাল্পচার করতে হবে। এস. এম. আলী চাপ দিচ্ছে একটা একক প্রদর্শনী করার জন্য। দি পাকিস্তান ইউনাইটেড এসোসিয়েশনের সঙ্গে কথা বলেছে। তারা সব খরচ বহন করবে।

আবার সেই পুরনো সমস্যা পেয়ে বসল তাকে। বিষয়বস্তু কি হবে? ফরম্ কোন্ ধরনের? কয়েকদিন দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে, শুয়ে শুধু ভাবল সে। কোথাও গেল না, কেউ এলে তাড়াতাড়ি বিদায় দিল শরীর অসুস্থ বলে। একদিন ঐভাবে শুয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে হঠাৎ চোখে পড়ল টেবিলের ওপর মাটির পুতুলটার ওপর। ময়মনসিংহের পুতুল, আবেদিন স্যার দিয়েছেন। তড়াক করে উঠে হাতে নিল পুতুলটা। হাত-পাগুলো সংক্ষিপ্ত আর সোজা, অনেকটা হেলেনিস্টিক আর্কাইক পিরিয়ডের ভাস্কর্যের মতো। কোনো বাহুল্য নেই, শাদামাটা, প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি পুতুলটার। একটু যেন নমনীয়তার, পেলবতার অভাব, যেমন থাকে বাঁকঅলা দেহে সুডৌল বাহু কিংবা গ্রীবায়। এই আড়ষ্টতার ক্ষতিপূরণ হয়েছে দর্শকের সঙ্গে পুতুলটির আউট লাইনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে। তাতেই হয়েছে প্রাণ সঞ্চার। এই পুতুলের ফর্‌ম্‌ই সে ব্যবহার করবে তবে আরো বিমূর্তভাবে। নভেরা উল্লাসে লাফিয়ে উঠল। সে ফরম পেয়ে গিয়েছে। ভাস্কর্যের বিষয়ও এসে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ট্রাজেডি এবং তৃপ্তি। প্রতিটি কাজেই থাকতে হবে জীবনকে তলিয়ে দেখার অভিজ্ঞান, সূক্ষ্মতম দৃষ্টি। ভাস্কর্যগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে প্রাণের স্পন্দন, জীবনের জয়গান, ভবিষ্যতের আশাবাদ। চাই আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু। ঢাকা থেকে বেরিয়ে পড়ল নভেরা, কয়েকদিন ঘুরল গ্রামে গ্রামে। দেখল কামার-কুমোরদের কাজ, গুণটানা মানুষ, নৌকোর মাঝি। খণ্ড খণ্ড দৃশ্য দেখার জন্য বসে থাকল ফসলের খেতের পাশে, ভাঙা হাটের ভেতর। নদী তীরে। তার সঙ্গে কেউ নেই, তাতে অসুবিধা হয় না কিছু। ভয়েরও কোনো কারণ দেখতে পায় না সে। সব জায়গাতেই তার জন্য আশ্রয় আর আতিথেয়তা অপেক্ষা করে। সে গ্রামের মানুষের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ হয়। তারা তাকে প্রচণ্ড শক্তি দেয়।

এস. এম. আলী বলে, কি ব্যাপার, কোথায় উধাও হয়ে যাও মাঝে মাঝে? তোমার বাসায় এসে ফিরে যাই। বাড়ির চাকরটাও কিছু বলতে পারে না। নভেরা হেসে বলে, একজন আর্টিস্টকে মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেতে হয়। আলী বলে, সে তো বুঝলাম, কিন্তু কাজের কি হলো? শুরু করছ না কেন? দিন তো বেশি বাকি নেই।

নভেরা বলল, আমি যখন শুরু করি তখন থামতে জানি না। কিন্তু শুরু করার আগে আমার বেশ সময় নেয়।

আলী হেসে বলল, তাইতো দেখে এসেছি। কিন্তু কেন? আলসেমি? অন্য কোনো অসুবিধা?

নভেরা বলল, প্রসব বেদনা। শুনে আলী চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

এর কয়েকদিন পর শুরু হলো কাজ। আলী ট্রাকে করে নিয়ে এল সিমেন্ট, লোহার রড, কাঠের বড় বড় গুঁড়ি আর মার্বল ডাস্টের বস্তা। নভেরা স্টুডিওতে উপকরণ সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, বিলেতে কাজ করেছি মেটালে, পাথরে, প্লাস্টারে আর ক্লেতে। সিমেন্ট কোনো মিডিয়ামই ছিল না। এ অনেক ইনফেরিয়ার। অথচ এখানে সিমেন্ট ছাড়া অন্য কোনো মিডিয়ামে কাজ করার সুযোগ নেই। এ এক দারুণ সীমাবদ্ধতা। অবশ্য এতে একটা লাভ হয়েছে। আমি সেমি অ্যাবস্ট্রাক্ট, অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ করছি, সিমেন্টই এই ফর্‌ম্‌ আমাকে বাধ্য হয়ে করাচ্ছে। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজস্ব স্টাইল গড়ে উঠতে পারবে এইভাবে কাজ করতে গিয়ে। রিপ্রেজেন্টেশনাল ভাস্কর্যে স্বকীয়তা আনা বেশ কঠিন। যা কিছু প্রকৃতির অনুকরণ সেখানে স্বকীয়তা চাপা পড়ে যায়।

আলী নোট বই বার করে বলল, দাঁড়াও, আস্তে বলো। লিখে নেই। তোমার ব্রোসিউরে যে প্রবন্ধ লিখব সেখানে ব্যবহার করব। তারপর লিখে নিয়ে বলল, তুমি সব বড় বড় কাজ করো কেন? মনে হয় যেন আউটডোরের দিকেই তোমার ঝোঁক।

তাতো হবেই। ভাস্কর্যের জন্মই হয়েছে বাইরে থাকার জন্য, মিউজিয়মের ভেতর, কিংবা ড্রয়িং রুমের জন্য নয়। আর্কিটেকচারের ওটা একটা অংশ, সেই হিসেবে সিটি প্লানিং করতে গিয়ে আউটডোর স্কাল্পচারের কথা ভাবতে হবে। পার্কে, রাস্তার মোড়ে, প্রধান ভবনের সামনে, এমন কি কারখানার সামনেও থাকা প্রয়োজন স্কাল্পচার। পরিবেশে প্রাণ সঞ্চার করে এইসব কাজ। We must let the people grow up with work of art, playing a direct positive part in their daily life. আমাদের নর-নারী-শিশুদের মধ্যে জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাতে হবে, এর জন্য শিল্পকে করতে হবে তাদের নিত্য সঙ্গী। বলে একটু থামল সে। তারপর বলল, আমার প্রদর্শনীর নাম ঠিক করেছি, ইনার গেজ।

আলী বলল, সুন্দর নাম। বেশ ফিলসফিকাল। নভেরা বলল, জীবনযাপনের ফিলসফি, এড়িয়ে যাবার জন্য না।

আলী হেসে বলল, তুমি কি ইচ্ছে করেই নিজের জন্য কঠিন একটা লক্ষ্য ঠিক করে নাও? আরো সহজ কোনো বিষয় বেছে নিতে পারতে।

নভেরা হেসে বলল, চ্যালেঞ্জ ছাড়া বেঁচে থাকার অর্থ হয় না। কঠিন কিছু করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেও সান্ত্বনা থাকে। আর্টিনারি, গতানুগতিকে কোনো গৌরব নেই।

AMARBOI.COM

হামিদ ফিলাডেলফিয়া থেকে ফিরল নভেরার প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর। তার আগেই আলী চলে গেল লাহোরে, পাকিস্তান টাইমসে চাকরি নিয়ে। নভেরাকে লাহোর যাবার প্রস্তাব দিয়ে গেল যাবার আগে। নভেরা বলল, দেখি। চিন্তা করে দেখি। তাকে বেশ উদ্ভ্রান্ত দেখায়।

আবার দরজা বন্ধ করে একা একা সময় কাটালো নভেরা। এবারে কোনো ভাস্কর্যের চিন্তা নয়, নিজের জীবনই তাকে ভাবনায় ফেলল। এরি মধ্যে একদিন এসে গেল হামিদ। প্রদর্শনীর ব্রোসিউর দেখল, পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে ছড়িয়ে থাকা কাজগুলো দেখল। খুব খুশি হলো সে। প্রশংসা করল অকুণ্ঠ। তারপর বলল, এত গম্ভীর কেন? কথা বলছ না যে? কি ব্যাপার?

নভেরা বলল, বসো কথা আছে। হামিদ সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখে হাসি।

নভেরা বলল, আমি লাহোর চলে যাবো ঠিক করেছি।

কেন? হামিদ তাকালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে আমার আর করার কিছু নেই। আমি একটা ডেড এন্ডে পৌঁছে গেছি। আমাকে নতুন জায়গায় যেতে হবে।

কিন্তু এখন তো আমি ফিরে এসেছি। দুজনে মিলে আবার নতুন কাজ খুঁজে বার করব। আমাদের জয়েন্ট ভেঞ্চার চলবে।

না, চলবে না। ইট ইজ অল ওভার হামিদ। আমাকে চলে যেতে হবে।

একা? হামিদ তাকালো।

হ্যাঁ, একা। তোমাকে ডিসিভ করতে পারব না আমি। তুমি আমার জন্য অনেক করেছ, তোমার আর তোমার পরিবারের কাছে আমি অনেক ঋণী। কিন্তু এই ঋণ শোধ করার জন্য তোমার সঙ্গে চিরদিন থাকার অর্থ হবে তোমাকে ছোট আর নিজেকে অর্ডিনারি করে তোলা।

হামিদ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কি আছে? আমি এই তো এলাম। দুচারদিন যাক। তারপর ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে।

তার প্রয়োজন নেই হামিদ। তুমি আসার আগে অনেক ভেবেছি আমি। সত্যি বলতে কি আগেই চলে যেতে পারতাম। কিন্তু তুমি আসার আগে চলে গেলে মোটেও ভালো দেখাতো না। তোমরা সবাই ভুল বুঝতে।

এখন চলে গেলেও তো ভুল বুঝতে পারি। হামিদের মুখে ম্লান হাসি।

না। তুমি ভুল বুঝবে না, আর যেই বুঝুক। তুমি আমাকে অনেক কাছ থেকে দেখেছ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তুমি জানো আমি কাউকে প্রবঞ্চনা করি না, অন্যকে না, নিজেকেও না। চিরদিনের জন্য কোনো বন্ধন মানব না বলে যখন ঠিক করেছি তখন তোমার মনে কোনো প্রত্যাশা জেগে থাকুক এটা হতে দিতে পারি না। আমাকে যেতে হবে।

এস. এম. আলীর জন্য? হামিদের ভগ্নস্বর।

সে উপলক্ষ মাত্র। আমার তো একজন সঙ্গী প্রয়োজন, আলী তার বেশিও নয়, কমও নয়।

হামিদ চুপ করে থাকে। তার হাতে নভেরার প্রদর্শনীর ব্রোসিউর। ইনার গেজ, অন্তর্দৃষ্টি।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর বললেন, নভেরাকে আমি তিনবার দেখেছি। ১৯৫৭ সালে হোটেল শাহবাগে, হামিদ নিয়ে গেল এক বিকেলে। গিয়ে দেখি নভেরা লাউঞ্জে সোফায় একা বসে একটা বেলুন ওপরে ছুঁড়ে ফেলে খেলছে। মনে হলো ক্রেজি অথবা কেয়ার করে না এমন একজন। অতবড় একটা মেয়ে বেলুন নিয়ে খেলছে ভাবতে পারেন? দ্বিতীয়বার দেখেছি ফিলাডেলফিয়া থেকে ফিরে তার বেইলি রোডের বাসায়। হামিদের খবর নিয়ে গিয়েছি, সে তখনো ফিলাডেলফিয়ায়। দরজা খুলে নভেরা ভীষণ চিৎকার করে বন্ধ করল দরজা। তারপর বলল, দাঁড়ান, অপেক্ষা করুন জাহাঙ্গীর, আমি নিজেকে কম্পোজ করে নিই। কিছুক্ষণ পর মেকআপ ঠিক করে বেরিয়ে এল সে। আজব মেয়ে, মেক-আপ ছাড়া কারু সঙ্গে দেখা করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয়বার দেখি লাহোরে ১৯৬০ সালের শেষে। আমার হবু স্ত্রী বলল, নভেরা এসেছে লাহোরে। সে আর আলী একটা বাসা খুঁজছে। আমাদের সাহায্য চেয়েছে। হবু স্ত্রীকে নিয়ে নভেরা আর আলীর সঙ্গে দেখা করলাম। চারজনে মিলে খোঁজা শুরু হলো বাড়ি। সব বাড়িতে গিয়ে নভেরা পা টিপে টিপে দেখে ফ্লোর সমান আছে কিনা। দেখে আমি তো অবাক। আজব মেয়ে। তারপর একটু থেমে বলল, সি অলওয়েজ নিউ হোয়াট সি ওয়ান্টেড।

আমিনুল বললেন, নট অলওয়েজ, অ্যাট লিস্ট নট টুয়ার্ডস দি এন্ড। না হলে শেষ জীবনে এত কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে হতো না।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর বললেন, হয়ত সেটাও সে চেয়েছে। ঐ রকমের জীবন।

ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লং শট... মাঝে মাঝে মিডিয়াম লং শট— কিছু ক্লোজআপ...

লাহোরের গুলবার্গ এলাকায় একটি রাস্তা। শীতের শেষ, বসন্তের শুরু। দক্ষিণ থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছে, গাছের পাতার আন্দোলন দক্ষিণ থেকে উত্তরে। গুলমোহর গাছের মাথায় সোনালি ফুলের কলি। এখন সকাল বেলা, গাছের ডালে, দালানকোঠার মাথায় সূর্য আটকে আছে। কয়েকটি পাখি ওড়াউড়ি করছে।

রাস্তাটি ভেতরে, তাই নির্জন। কয়েকটি ছোট ছেলে স্কেটিং করছে। তাদের কথার টুকরো শোনা যাচ্ছে। পানি ছেটানোর মোটর চলছে কোথাও। তার একটানা শব্দ। রেডিওতে খবর হচ্ছে। নিউজ রেড বাই আনিতা গোলাম আলী।

একটি মরিস মাইনর ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো দ্বিতল বাড়িটির সামনে। ভাড়া চুকিয়ে গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথায় শাদাপাকা ঝাঁকড়া চুল, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মোটার দিকে শরীর। মুখটি গোল, ঠোঁটে পাইপ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে একটু পর পর। পরিধানে খয়েরি রঙের ব্যবহৃত পুরনো একটি সুট। ডান হাতে সংবাদপত্র মুড়িয়ে ধরে রাখা।

বাড়িটির প্রধান দরজা খোলা। ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে অভ্যস্ত পায়ে ওপরে উঠছেন। তার পদক্ষেপ বেশ ধীর, যেন হিসেব করে পা ফেলছেন। মাঝখানের মেজানিনে একটু থেমে দাঁড়িয়ে থাকলেন, ম্যাচ জ্বালিয়ে নিভে যাওয়া পাইপ ধরালেন। দুতিনবার টান দিয়ে ধোঁয়া বেরুনোর পর সিঁড়ি দিয়ে আবার ওপরে উঠতে থাকলেন। মেজানিনের পাশে উঁচু কাচের বন্ধ জানালা। ফ্রেমের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো এসে কোণাকুনি ভেঙে পড়েছে সিঁড়ির ওপর। ভদ্রলোক বেল টিপে হাতের কাগজ খুলে চোখ বুলিয়ে নিলেন। পাকিস্তান টাইমস, মার্চ ১৯৬১। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের ছবি, তার বক্তৃতার হেড লাইন। দরজা খুলে গেল। একটি মাঝারি দৈর্ঘ্যের ফর্সা চেহারার তরুণী দাঁড়িয়ে। কালো সেলোয়ার কামিজ, গলা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে রুদ্রাক্ষের মালা বুকের ওপর ঝোলানো। চোখের ভ্রু দীর্ঘ করে আঁকা। মুখে হেভি মেক-আপ।

ভদ্রলোক হেসে ঘরের ভেতর ঢুকলেন। সোফায় বসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাতের কাগজটি এগিয়ে দিলেন।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ আজকের কাগজ পড়েছো?

নভেরা না। নতুন কিছু আছে নাকি?

ফয়েজ হ্যাঁ। ফিল্ড মার্শাল সংবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাস্ট্র করবেন। এমনিতেই সেন্সরশিপ চলছে মার্শাল ল'র পর থেকে। এখন সব কাগজ হিজ মাস্টার্স ভয়েস হয়ে যাবে, বলে তিনি হাসতে থাকেন। (নভেরা ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের উল্টো দিকে সোফায় বসতে বসতে বলল)

নভেরা হাসছেন কেন?

ফয়েজ আমাকে আবার জেলে না নেয়, মার্শাল ল'র পর যেমন নিয়েছিল। বুঝলে নভেরা এইসব ক্ষমতালোভী মিলিটারি বুরোক্র্যাটদের জন্যই পাকিস্তানে গণতন্ত্র আসবে না। গোলাম আহমেদ থেকে শুরু এখন আইয়ুব খানে এসে ষোলকলা পূর্ণতা পেল। আবসে এহি চলেগা। পাকিস্তান উইল বি এ ব্যানানা রিপাবলিক লাইক ইন ল্যাটিন আমেরিকা। জেনারেল সাহেবরা আসবেন আর যাবেন।

নভেরা উঠে দাঁড়ালো। জানালার পর্দা সরিয়ে কিছু দেখল। তারপর পাশের টেবিলের ফুলদানি থেকে শুকনো ফুলগুলো বেছে বেছে ফেলে নিচে রাখল। উঁচু স্বরে কাউকে ডাকলো।

নভেরা এদিকে এসো।

ফয়েজ : কাকে ডাকছো?

নভেরা আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে, শুকনো ফুলগুলো নিয়ে যাক। এতবার বলেছি ফুল শুকিয়ে গেলে ফেলে দেবে। তবু মনে থাকে না।

ফয়েজ তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট খুব নরম হৃদয়ের মানুষ। ফুল ফেলে দিতে কষ্ট হয় মনে হচ্ছে। (একটু ভাবেন। ফুলদানির দিকে তাকান। তারপর বলেন) ফুলের জীবনই হওয়া উচিত আমাদের আদর্শ। যতদিন আছি সবাইকে রূপে, গন্ধে আমোদিত করে হাসতে হাসতে চলে যাবো।

নভেরা হাসতে হাসতে বেচারা যেতে পারে কোথায়? আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। খুব করুণ। আমার একটুও ভালো লাগে না।

ফয়েজ বার্ধক্যের আগেই বিদায় নেওয়া উচিত যখন হাড়-মাংস এক হয় নি, চলতে ফিরতে কারু সাহায্য লাগে না, প্রাণে অঢেল ফুর্তি, বন্ধুদের জন্য অজস্র কথা রয়েছে সেই সময়ের পর দেরি করা ঠিক না।

নভেরা তাহলে বুঝতেই পারছেন মানুষের সঙ্গে ফুলের তুলনা সবদিক দিয়ে যথার্থ নয়। কোথাও কোথাও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বলেন দেখি এই সকালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার আগমনের কারণটা কি? আপনি আমাকে রাজনীতির কথা কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলতে নিশ্চয়ই আসেন নি। আর বলুন কি খাবেন? নাস্তা করে এসেছেন নিশ্চয়ই? না করে এলে খাওয়াতে পারব না। কাল থেকে ডিম শেষ, টাকা নেই। কফি খাওযাতে পারব।

ফয়েজ ডিম কেনার টাকা নেই? বলো না, আর বলো না। শিল্পীদের অভাব-অনটনের যে দীর্ঘ ইতিহাস সেখানে এই ঘটনাটি মোটেও অভিনব শোনাবে না। খুব পুরনো ব্যাপার। তা টাকা নেই কেন? তোমার আনঅফিসিয়াল ব্যাংক এস. এম. আলী কি ধার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে?

নভেরা ব্যাটা ফেরিঅলা এবারে সব পচা ডিম দিয়ে গিয়েছে। নাহলে এই সংকট দেখা দিত না।

ফয়েজ পচা ডিম। এটা তো রাজনীতিবিদদের পাওয়ার কথা। বেচারাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই মনে হয় ভুল করে তোমার এখানে...

নভেরা : আপনি কিন্তু আপনার আগমনের কারণ বলেন নি।

ফয়েজ (আহত স্বরে) কারণ বলতে হবে। তুমি দুঃখ দিলে নভেরা। আমি একজন জনগণের কবি। কারু বাড়িতে আসার জন্য আমার কারণ থাকতে হবে? নাহ্ নভেরা তোমার কাছ থেকে আমি এটা আশা করি নি। আমি কি এই প্রথম তোমার বাসায় এলাম?

নভেরা (হেসে) ওহ্, আপনি কথাও ঘোরাতে পারেন।

ফয়েজ পারি, না? আশ্বস্ত হলাম। তাহলে আরো কিছুদিন কবি হিসেবে টিকে থাকা যাবে। কথার পসরা যারা করে তারাই তো কবি। পুরনো কথা ঘুরিয়েফিরিয়ে বলা, নিজের মতো করে বলা, এই তো কবিতা।

নভেরা বুঝলাম। এখন কারণটাও বলুন। আপনি বিনা কারণে একশবার আসতে পারেন, কিন্তু আজ এই সকালে একটা উদ্দেশ্য আছে আপনার।

ফয়েজ : বলব, বলব। এস. এম. আলী আসুক।

নভেরা সেও আসবে নাকি? বলে নি তো?

ফয়েজ নভেরা, তুমি যখন ভান করো তখন তোমাকে আরো সুন্দর দেখায়, কিন্তু ধরা পড়ে যাও।

নভেরা : সবার কাছে পড়ি না। যারা আমার চেয়ে বেশি চালাক...

ফয়েজ : থাক। সব কথা বলার প্রয়োজন নেই। এস.এম আলী আসুক।

নভেরা ও কাল অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা মেরে গিয়েছে। এত সকালে আসবে কিনা সন্দেহ।

ফয়েজ আসবে। সে যে অনেক রাতে এখানে আড্ডা মেরে গিয়েছে তা আমি জানি।

নভেরা : আপনি জানেন, কেমন করে?

ফয়েজ এখান থেকে সংবাদপত্র অফিসে গিয়েছে। এডিটরিয়াল লিখে আমাকে দেখিয়েছে। তারপর বাড়ি গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেরা (চোখ কপালে তুলে) এত খাটতে পারে, বাব্বাহ। আমি তো মনে করেছি ঘুমোতে গেল।

ফয়েজ সাংবাদিকরা ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। নভেরা তোমার এতদিনে বোঝা উচিত ছিল আমরা অন্য প্রাণী। নিশাচর, উভচর আর যা যা মনে আসে বলতে পারো।

বাইরে বেল বেজে ওঠে। নভেরা দরজা খুলতে যায়। অ্যান্টলপিসে রাখা আয়নায় চেহারাটা দেখে নেয়।

ফয়েজ নিশ্চয়ই এস. এম. আলী।

নভেরা কেউ তো একজন হবে। হতভাগা ডিমঅলাও হতে পারে।

দরজা খুলতে হাসিমুখে এস. এম আলী ভেতরে ঢোকে। গায়ে পাতলা পুল ওভার। গলায় ক্রাভাট বাঁধা। মাথাভর্তি চুল বিন্যস্ত পরিপাটি করে আঁচড়ানো। হাতে ডিম-ভর্তি তারের ঝুড়ি।

ফয়েজ আহমেদ হো-হো করে হাসেন। অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়া এস. এম আলীর সামনে বসেন–

ফয়েজ দেখো নভেরা, আমাদের দুজনের কথাই ঠিক। এস. এম. আলীই এসেছে, আবার ডিমঅলাও। তবে তাকে 'হতভাগা' বলবে কিনা সেটা তোমার ব্যাপার।

আলী : সকালেই হাসির পাত্র হয়ে গেলাম দেখছি। ব্যাপারটা কি?

ফয়েজ বসো, বসো। তুমি তো বোধহয় ভালো করে ঘুমোতেও পারো নি। তার ওপর ডিম কিনতে সবজিমণ্ডিতে গিয়েছ ভোরে।

আলী ঘুম হয়েছে। আমার খুব বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয় না। আর ডিম? এসব আমার ভৃত্যটিই কিনে রেখেছিল আমার জন্য। কোথাও যেতে হয় নি আমাকে।

নভেরা (ডিমের ঝুড়ি হাতে নিয়ে) তোমার কাছ থেকে ডজন হিসেবে কত নেয়?

আলী : জানি না। আমি খবর রাখি না।

নভেরা কিন্তু আমাকে জানাতে হবে। আমার হিসেবের খাতায় লিখতে হবে।

ফয়েজ কেন? ওর সব ঋণই তুমি শোধ করবে নাকি? ডজন হিসেবে ডিম পর্যন্ত? না, না, এ বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

নভেরা কিছু না বলে ডিমের ঝুড়ি নিয়ে ভেতরে চলে যায়। এস. এম আলী উঠে রেকর্ড প্লেয়ারে একটি রেকর্ড চালায়। চার্লস আজাভুর গলায় ফরাসি গান। এস. এম. আলী ফুলদানির দিকে তাকায়।

আলী ফুল আনা উচিত ছিল। ফুলদানিটা প্রায় খালি।

ফয়েজ তুমি নিচের ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিলেই পারো। নভেরাকে দেখাশোনা করার সুবিধে হবে। বেচারি সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। ডিমঅলা পর্যন্ত ফাঁকি দিতে শুরু করেছে। টু মাচ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী (হেসে) ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস ইফ নট কনটেম্পট, ইনডিফারেন্স। এই ভালো।

ফয়েজ আমি তোমাদের দুজনকে বুঝি না। তোমরা আমার জন্য একটা বড় হেঁয়ালি। নারী-পুরুষে অনেক ধরনের সম্পর্ক হতে পারে মানি। বাট ইওরস ডিফাইজ অল ডেসক্রিপসন। তোমরা কি?

নভেরা ভেতরে এসে ঢোকে। তার মুখের মেক-আপ পরিবর্তন হয়েছে। নতুন প্রলেপ দেখা যায়। হাতে এক গুচ্ছ ফুল। ফুলদানির সামনে গিয়ে সে ফুলগুলি নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে। তারপর দুজনের দিকে পিঠ রেখে ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে উদ্দেশ করে বলে–

নভেরা আমরা কি? (হেসে) আমরা কি আমরাই জানি না। তবে আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে।

ফয়েজ তর্জমা। তর্জমা। আলী, আমি খুবই বাঙালি সংস্কৃতির ভক্ত। কিন্তু এই বয়সে বাংলা ভাষা পড়তে পারব না। তর্জমা করে শোনাও। মনে হচ্ছে খুবই প্রোফাউন্ড কিছু বলা হলো।

আলী টেগোরের কবিতার একটা লাইন উদ্ধৃত করল নভেরা।

ফয়েজ : তাহলে তো প্রোফাউন্ড হবেই। তর্জমা, তর্জমা।

নভেরা ডাইনিং টেবিলে ব্রেকফাস্ট সাজাচ্ছে। তার কালো পোশাকের ওপর এখন সে একটি নকশি করা শাদা অ্যাপ্রন চড়িয়েছে। গুন-গুন করে একটা গানের কলি গাইছে সে অস্ফুট স্বরে।

ড্রয়িং রুম থেকে ফয়েজ আর আলীর সংলাপের অনুচ্চ স্বর শোনা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে না কথা, শুধু ফয়েজ মাঝে মাঝে হেসে উঠলে শোনা যাচ্ছে। পাশে কোথাও রেডিওতে সংবাদ হচ্ছে—আর্মি খবরে শুনিয়ে। নিচের রাস্তায় ছোট ছেলেমেয়েদের হল্লা মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। একটা কাক ডাকছে থেকে থেকে। জানালার পর্দা গলিয়ে হলুদ রোদের একফালি ঘরের ভেতর। নীল পর্দা ফুলে উঠছে দখিনা বাতাসে থেকে থেকে। নভেরা দুঘরের মাঝখানের দরজায় গেল।

নভেরার স্বর ব্রেকফাস্ট রেডি। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

একটু পর ফয়েজ আর আলী এই ঘরে প্রবেশ করল। নভেরা দুজনকে তাদের নির্দিষ্ট আসন দেখিয়ে দিল।

ফয়েজ : আমি প্রতিবাদ করছি।

নভেরা : কী? কীসের প্রতিবাদ?

ফয়েজ এই যে তুমি আসন দেখিয়ে দিচ্ছ। এর মধ্যে ফ্যাসিবাদী মনোভাব রয়েছে জানো? ইচ্ছে মতো বসবো আমরা। ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে।

নভেরা নিজের বাড়িতে ইচ্ছে মতো বসবেন। আমার এখানে আমার ইচ্ছে মতো। (ফয়েজ ন্যাপকিন খুলে বুকে জামার ভাঁজে আটকে দিতে দিতে বললেন)

ফয়েজ : ইউ আর এ ডিকটেটর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেরা কেন, আপনারা তো তাই চান। ডিকটেটরশিপ অব দা প্রলেটারিয়াট।

ফয়েজ : তুমি কি প্রলেটারিয়াট?

নভেরা অবশ্যই। প্রলেটারিয়াট মানেই যদি হয় শ্রমসর্বস্ব মানুষ, যার শ্রম ছাড়া বিক্রির কিছু নেই। তার উপরে আমি নারী। আই অ্যাম ডাবলি এ প্রলেটারিয়াট।

আলী নভেরার সঙ্গে কথায় পারবেন না। এইসব ব্যাপারে সে আপনার চেয়েও র‍্যাডিকাল।

ফয়েজ : তাহলে ও কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার হয় না কেন?

(রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে তিনি নভেরার দিকে তাকান। তারপর বলেন)

ফয়েজ আই অ্যাম সিরিয়াস, নভেরা, লাহোর কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান কেন্দ্র। সব শিল্পী-সাহিত্যিক এর সদস্য-সদস্যা। তুমি বাদ থাকবে কেন?

নভেরা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করলে সদস্য হতে হবে কেন। আমি অবশ্যই সাম্যবাদ চাই, সব রকমের সাম্যবাদ। গরিব, ধনী, নারী-পুরুষ। কিন্তু রেজিমেন্টেশনে বিশ্বাস করি না।

ফয়েজ সাম্যবাদে বিশ্বাস মানেই তো এক মতাদর্শে শামিল হওয়া, এখানে রেজিমেন্টেশনের কি হলো?

নভেরা আছে। নিজেকে ধোঁকা দেবেন না ফয়েজ ভাই। পার্টি লাইনের বাইরে কিছু বলতে পারেন আপনারা? পারেন না।

ফয়েজ দরকার কি? লাইন যদি সঠিক হয়, তাহলে বিরুদ্ধে বলার প্রয়োজনই পড়ে না।

নভেরা জ্ঞান-পাপী হতে যাবো না। আপনি ভালোভাবেই জানেন দরকার পড়তে পারে। নাহ্, আমি কোনো শেকলে বাঁধা পড়তে চাই না।

ফয়েজ : তাহলে তোমার আইডিওলজি ব্যাখ্যা করবে কীভাবে?

নভেরা খুব সোজা। ইনডিভিজুয়ালিজম আমার আইডিওলজি। রাগেড ইনডিভিজুয়ালিজম। এর সঙ্গে সাম্যবাদ খাপ খাইয়ে নিতে হবে। সবাইকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

আলী থাক। তোমাকে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য করার জন্য ফয়েজ ভাই এই সাত সকালে তোমার বাসায় আসেন নি।

নভেরা : তাহলে?

আলী ন্যাশনাল আর্ট একজিবিশন হতে যাচ্ছে। সেখানে তোমার স্কাল্পচার একজিবিটের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ফয়েজ হ্যা। বেশ কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তারপর এই সিদ্ধান্ত।

নভেরা : তর্ক-বিতর্ক? কেন?

ফয়েজ বুঝতে পারছ না? পশ্চিম পাকিস্তানে স্কাল্পচার এখনো ট্যাবু। মূর্তি পূজার সমান। সরকারি পর্যায়ে আয়োজিত একজিবিশনে স্কাল্পচার প্রদর্শিত হবে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো অকল্পনীয়। আমি বলতেই অর্গানাইজাররা প্রথমে স্তম্ভিত, তারপর রীতিমতো ক্রুদ্ধ। কিছুতেই রাজি হবে না। আমি পদত্যাগের কথা বললাম কমিটি থেকে। শেষটায় রাজি হলো।

নভেরা আমার জন্য আপনার এত কিছু করা ঠিক হয় নি। ন্যাশনাল একজিবিশনে প্রদর্শিত না হলে কি আমি জাতে উঠব না?

ফয়েজ এ শুধু তোমার ব্যাপার নয়। একটা রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ব্যাপার। আর্ট এস্টাবলিশমেন্ট আর কতকাল এই ফিলিস্টিনিজম দেখাবে? পৃথিবীর সব দেশে স্কাল্পচার স্বীকৃত শিল্প, আর আমরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকব? হতে পারে না। তুমি একটি টেস্ট কেইজ।

নভেরা গিনিপিগ বলুন।

ফয়েজ না, না, অমন করে বলো না। তোমাকে তো স্যাক্রিফাইস করা হচ্ছে না।

নভেরা কেন সমালোচনা, বিরূপ সমালোচনা হবে না আমার সম্বন্ধে?

আলী হয়ত হবে। আমরা দেখতে চাই সেটা কত শক্তিশালী। তোমার পক্ষেও সমর্থন যোগাড় করা হবে।

নভেরা : তার মানে গিনিপিগ।

আলী : গিনিপিগ উইথ এন অ্যাটাকিং পার্টি। অর্থাৎ, একাকী গিনিপিগ নয়।

ফয়েজ এই যে বললে ইনডিভিজুয়ালিজম, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে মাঝে মাঝে ফাইট করতে হবে না?

(নভেরা কাঁটা চামচ দিয়ে ডিম কাটলো। ছুরি দিয়ে রুটিতে মাখন লাগালো। কাপে কফি ঢেলে নিল। তারপর বলল)

নভেরা : ফাইট অবশ্যই করতে হবে। করুণা আমার একদম সহ্য হয় না।

ফয়েজ : দ্যাটস এ গুড গার্ল।

নভেরা দ্যাটস গুড গার্ল নয়। বলুন দ্যাটস এ গুড আর্টিস্ট। আমাকে মেয়ে ছাড়া কি আর কিছু মনে হয় না? আই এম এ পার্সন।

ফয়েজ (কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে) ইয়েস এন এক্সট্রাঅর্ডিনারি পার্সন। ফেড আউট...

ফেড ইন... চট্টগ্রামে চট্টেশ্বরী রোডে এনাসেল ভবনের সামনে মেয়র নির্বাচনের অফিস। দেয়ালে, বাড়ির সামনে পোস্টার আর চিকায় পদপ্রার্থীদের ছবি এবং নাম। প্রাঙ্গণের ভেতর একটি টিন, বাঁশের বেড়া টিনের ছাদ দেওয়া অস্থায়ী ক্যাম্প। চেয়ার-টেবিল শূন্য, কয়েকটি যুবক ঘন ঘন সিগারেট টানছে, খুব উত্তেজিত। রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল যাচ্ছে। কোলাহল, স্লোগান। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে। মিডিয়াম শট... অডিও...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় বেল টিপতে মুর্তজা বশীরের ছোট মেয়ে যূথী দরজা খুলল, সরে দাঁড়িয়ে বলল,

যূথী আসুন, আব্বা ভেতরে আছেন।... ক্লোজআপ...।

হাসনাত ভেতরের ঘরে ঢুকল। কেউ নেই, বাথরুমের দরজা বন্ধ, পানি পড়ার শব্দ। বিছানায় একটা জ্যাকেট ছড়ানো, পশ্চিমের দেয়াল বরাবর একটা স্টিলের ওয়ার্ডরোব, বাইরে আর একটা জ্যাকেট হ্যাঙ্গার থেকে ঝুলছে। তার পাশে বুক শেল্‌ফে পুরনো বই, পত্রপত্রিকা। বাথরুমের দরজার ওপর মুর্তজা বশীরের বড় পোর্ট্রেট, হাসি হাসি মুখ, স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। উত্তর দিকের দেয়াল বরাবর ছোট শেল্‌ফ, ভেতরে বইপত্র, ওপরে রঙ, তুলি-শিশি-বোতল। পূর্ব দিকের দেয়ালে দুটো লক্ষ্মীসরা, একটা পুরনো টাবে টেরাকোটা টাইল, ভেতরে একটা টিয়া পাখির রিলিফ, একটি মাস্ক, রুডি গুলিতের আবক্ষ ছবি, ফুটবল দলের গ্রুপ ফটো।

বাথরুমের দরজা খুলে মুর্তজা বশীর বেরিয়ে এসে হাসনাতকে দেয়ালের দিকে তাকাতে দেখে–

বশীর আপনার জন্য দুটো ডকুমেন্ট খুঁজে বার করেছি। নভেরা সম্বন্ধে তথ্য পাবেন।

(হাসনাত ঘুরে দাঁড়ায়, তারপর ছোট চেয়ারে বসতে বসতে বলে)

হাসনাত : কীসের ডকুমেন্ট?

বশীর (বুক শেল্‌ফের কাছে গিয়ে কয়েকটি কাগজ তুলে নিয়ে এসে) ১৯৬১ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এক্সজিবিশন অব পেইন্টিং, স্কাল্পচার অ্যান্ড গ্রাফিক আর্টসের ব্রোসিওর আর ঐ প্রদর্শনীর ওপর লেখা ওয়াটসন নামে এক আমেরিকানের একটি রিভিউ।

হাসনাত আপনার রেকর্ড কিপিং অসাধারণ। চট করে বার করে ফেলতে পারেন। ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় না।

বশীরের হাত থেকে চটি বই দুটো হাতে নিয়ে হাসনাত পাতা উল্টে দেখে।

বশীর (হাসনাতের দিকে তাকিয়ে) এই এক্সজিবিশনে নভেরার বেশ কয়েকটা স্কাল্পচার দেখানো হয়েছিল।

হাসনাত (ব্রোসিওরের পাতায় চোখ রেখে) মোট ছটি স্কাল্পচার, নামও দেওয়া আছে এখানে। এক. হোলিওভার আনহোলি, দুই. চাইল্ড ফিলোসফার, তিন. ওয়ার্ক অন ইস্ট পাকিস্তান সাইক্লোন, চার. প্রোগ্রেস, পাঁচ. ম্যান অ্যান্ড উওমেন, ছয়. এ স্কাল্পচারাল স্ক্রিন।

বশীর তার 'চাইল্ড ফিলোসফার' কাজটি বেস্ট স্কাল্পচার পুরস্কার পেয়েছিল। অন্য কাজগুলোর তুলনায় এটা ছোট ছিল। অ্যাবস্ট্রাকশন ছিল না, গলাটা একটু স্টাইলাইজড, সব কিছু মিলে বেশ একটা ড্রামেটিক ইফেক্ট তৈরি করতে পেরেছিল। চোখে পড়বার মতো।

হাসনাত (পাতা উল্টে নিয়ে) হ্যা, ব্রোসিওরের ভেতরের পাতাতেই ভাস্কর্যটির ছবি ছাপা হয়েছে। গোলাকার শূন্যের ভেতর থেকে একটি মুখ যেন বেরিয়ে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর আলো দেখছে, অবাক বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত, মুখটা একই কারণে ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে।

বশীর তার সব কাজেই একটা মেসেজ ছিল। শুধু এসথেটিকস না, সোসাল কমিটমেন্টের এক্সপ্রেশনও গুরুত্ব পেয়েছে।

হাসনাত আপনি তো তখন লাহোরে। দর্শকরা কীভাবে নিয়েছিল তার কাজ?

বশীর খুব সেনসেশন ক্রিয়েট করেছিল। পাকিস্তানে তখন ভাস্কর্য তেমন পরিচিত ছিল না। বরং এক ধরনের নীরব নিষেধাজ্ঞা ছিল। নভেরা ব্রেক থ্রু করল। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার শুধু তার জন্য না, শিল্পকর্ম হিসেবে ভাস্কর্যেরও প্রথম স্বীকৃতি।

হাসনাত ব্রোসিওরে লিখেছে এটাই প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় শিল্প প্রদর্শনী। এর আগে কি শিল্প প্রদর্শনী হয় নি?

বশীর হয়েছে। তবে করাচিতে এবং বেসরকারি উদ্যোগে। ১৯৬১ সালেই প্রথম লাহোরে জাতীয় প্রদর্শনী হয়। সরকারি উদ্যোগে সে-বারই প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন।

হাসনাত (বশীরের দিকে তাকিয়ে) লাহোরে কেন? করাচি, সেখানে হলো না কেন?

বশীর (উঠে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরালো, ধুঁয়ো বার করে বলল) করাচি রাজধানী হতে পারে, কিন্তু সেখানে পাঞ্জাবির প্রাধান্য ছিল না। মার্শাল ল-র পর করাচি থেকে রাজধানী সরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। শাসকগোষ্ঠী, আর্মি, সিভিল ব্যুরোক্রেসি সবই পাঞ্জাবিদের দখলে। অন্য সব কিছুর মতো আর্ট, কালচারকেও তারা পাঞ্জাবে সরিয়ে আনতে চেয়েছে।

হাসনাত নভেরা কি লাহোরে এক্সিবিশন উপলক্ষেই গিয়েছিলেন?

বশীর (চেয়ারে বসতে বসতে) না, তার আগেই এসেছিল। মনে হয় এস. এম. আলী ডেকে এনেছিল। তাছাড়া ঢাকাতে ১৯৬০-এর পর কিছু করার ছিল না নভেরার। কমিশন করানোর মতো বড়লোক কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা করার উপযোগী অর্গানাইজেশন সবই তো পশ্চিম পাকিস্তানে। আমি যে কারণে এসেছিলাম প্রথমে করাচি, পরে লাহোরে, জাহাঙ্গীর রাওয়ালপিন্ডিতে, হামিদ করাচিতে।

(বশীর বিছানায় উবু হয়ে কাগজ নেড়েচেড়ে একটি পৃষ্ঠা বার করে নিল। তারপর হাসনাতের দিকে তাকিয়ে বলল)

বশীর ওয়াটসনের রিভিউটা পড়েছেন? নভেরার কাজ সম্বন্ধে মন্তব্য আছে। শেষের দিকে দেখুন।

(হাসনাত পড়তে থাকল। বশীর ঘর থেকে বেরিয়ে একটু পর ট্রেতে চা নিয়ে ঢুকল। বিছানার ওপর রেখে হাসনাতের দিকে তাকিয়ে থাকল। হাসনাত পড়া শেষ করে বলল)

হাসনাত : বেশ ব্যালান্সড লেখা, প্রশংসা আছে, সমালোচনা করতেও ছাড়ে নি।

বশীর : চাইল্ড ফিলোসফারের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত লিখেছে, এ হেড অব এ চাইল্ড ক্যাচেস পারফেক্টলি দি এগোনি অব ইম্যাচিওর থট অ্যান্ড রিফ্লেকশন। কিন্তু বেস্ট বলেছে কোয়ার্টার রিলিফে করা একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্যানেলকে।

বশীর 'প্রগ্রেস,' সেই কাজটা প্যানেলে অ্যাবস্ট্রাক্টভাবে তৈরি। সমাজের প্রগতি, এই বিষয়বস্তু নিয়ে। বলেছি না তার সোসাল কমিটমেন্টের কথা?

হাসনাত (পড়তে পড়তে) কিন্তু ওয়াটসন সাহেবের কাছে সবচেয়ে বড় কাজটি পছন্দ হয় নি। একটি নারী শকুনের গলা চিপে ধরেছে। এটা ওয়াটসনের কাছে খুব ডাইরেক্ট আর এগ্রেসিভ মনে হয়েছে। আঙ্গিকও পছন্দ হয় নি তার, লিখেছে ইট ইজ ফুল অব অ্যাঙ্গলস। (তারপর হাসতে হাসতে) শেষে লিখেছে, ইট ইজ ডিমান্ডিং অ্যান্ড আই কুড নট লিভ উইথ ইট।

বশীর এই কাজটাতে নভেরা অশুভের ওপর শুভের জয় দেখাতে চেয়েছে; অথবা অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে নারীর মুক্তি। এ কাজটা কারো পছন্দ না হওয়ার কারণ নেই। হ্যা, প্রোপাগান্ডার ভঙ্গিটা একটু বেশি সোচ্চার, সোসালিষ্ট আর্টের মতো।

হাসনাত নভেরা সম্বন্ধে কিন্তু বিরূপ মনোভাব নেই এই প্রবন্ধে। প্রথমেই লিখেছে, 'নো ডিসকাসন অব পাকিস্তান আর্ট উড বি কমপ্লিট উইদাউট রেফারেন্স টু হার।' পাকিস্তানে একজন ভাস্করের যে কি সমস্যা, বিশেষ করে উপকরণ সংগ্রহে সে সম্বন্ধেও বিশদ লিখেছেন। মার্বল নেই, ব্রোঞ্জ কাস্টিংয়ের সুবিধা অনুপস্থিত। কমিশন পেয়ে অগ্রিম টাকা দিয়ে উপকরণ কেনার সুযোগ ছাড়া যে ভাস্কর্যের মতো শিল্প মাধ্যমে কাজ করা কঠিন এই বিষয়টার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নভেরার জন্য তাঁর সহানুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে এই সব মন্তব্যে।

বশীর (হাসনাতের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে দিতে) হ্যা, সহানুভূতিশীল তো বটেই। একটা কাজ ভালো লাগে নি বলে সব বাজে বলে নি। লোকটা স্পষ্টভাষী।

হাসনাত তিনি কে?

বশীর : অ্যামেরিকান ফ্রেন্ড অব দ্য মিডল ইস্টের ডাইরেক্টর, করাচিতে অফিস ছিল, শিল্পকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করত। আমার প্রথম প্রদর্শনী ওঁর সাহায্যেই হয়েছিল। করাচিতে ১০ নম্বর বোনাস রোডে তাঁর বাড়িতে আমার স্টুডিও করতে দিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ছিল হাফ জাপানিজ, নাচের স্কুল ছিল তাঁর। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এসে এক স্প্যানিশ ডান্সারের জন্য বসে থাকত তাঁর বাড়িতে। ১০ নম্বর বোনাস রোডের ওপরের তলায় ছিল জিয়া মহিউদ্দিনের 'করাচি আর্ট থিয়েটার,' তখন জা আনুই-এর 'রিং এরাউন্ড দা মুন'-এর উর্দু ভার্সনের রিহার্সাল হতো সেখানে।

হাসনাত ওয়াটসনের প্রবন্ধটা কোন্ পত্রিকায় বেরিয়েছিল?

বশীর ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম অ্যান্ড পাবলিকেশন্স থেকে 'কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান' নামে একটা পত্রিকা বেরুতো, ১৯৬২-এর স্প্রিং ইস্যুতে ছাপা হয়েছিল। আমি শুধু প্রবন্ধটা ফটোকপি করে রেখেছি। দাঁড়ান বার করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(বলতে বলতে বশীর বইয়ের শেল্‌ফ থেকে খুঁজে খুঁজে বইপত্র বার করছে। পাতা ওল্টাচ্ছে। হাসনাতের সামনে এসে তার নোট নেওয়া দেখছে। বাইরে ভীষণ হৈ-চৈ, স্লোগান, লাউড স্পিকারে ঘোষণা)

বশীর দিন রাত এই কাণ্ড চলছে। ঘুমুতে পারি না। মেয়রের ইলেকশনে এমন হৈ-চৈ হতে পরে জানা ছিল না।

হাসনাত: (মুখ নিচু রেখে নোট নিতে নিতে) মেয়রের নির্বাচন এই তো প্রথম। উত্তেজনা বেশি। সমস্ত শহরই একটা কনস্টিটুয়েন্সি।

বশীর (হাসনাতের দিকে ঝুঁকে) এই বইটার নাম লেখেন। স্কাল্পচার সম্বন্ধে যখন লিখবেন, কাজে লাগবে।

হাসনাত (বশীরের দিকে তাকিয়ে) কি করে জানলেন স্কাল্পচার সম্বন্ধে লিখব?

বশীর (মুখের পাইপে আগুন ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে) আই অ্যাম অলসো এ রাইটার।

হাসনাত সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। নভেরা সম্বন্ধে বলুন। একজিবিশনের পর কি করলেন তিনি?

সুতরাং বশীর পাইপ টানলেন চুপ করে। যেন কিছু ভাবছেন। তারপর বললেন—

বশীর শুনেছি কিছুদিন পর সে বোম্বে চলে যায়। লাহোরে কিছু কাজ পাচ্ছিল না।

AMARBOI.COM

আকাশ থেকে আরব সাগরকে সবুজ দেখাচ্ছিল, যেন জলধি নয়, বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর, মাঝে মাঝে উঁচু নিচু হয়ে আছে, যার ওপরে শাদা কাশ ফুলের মতো ঢেউ হেসে গড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। শাদা রঙের অনেক পাখি উড়ছে, সবুজ সমুদ্রের কাছাকাছি, দেখেই চেনা গেল তার সি-গাল। বড় বড় জাহাজগুলোকে ওপর থেকে দেখে অবিকল খেলনা মনে হলো। প্লেন বেঁকে ফর্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেলে ঘুরতেই চোখে পড়ল ছবিতে দেখা খুব পরিচিত তোরণটি, গেট অব ইন্ডিয়া, রানী ভিক্টোরিয়ার আগমন উপলক্ষে তৈরি ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষের মানুষের ইট-পাথর-চুন-সুরকির শ্রদ্ধাঞ্জলি। নামটি যেমন ইংরেজি, স্থাপত্যেও ভারতবর্ষের কোনো চিহ্ন নেই, স্পষ্টভাবেই গ্রেকোরোমান ক্লাসিক মডেলের ধাঁচে তৈরি। এত তন্ময় হয়ে গেট অব ইন্ডিয়া দেখছিল নভেরা যে এয়ার হোস্টেস এসে সিট বেল্ট বাঁধতে বলার পরও শুনতে পেল না। কাঁধে স্পর্শ হতেই ফিরে তাকিয়ে বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে বেল্টের দুই প্রান্ত টেনে নিল কোলের ওপর। এয়ার হোস্টেস মৃদু হেসে চলে গেল। প্লেন ক্রমেই নিচে নামছে।

ইমিগ্রেশন শেষে কাস্টমস থেকে সুটকেস নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অপেক্ষমাণ নর-নারীর ভিড়ের দিকে তাকাতেই দেখল বব্ ছাঁট চুল, গোল কাচের চশমা চোখে, নীল সালোয়ার কামিজ পরা এক মহিলা হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। নভেরা খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্বস্ত হয়ে তাকিয়ে থাকল। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের ওপর হবে। কিন্তু মুখের চাপা হাসিতে একটু যেন দুষ্টুমি প্রচ্ছন্ন।

তুমি নিশ্চয়ই নভেরা। ভদ্রমহিলা হাত বাড়ালেন।

আপনি নিশ্চয়ই ইসমত চুগতাই। নভেরা সালাম দিল।

কি করে চিনলে? ভদ্রমহিলা হাসলেন।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। নভেরা হাসল।

চিঠিতে তোমার যে বর্ণনা ফয়েজ দিয়েছে তাতে আমারও চিনতে অসুবিধা হয় নি।

নভেরা সুটকেস বাঁ হাত থেকে ডান হাতে চালান করে হেসে বলল, ফয়েজ ভাইয়ের আর্টিস্ট হওয়া উচিত ছিল। পেইন্টার। খুব ভালো পোর্ট্রেট আঁকতে পারতেন।

ইসমত চুগতাই তার হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, সুটকেসটা বেশ ভারী মনে হচ্ছে। কুলি ডাকি।

নভেরা সুটকেস নামিয়ে বলল, খুব ভালো হয়। সুটকেস বয়ে বেড়ানোর মতো বিরক্তিকর আর কিছু নেই। তারপর থেমে বলল, ওজনের কথা বলছি না, নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায় না।

ইসমত চুগতাই ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কেমন?

মানে লোকজন দেখেই বুঝে ফেলে যে একজন আগন্তুক, নতুন এসেছে। একজন অচেনা যাত্রী।

বাহ্, এমনভাবে তো ব্যাপারটা কোনোদিন দেখি নি। চমৎকার একটা দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে এই ভাবনার পেছনে। হুঁ। বলে তিনি সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর হাঁটতে হাঁটতে বললেন, সুটকেস একটা সিম্বল। গৃহহীনের প্রতীক, গৃহীর প্রতীক, দুই-ই। চমৎকার আইডিয়া। আমার কোনো লেখায় ব্যবহার করব।

গাড়িতে ড্রাইভিং সিটে যে মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক বসে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ইসমত বললেন, মাই হাজব্যান্ড, শাহিদ লতিফ।

নভেরা পেছনের সিটে বসতে বসতে বলল, নাম শুনেছি। শাহিদ লতিফ ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে হেসে বললেন, আমার নাম ইসমতের খ্যাতির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে। সবাই আমাকে ইসমতের হাজব্যান্ড বলে।

ইসমত কপট ক্রোধের ভঙ্গিতে বললেন, সাট আপ। তারপর পেছন ফিরে নভেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, শাহিদ একজন নামকরা চিত্র পরিচালক আর প্রযোজক জানো নিশ্চয়ই?

নভেরা মাথা নেড়ে বলল, জানি। তার পরিচালিত 'জিদ্দি' ছবিটি দেখা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহিদ লতিফ হেসে বললেন, আসল কথাটা বললে না, নাকি জানো না?

কি? নভেরার স্বরে কৌতূহল।

'জিদ্দি' বইটির লেখিকা, চিত্রনাট্যকার ইসমত।

নভেরা পথের পাশে বাড়িঘর দেখতে দেখতে বলল, জানি।

বাড়িতে পৌঁছে দোতলায় একটা ঘরে নভেরাকে নিয়ে ঢুকল চুগতাই। শাহিদ লতিফ চলে গেলেন কাজে। রাতে খাবার সময় কথা হবে বলে গেলেন। ঘরে ঢুকে ইসমত বললেন, ওর সঙ্গে রাতেই দেখা হয় আমার। সকালে বের হয় যখন শুয়ে থাকি বিছানায়। সারাদিন বাইরে থাকে। আমি বেরুই কখনো-সখনো, কিন্তু বেশির ভাগই বাড়িতে থাকি।

লেখেন কখন? নভেরা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে।

ইসমত জানালার পর্দা টেনে দিয়ে বললেন, যখন মুড আসে। দুপুরে, বিকেলে। কখনো-বা সকালেই 'মিউজ' এসে হাজির হয়। তারপর নভেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সুটকেস খুলে গুছিয়ে নাও। ঐ যে তোমার ওয়ার্ডরোব। পাশেই বাথরুম, দরজার নবটা একটু ঢিলে হয়ে গিয়েছে। সারাবো-সারাবো করেও এতদিন হয় নি। এখন হবে। তুমি এসেছ। অতিথিকে তো আর ঢিলে নব ব্যবহার করতে বলা যায় না।

নভেরা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, একটা অনুরোধ।

কি?

আমাকে অতিথি ভাববেন না। কখনো এ নামে ডাকবেন না।

ইসমত হেসে বললেন, বেশ তো, তুমি এ বাড়িরই একজন তাহলে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, আই লাইক ইউ। ইউ আর ডিফারেন্ট। জাস্ট অ্যাজ ফয়েজ রোট। হ্যাঁ, তুমি গোছগাছ শেষ হলে নিচে এসো। দুজনে বসে চা খাবো। তখন কথা হবে।

AMARBOI.COM

চায়ের কাপ ঠোঁটের কাছে নিয়ে ইসমত বললেন, আমি কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না তুমি নাচ শিখতে বম্বে এসেছ কেন?

নভেরা বিস্কিটের টুকরো চিবুনো শেষ করে বলল, ফয়েজ ভাই বললেন। একজিবিশন শেষ হয়ে যাবার পর একদম বেকার। কিছু করার ছিল না।

ইসমত অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর চায়ের কাপ সামনে উঁচু করে রেখেই বললেন, ফয়েজ বলল, আর তুমি নাচ শিখতে চাইলে? তুমি একজন ভাস্কর, নাচ শিখতে চাইবে কেন?

ভাস্কর্যের সঙ্গে নাচের সম্পর্ক নেই বুঝি? নভেরার চোখে কৌতুক চক চক করে।

কেমন?

নাচের অঙ্গভঙ্গি ফ্রিজ করে দিলেই চমৎকার স্কাল্পচার সৃষ্টি হতে পারে। হাতের মুদ্রা, চোখের চাউনি, পায়ের বিস্তার সব কিছুই স্কাল্পচারের থিম। অজন্তায় আছে, খাজুরাহোর মন্দিরে আছে। ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্যে নর্তকীর রূপায়ণ খুব জনপ্রিয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো হয়ে গেল না তাহলে? ইসমত তাকান তার দিকে।

পুরনোর নতুন অভিব্যক্তি হতে পারে। ভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়া যায়। গ্রেট পটেনশিয়াল।

হাতের কাপ টেবিলে রেখে ইসমত বললেন, বুঝলাম। বাট হোয়াই বম্বে? হোয়াই বৈজয়ন্তীমালা?

নভেরা তাকালো মেঝের দিকে। একটা শাদা বেড়াল লাল বল নিয়ে খেলতে খেলতে ইসমতের পায়ের কাছে এসে গিয়েছে। ইসমত তাকে কোলে তুলে না তাকিয়েই পায়ের ওপর আঙুল বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ বোলানোর পর তার চোখ যেন আবেশে অর্ধ নিমীলিত হলো। নভেরা অবাক হয়ে তাকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, বম্বে এলাম, ফয়েজ ভাই বললেন, তাই। বৈজয়ন্তীমালার কথাও তিনি বললেন।

আবার ফয়েজ ভাই। ইসমতের স্বরে চাপা ক্রোধ যেন। তারপরই মুখ হাসিতে ভরে যায়। হেসে বলেন, তোমার কি নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই? কেবল অন্যের কথাতেই চলো?

প্রবলভাবে মাথা নাড়ল নভেরা। তারপর জোরের সঙ্গে বলল, অবশ্যই আছে। ফয়েজ ভাইয়ের কথা যদি পছন্দ না হতো তাহলে আসতাম না।

বেশ বুঝলাম। কিন্তু বম্বে কেন? হোয়াই নট মাদ্রাজ?

নভেরা গম্ভীর স্বরে বলল, আমি এখানে আসায় আপনি কি অসন্তুষ্ট? মোটেও না। আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করছে। নভেরা আস্তে আস্তে বলল, আপনি ভীষণ কৌতূহলী, ভেরি নোজি।

হো-হো করে হাসলেন ইসমত। হাসি থামিয়ে বললেন, আমি একজন লেখিকা। কৌতূহলই আমাদের উপকরণ জুগিয়ে দেয়।

আমি একটি উপকরণ তাহলে? আর কিছু নই? নভেরা তাকায় তার দিকে।

ইসমত উদাস স্বরে বলেন, মানুষই উপকরণ। ঐশ্বর্যময়, শক্তিশালী, সম্ভাবনাময়, অনেক কিছু।

রাতে খাবার সময় শাহিদ লতিফ বললেন, নভেরা ঠিকই বলেছে। বৈজয়ন্তীমালা ইজ ওয়ান অব দা গ্রেটেস্ট এক্সপোনেন্ট অব ক্লাসিকাল ডান্স। তার কাছে নাচ শেখার ইচ্ছে খুবই স্বাভাবিক।

ইসমত বললেন, কিন্তু বৈজয়ন্তীমালা কি সময় দিতে পারবে? রাজি হবে নাচ শেখাতে?

শাহিদ লতিফ বললেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। রাজি হবে কিনা? ও আজকাল যা ব্যস্ত থাকে শুটিং নিয়ে। বম্বেতে প্রায়ই থাকে না।

নভেরা বলল, আমি কিন্তু বড় আশা নিয়ে এসেছি।

শাহিদ লতিফ বললেন, চেষ্টা করে দেখি কি হয়। এখনই কিছু বলা যাবে না। আমি বেশ চেষ্টা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসমত বললেন, আমিও বলব তাকে। মেয়েটা এত দূর থেকে এসে ফিরে যাবে তার মানে হয় না।

শাহিদ লতিফ নভেরার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ইচ্ছে হলে থেকে যেতে পারে। বম্বের ফিল্ম প্রডিউসাররা ওকে পেলে লুফে নেবে।

শুনে খাওয়া বন্ধ করে চুপ করে থাকল নভেরা। মুখ নিচু করে রাখল সে। তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

ইসমত বললেন, কী হলো?

নভেরা গম্ভীর স্বরে বলল, আমি অপমানিত বোধ করছি। আমি নাচ শিখতে এসেছি শখ করে। অভিনেত্রী হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই আমার।

ইসমত তার কাঁধে হাত রেখে হেসে বললেন, আরে ওতো ঠাট্টা করে বলল। এতে রাগ করতে যাবে কেন?

আমার এমন ধরনের কথা ভালো লাগে না। ভেরি ভালগার।

শুনে অপ্রস্তুত হয়ে যান শাহিদ লতিফ। তাড়াতাড়ি বলেন, সরি। আমি খুব ভেবেচিন্তে বলি নি। একটু থেমে বলেন, বম্বে ফিল্মি শহর। কথায় কথায় ফিল্ম, অভিনয়, নায়ক-নায়িকা, এসব এসে যায়। ডোন্ট মাইন্ড। তোমাকে অভিনেত্রী হতে হবে না।

ইসমত বাঁ হাত দিয়ে নভেরার গাল টিপে বললেন, ইউ আর প্রেটি। প্রেটিয়ার দ্যান মেনি অব দা হিরোইনস অব বম্বে।

নভেরার ফর্সা মুখ হঠাৎ লাল হয়ে যায়। ইসমত যেখানে তাকে স্পর্শ করেছিলেন সেখানকার চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে।

বৈজয়ন্তীমালাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি শুটিংয়ের জন্য বোম্বের বাইরে গিয়েছেন। কদিন পর আসবে কেউ বলতে পারছে না।

ইসমত বললেন, কি আর করা যাবে। অপেক্ষা করো। বইপত্র পড়তে পারো, বম্বে শহর দেখতে চাইলে বেরিয়ে পড়তে পারি তোমার গাইড হয়ে।

নভেরা বলল, আপনার চমৎকার লাইব্রেরি। বইপত্র অনেক। পড়াশোনাই করব। বেশ সময় চলে যাবে। বম্বে শহর তো একদিনে সব দেখা শেষ।

কিন্তু এ-শহরের ইন্টারেস্টিং সব মানুষ দেখা হয় নি তোমার। এত বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ খুব কম শহরেই আছে। আমি সেই ১৯৪২ সালে শাহিদ লতিফকে নিয়ে যখন বম্বে আসি দারুণ চমকে গিয়েছিলাম। উত্তর প্রদেশের বদাউন শহর থেকে এমন কি আগ্রা থেকেও একেবারে আলাদা চরিত্রের মানুষজন।

কেমন আলাদা? নভেরা তাকায় তার দিকে।

খুব খোলামেলা, কোনো ইনহিবিশন নেই। প্রুডারি নেই, সুবারি আছে যদিও। মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক রক্ষণশীলতার বিধিনিষেধে মুখ থুবড়ে নেই। নারীর আলাদা সত্তা আছে এই শহরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদাউনে আর আগ্রায় সমাজ বুঝি খুব রক্ষণশীল ছিল? নভেরা হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

রক্ষণশীল বলতে রক্ষণশীল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটা ছিল, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেও ঐ শ্রেণীর নর-নারী ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ছিল মেয়েদের জীবন। শিক্ষিত পরিবারেও মেয়েদের ভূমিকা ছিল সন্তানের মা হওয়া এবং সংসারের দায়িত্ব পালন। বুঝলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসত ঐ পরিবেশে। বম্বে ওয়াজ ডিফারেন্ট। হার পিপল ওয়্যার ডিফারেন্ট। আমার নবজন্ম হলো এই শহরে এসে।

কয়েক দিন লাইব্রেরিতে বসে বইপত্র ঘাঁটল নভেরা। ইসমতের বিখ্যাত উপন্যাস 'তেরি লাকির' যখন পড়ে শেষ করল তখন ইসমতের কথাগুলি আবার মনে পড়ল তার। ১৯৪৩ সালে লেখা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'শামোন' যেন ইসমত নিজেই। আলীগড়ের সমাজের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তার সঙ্গে মিল রয়েছে ভিক্টোরিয়ান পর্বের ইংল্যান্ডের। একই হঠকারিতা, অবৈধ প্রেম, যৌন শোষণের শিকার নারীর জীবন, এইসব। কিন্তু সবচেয়ে যা বেশি চমকে দেয়, তা হলো সমকামী সম্পর্কের খোলামেলা আলোচনা। ১৯৬২ সালে পড়তে পড়তে ১৯৪৩ সালের পটভূমিতে চরিত্রগুলির এই মনোবৈকল্য তাকে স্তম্ভিত করে দেয়। ইসমত যেন বলতে চান যে এর উৎস সমাজে নর-নারীর অধিকার দূরত্ব, পর্দার আড়াল, এই সবের মধ্যে। রিপ্রেসড ফিলিং-এর বিকৃত অভিব্যক্তি নিয়ে চরিত্রগুলি দারুণ ট্রাজিক।

ইসমতকে বিষয়টি উল্লেখ করতেই তিনি বললেন, উপন্যাসটি খুব সাড়া জাগিয়েছিল, বিতর্কিত হয়েছিল। বলতে গেলে ঐ প্রথম উপন্যাস নিয়েই আমি জনপ্রিয় হয়ে যাই। একজন মুসলমান তরুণী অমন খোলামেলাভাবে নারীর যৌনানুভূতি এবং নিপীড়নের মধ্যে তৃপ্তির সন্ধান সম্বন্ধে লিখবে এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে পাঠকের কাছে। উর্দু সাহিত্যে উপন্যাসটি একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হয়ে গিয়েছিল।

আপনার অন্য উপন্যাসগুলি কি একইভাবে সাড়া জাগিয়েছিল?

না। মাসুমা, সওদাই, দিল কি দুনিয়া, জিদ্দি, এইসব উপন্যাস জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু বিতর্কের ঝড় তোলেনি।

রক্ষণশীল সমাজ তার বশ্যতা স্বীকারে আপনাকে বাধ্য করেছে? নভেরার স্বরে কৌতুক।

না, না। তা নয়। আমি পুনরাবৃত্তি করি নি। একই থিম নিয়ে লেখা আমার স্বভাবে নেই। তবে হ্যা, 'গরম হাওয়া' নামে আমি যে ফিল্ম স্ক্রিপ্ট লিখি তার ওপরে ভিত্তি করে তৈরি সিনেমাটি খুব সাড়া তুলেছিল।

কেন?

সিনেমার বিষয়বস্তু ছিল দেশ-বিভাগ। আমি খুব সমালোচনা করেছিলাম কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের দেশ বিভাগের রাজনীতিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার রাজনীতিতেও আগ্রহ আছে দেখছি।

ইসমত একটু চুপ করে থেকে বললেন, প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকেরই রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। আর্ট ফর আর্টস সেক-এর মতো বস্তাপচা কথার মানে হয় না। আর্ট ফর লাইফ্স সেক। জীবনের কথা বলতে গেলে রাজনীতি এসেই যায়। যায় না?

নভেরা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর সায় দিয়ে মাথা নাড়ে।

লাইব্রেরিতে ইসমতের ছোটগল্প সংকলন পাওয়া গেল কয়েকটা। এক বাত (১৯৪২), ছোটে (১৯৪২), কল্যাণ (১৯৪৫) ও দো হাত (১৯৫৫)। গল্পগুলিতে নারী চরিত্রই প্রধান। বুঝতে কষ্ট হয় না যে নারীসত্তা, নারীমুক্তি, নারীর সমান অধিকার এইসব বিষয়ই তাঁর কাহিনীর প্রতিপাদ্য। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কথা মনে পড়ল তার। তিনি বলেছিলেন, ইসমত তাঁর ছোটগল্পের জন্যই ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সাদাত হাসান মান্টোর মতো ইসমতও শুদ্ধ প্রেম-কাহিনী আর কল্পনার জগতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিখাদ বাস্তবতাকে উপজীব্য করেছে তাঁর লেখায়। সাদাতের চেয়েও আরো জোরালোভাবে ইসমত ভারতবর্ষের নারীকে পরিচয়হীন অস্তিত্ব থেকে শিক্ষার স্বাধীনতায় অভিষিক্ত করে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। চল্লিশ আর পঞ্চাশ দশকে অমন প্রবলভাবে নারীবাদী হয়ে ইসমত অসম্ভব সাধন করেছে। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ফয়েজ ভাইয়ের এইসব কথা তার মনে পড়ে গেল।

AMARBOI.COM

বৈজয়ন্তীমালা আপত্তি জানিয়ে প্রবলভাবে মাথা নাড়লেন। শাহিদ লতিফকে বললেন, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে? আমি নাচ শেখাবো?

শাহিদ লতিফ হেসে বললেন, কেন শেখাবে না? ইউ আর এ গ্রেট টিচার।

এককালে ছিলাম। এখন সময় আছে? সেই মুড আছে? তাছাড়া লোকে শুনলে বলবে কি? বৈজয়ন্তীমালা নাচ শেখাচ্ছে। ছি ছি ছি।

ছি ছি করো না। নাচ শেখানো নোংরা কাজ নয়। নাচ তো নয়ই। একথা আমার চেয়ে তুমি যদি ভালো না বোঝো, কে বুঝবে।

হবে না। সাফ কথা। সময় নেই। অন্য কোনো কারণের কথা বললাম না আর। সময় নেই। বুঝেছেন ডিরেক্টর সাহাব।

শাহিদ লতিফ গম্ভীর মুখে বললেন, মেয়েটার কথা ভাবো। এত দূর থেকে এসেছে। পাকিস্তান থেকে। ভাববে পাকিস্তানি বলে পাত্তা দিলে না।

ভাবুকগে।

না, না। বুঝতে পারছ না। সেও একজন আর্টিস্ট। স্কাল্পচার করে। আর্টিস্টরা দারুণ অভিমানী হয় জানো তো। আঘাত পেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

এ্যাঁ। চমকে ওঠে বৈজয়ন্তীমালা। কেয়া কাহা? সুইসাইড। মাই গড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যা। সুইসাইডও করে ফেলতে পারে। দারুণ চাপা স্বভাবের মেয়ে। আত্মাভিমানী। এই কদিনেই টের পেয়েছি।

বৈজয়ন্তীমালা চুপ করে থাকে, তারপর বলে, বেশ নিয়ে আসুন। কথা বলে দেখি। বেশি সময় দিতে পারব না কিন্তু।

দরকার নেই। একদিন শেখানোর পর যদি বন্ধ করে দাও কিছু বলব না আমি। একদিন তোমাকে দিয়ে তাকে নাচ শেখাতে পারলেই আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছি মনে করব।

বৈজয়ন্তীমালা ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে, আপনারা ডাইরেক্টর সাহেবরা, দারুণ চরিত্র। রাজি করিয়েই ছাড়েন।

শাহিদ লতিফ উঠে দাঁড়ান, হাসতে হাসতে বলেন, ইসমতকে বলব। সে তোমার সঙ্গে একমত হবে কিনা জানি না।

বৈজয়ন্তীমালা কপট ক্রোধের সঙ্গে বলে, ভাগিয়ে।

বসবার ঘরটা বেশ শাদামাটা, বাহুল্যহীন। কার্পেট নেই। রঙিন একটা সতরঞ্চ, দররী জাতীয়। বেতের সোফাসেট, সেন্টার টেবিল, সাইড টেবিল নকশা করা কাঠের, তার ওপর নানা আকারের পুতুল, কোনোটা নটের ভঙ্গিতে। দেয়ালে মস্ত বড় বড় মন্দিরের ছবি, রঙিন, সবগুলির সামনেই বৈজয়ন্তীমালা দাঁড়িয়ে, ঝলমলে রঙিন শাড়ি পরে। একটা ছবিতে অনেক কারুকাজ তার চারদিকে, উড়ছেও কয়েকটা।

লালপেড়ে সবুজ সিল্কের শাড়ি পরে বৈজয়ন্তীমালা ঘরে ঢুকলেন। পিঠময় চুল ছড়ানো, কপালে মস্ত বড় টিপ, চোখের নিচে কাজল, ভ্রূ বাড়িয়ে দেওয়া একপাশে। ফর্সা মুখে স্মিত হাসি। সোফায় বসেই বললেন, আগে নাচ শিখেছ?

হ্যা।

কার কাছে?

সাধনা বোস। কলকাতায়।

আরে বাপ, তারপর আমার কাছে শিখতে আসা কেন? তিনি তো আমারও ওস্তাদ। বৈজয়ন্তীমালা চোখ কপালে তুলল।

নভেরা তাড়াতাড়ি বলল, বেশি দিন শিখতে পারি নি। তা ছাড়া যে নাচ আপনার কাছে শিখতে চাই, সেটা তাঁর খুব জানা ছিল না।

কোন্ নাচ?

কথাকলি।

আরে ব্বাপ্। ভীষণ কঠিন। অনভ্যাসে এতদিনে আমি ভুলে গিয়েছি। তোমাকে শেখাবো কি করে?

যা মনে আছে আপনার তাতেই হবে।

হুঁ। খুব মুশকিলে ফেলেছ। তারপর একটু থেমে বৈজয়ন্তীমালা বলল, কী করবে নাচ শিখে? তোমাদের পাকিস্তানে তো শুনি নাচগান খুব সুনজরে দেখা হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম পাকিস্তানে হয় না কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে নাচ-গানের চর্চা আছে। চট্টগ্রামে এক ফাংশনে আমি নেচেছি।

হুঁ। বৈজয়ন্তীমালা ঠোঁটে কামড় দিয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ, যেন ভাবছে কিছু। তারপর উঠে গিয়ে ভেতর থেকে কয়েকটা বই নিয়ে এল। নভেরার হাতে দিয়ে বলল, পড়ো এগুলো। কথাকলি নাচের ওপর। তিনদিন পর বিকেলে চারটায় এসো। আমি আধঘণ্টা সময় দেবো। এইভাবে এক সপ্তাহ। তার বেশি সময় দিতে পারব না।

নভেরা বইগুলো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাতেই হবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

দরজার কাছে এসে বৈজয়ন্তীমালা বলল, একটা কথা। আমার কাছে নাচ শিখছ কাউকে বলবে না সে কথা।

বেশ তাই হবে। নভেরা হেসে বিদায় নিল। তার ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল।

বই পড়ে কথাকলির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যা জানা গেল তা সংক্ষেপে এই : কথাকলি নাচ সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, আলেখ্য, ভাস্কর্য এইসব নিয়ে হাজার বছর ধরে ক্রমবিকাশের ধারায় রূপ নিয়েছে। প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির আরাধনা আর পূজায় এর সূচনা। আধ্যাত্মিক ভক্তিমূলক নাচের সঙ্গে সামাজিক এবং যুদ্ধ-বিগ্রহকেন্দ্রিক বলিষ্ঠ নাচও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর্য জাতির আগমনের সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, এইসব পৌরাণিক গ্রন্থগুলি এবং সংস্কৃত ভাষা প্রচারের পাশাপাশি সমাজে জাতের বা বর্ণের শ্রেণীগত বিভাজনও শুরু হলো। এই সময়ে 'কুনি আট্টম' নামে সংস্কৃত শ্লোকসমৃদ্ধ একটি নৃত্যধারার সৃষ্টি হয়, যেখানে নৃত্যশিল্পী নিজেই শ্লোক আবৃত্তি করে প্রতি একটি মাত্র শ্লোকের পরই শুধু একটি বাজনার সঙ্গে একই চরিত্রে নাচের সঙ্গে অভিনয় করে। এই নাচ শুধু মন্দির প্রাঙ্গণের নাট্যশালাতেই অভিনীত হতো। মুদ্রাভিনয়, মুখাভিনয় এবং রূপসজ্জা সমন্বিত কুটি আট্টমকেই কথাকলির পূর্বসূরি বলা হয়। ১৫০০ সাল পর্যন্ত কথাকলির অগ্রযাত্রায় সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে মালয়ালম ভাষা এবং ব্রাহ্মণ গোত্রীয় নর-নারী ছাড়াও অন্যান্য বর্ণের লোকও অংশগ্রহণ করে। এই সময়ই দেব-দাসীদের জন্য মোহিনী আট্টম নাচ প্রচার পেতে শুরু করে। যখন বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রদেশের জয়দেবের গীত গোবিন্দ চৈতন্য মহাপ্রভু দ্বারা কেরালাতে পৌঁছে গেল, তখন 'অষ্টপদী আট্টম' নামে প্রথম গানসমৃদ্ধ নৃত্যনাট্য শুরু হলো। এই নৃত্যভঙ্গি ছিল কুটি আট্টমের চেয়ে কিছুটা হালকা এবং সরল। ১৬৫৩ সালে কোররিক্কোড রাজ্যের রাজা মানবেদ সামতিরি 'কৃষ্ণনাট্টম' নামে কৃষ্ণনীতির যে নাট্যরূপ সৃষ্টি করেন, তার ফলে কথাকলি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেও কৃষ্ণরীতির গান কেবল সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত এবং মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতো বলে এই নাচ সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ছিল না। এই সব মনে রেখেই ১৬৬১ সালে সর্বসাধারণের জন্য মালয়ালম ভাষায় 'রামনাট্টম' নৃত্যনাট্য শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় যেখানে সকল বর্ণের শিল্পীরাই অংশগ্রহণ করতে পারত। রামনাট্টমে নৃত্যশিল্পী অল্প মুদ্রাভিনয়সহ নিজেই গান করত। ১৭০০ শতাব্দীর শেষাংশে উত্তর কেরালার রাজা মহাভারত অবলম্বনে চারটি আট্টকথা (নৃত্য-সাহিত্য) রচনা করেন এবং অভিনয়াংশে রামনাট্টম থেকেও অনেক উন্নতি ঘটান। তখন থেকেই রামনাট্টম 'কথাকলি' নামে খ্যাতি অর্জন করে। ক্রমে কথাকলি নাচে যেসব পরিবর্তন আসে, তার মধ্যে কৃষ্ণনাট্যমের মতো অধিকাংশ চরিত্রেই মুখোশের ব্যবহার না করে বিভিন্ন চরিত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের মুখসজ্জা এবং সাধারণ মুকুট পরে কথাকলির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। এই শতাব্দীর প্রথম থেকে রাজা এবং জমিদারদের অবস্থার অবনতি হতে শুরু করলে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কথাকলির প্রচার কমতে থাকে। ১৯৩০ সালে মহাকবি ওথাল্লোত্তোল নারায়ণ মেনন 'কেরালা কলা মত্তলম' প্রতিষ্ঠা করে প্রাচীন এই নৃত্য ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসেন। ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথাকলি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানবার জন্য শান্তিদেব ঘোষকে শান্তি নিকেতন থেকে কেরালায় পাঠান। দেশী-বিদেশী সংস্কৃতিসেবী এবং পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় কথাকলি পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। 'কলামত্তলম' ১৯৬৩ সাল থেকে 'কেরালা স্টেট আকাদেমি অব আর্টস'-এর মর্যাদা পেয়ে আসছে।

বারান্দাটা পরিষ্কার করা হয়েছে, আসবাবপত্র একপাশে সরিয়ে নেয়ার ফলে অনেকটা জায়গা এখন খালি। উজ্জ্বল সবুজ শাড়ি পরে, কাজলের দাগ দিয়ে দুচোখ বড় করে এঁকে এবং প্রসাধনের আরো বৈচিত্র্য বর্ণ মুখে নভেরা দুহাত উপরে তুলে, পা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে।

বৈজয়ন্তীমালা পাশে থেকে তাকে দেখে বলল, হলো না, হলো না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক আছে, কিন্তু উপাঙ্গ ঠিক মতো আনতে পারছ না। চোখ, কান, নাক, আঙুল, ঠোঁট, এইসব উপাঙ্গের ব্যবহারেই কথাকলির 'বিশেষত্ব'। 'হস্ত লক্ষণ দীপিকা' বইটা ভালো করে পড়ো নি বুঝি?

নভেরা মাথা নেড়ে জানালো সে পড়েছে।

বৈজয়ন্তীমালা বলল, তাহলে ভুল হচ্ছে কেন? মুদ্রা প্রয়োগ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা তৈরি করতে হবে। এখন আমরা অঞ্জলি মুদ্রা ব্যবহার করব। কেমন? 'হস্ত লক্ষণ দীপিকা' বইটিতে এ বিষয়ে যা পড়েছো তা মনে করো। দুই হাতের শব্দ ১৫টি। প্রবল দৃষ্টি, বমি করা, আগুন, ঘোড়া, গর্জন, শোভা, কেশ, কানের দুল, তাপ, গোলমাল, নদী, স্নান করা, স্রোত, রক্ত। এই সবের পর সংযুক্তাঞ্জলি নামাতে হবে, এক হাতের ২টি শব্দ তুলবে তখন। এরপরেই আমরা যাবো অর্ধচন্দ্রমে।

নভেরা হাত দুটি সংযুক্ত করে ওপরের দিকে তাকিয়ে এক পা তুলছে, অন্য পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াচ্ছে, স্থির হয়ে থাকছে, ঘুঙুরের শব্দ তুলছে, চোখের ভ্রূ কাঁপাচ্ছে প্রজাপতির পাখার মতো। বৈজয়ন্তীমালা নিবিষ্ট চোখে দেখছে তাকে, নিচু স্বরে তাল দিয়ে বলছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

+ ০ ০ + ০
কিটাতাকি তা হা তেই য়া তা তোকু তাকা
। । । +
তা ধিং কিনা (তোম)।

তারপর একটু থেমে বলল, হ্যা, বেশ হচ্ছে, থেমো না, করতে থাকো।
+ ০ ।। + ০। । + ০
তৎ তোম তাকা তোয় ধিমি তাকা তা হা
। । + ০ । । +
তৈয়া যা তা তোকু তাকা তাধিং কিনা (তোম)।

অনেকক্ষণ নেচে নভেরা ক্লান্ত দেহে চেয়ারে এসে বসল। বৈজয়ন্তীমালা হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আরে দুঘণ্টা হয়ে গিয়েছে দেখছি। টেরই পাই নি। টায়ার্ড হয়ে গিয়েছ?

নভেরা হাসি মুখে বলল, না। খুব ভালো লাগছে। শরীর খুব হালকা মনে হচ্ছে।

বৈজয়ন্তীমালা হেসে বলল, এক সপ্তাহেই স্লিম হয়ে যাবে। খুব হালকা মনে হবে তখন।

কয়েকদিন পর নভেরা গম্ভীর মুখে বলল, আমার ভয় হচ্ছে।

কীসের ভয়? বৈজয়ন্তীমালা মুখ তুলে তাকালো তার দিকে। নভেরা বলল, মনে হচ্ছে কোনো অঘটন ঘটবে। দুর্ঘটনার মতো কিছু।

বৈজয়ন্তীমালা অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কি যাতা বলছ। অঘটন ঘটতে যাবে কেন? আর যদি ঘটেই যায় তাহলে আগে থেকে কেউ কি বলতে পারে?

নভেরা বলল, আমি পারি। অশুভ, অমঙ্গলের ছায়া আমি আগে থেকেই দেখতে পাই।

আজব ব্যাপার। তুমি কি? পাগলের মতো কথা বলো না তো আমার এখন ঠাট্টার সময় নেই।

আমি ঠিকই বলছি। বিপদের আগেই ভেতর থেকে আমাকে কেউ সাবধান করে দেয়। রেঙ্গুনে এমন হয়েছিল। নভেরার স্বরে চাপা আতঙ্ক।

ওঠো, নাচ শুরু করো। বিপদ এলে দেখা যাবে।

দুদিন পর নাচতে নাচতেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। নিজের পায়ে লেগেই মেঝেতে পড়ে গেল নভেরা, উঠতে গিয়েও দাঁড়াতে পারল না। তার ডান পা মচকে গিয়েছে। যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে এল, অস্ফুট যন্ত্রণা বেরুলো মুখ থেকে।

বৈজয়ন্তীমালা ত্রস্তে ছুটে এল। দুহাত দিয়ে টেনে তুলল তাকে। কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নভেরা বলল, বলেছিলাম না দুর্ঘটনা ঘটবে। দেখলেন তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈজয়ন্তীমালা তার দিকে অবিশ্বাস এবং চাপা ভয়ের সঙ্গে তাকিয়ে থাকল। যেন নতুন করে দেখছে তাকে।

নভেরা ব্যান্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে বিছানায় শুয়ে। পাশে ইসমত আর শাহিদ লতিফ।

ইসমত সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললেন, এক্সরে রিপোর্টে সাংঘাতিক কিছু হয়েছে বলে দেখা যায় নি। ঠিক হয়ে যাবে। অর্ডিনারি ফ্র্যাকচার।

শাহিদ লতিফ বললেন, কদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে আর কি।

নভেরা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি লাহোরে ফিরে যাবো। এস. এম আলীকে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে একটা। ফয়েজ ভাইকেও জানাতে হবে।

ইসমত বললেন, এখুনি ফিরতে হবে কেন? সুস্থ হয়ে নাও, নাচ শেখা তো মাত্র শুরু হলো।

নভেরা আস্তে আস্তে বলল, ভেতর থেকে কেউ বলছে আমার ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

ইসমত এবার জোর গলায় বললেন, রাখো তোমার এক্সট্রা সেনসারি পারসেপশন। একটা কয়েনসিডেন্স বৈ আর কিছু নয়। তা ছাড়া যা হওয়ার সেতো হয়েই গিয়েছে।

নভেরা হাসি মুখে বলল, সে জন্যে না। আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

শাহিদ লতিফ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, নভেরাকে দেখেই বুঝেছি ও বনের পাখি। খাঁচায় থাকবে না। আসবে, যাবে নিজের ইচ্ছে মতো। কেমন, ঠিক বলেছি না?

নভেরা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন সে কিছুই শুনতে পায় নি।

AMARBOI.COM

তাঁর বিকেল পাঁচটায় আসার কথা, তার ঠিক আগে সেন্টুকে জানালেন যে আসতে কিছু দেরি হবে, ব্যাংকের ক্যাশ বন্ধ করে একেবারে আসবেন। সেন্টু বলল, ভদ্রমহিলা চকবাজার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার।

হিল ভিউ ক্লিনিকে তিনি সাড়ে পাঁচটায় এলেন, বেশ ব্যস্তসমস্ত হয়ে। দেখেই চিনলাম, আগেও দেখেছি এই চট্টগ্রামে, শুধু নাম শুনে চেনা যায় নি। সামনের সোফায় ঝুপ করে বসে মুখ নিচে রেখে মাথাটা কয়েকবার নেড়ে বললেন, আপনাকে চিনি। চট্টগ্রামে ছিলেন না? তারপর তেমনি মাথা নিচু রেখে বললেন, তালেয়া বলেছে না, আপনি আসছেন না। নভেরার কথা শুনতে চান না।

বুঝলাম ভদ্রমহিলা 'না' কথাটি এমনি ব্যবহার করেন, অথবা কথার শেষে জোর দেবার জন্য। তার কথাবার্তায় বয়সের ছাপ নেই, এখনো তরুণীর প্রগল্‌ভতা। সেন্টু একবার ঘরে এসে চা খেতে বলে চলে গেল।

তিনি বলতে থাকলেন, তালেয়া আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। আমরা এক সঙ্গে খাস্তগীর স্কুল হোস্টেলে ছিলাম। ওর বাবা যখন করাচি বদলি হয়ে গেল তখন থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাস্তগীর হোস্টেলে, যতদিন চট্টগ্রামে ওর বাবা ছিলেন তখন আমি ছুটিতে ওদের বাড়িতেই থাকতাম। গ্রামের বাড়ি যেতে ভালো লাগত না।

খাস্তগীর স্কুল হোস্টেলে থাকতেন, কখন হবে সেটা? ১৯৪৭? না ১৯৪৮? হ্যা ঐ সময়ে একদিন বিকেলে দেখি পাশের রাস্তায় ছাতা ঘোরাতে ঘোরাতে একটা সুন্দরী মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। জানালার কাছে মুখ রেখে অবাক চোখে দেখলাম, দুএকজন বান্ধবীকে তাড়াতাড়ি ডেকে দেখালাম।

হাসনাত বলল, কেন দেখাবার কি ছিল?

লুৎফুন বললেন, বারে চট্টগ্রামে ঐ সময়ে একটা বড় মেয়ে ঐভাবে একা ছাতা ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এটা ভাবা যেত? খুব গোঁড়া সমাজ ছিলাম না আমরা? সেদিনের পর আরো কয়েকদিন তাকে হেঁটে যেতে দেখেছি। শুনলাম, নাম 'নভেরা'। কলকাতা থেকে এসেছে। খুব স্মার্ট মেয়ে, সবার সঙ্গে মেলামেশা করে, ঘোরে সব জায়গায়, কোনো সংকোচ নেই। একদিন নভেরা আমাদের হোস্টেলে এলেন, আমারই রুমমেটের খোঁজে। আমরা তখন বাগানে বসে গান করছি। তিনি এসে বসে বসে শুনলেন। তারপর আমার রুমমেটের সঙ্গে কথা বললেন। রুমমেট বললেন, তিনি নাচ শেখাতে চান মেয়েদের। আমাদের কেউ আগ্রহী কিনা জানতে চেয়েছেন। শুনে আমরা ভয়ে কুঁকরে গেলাম। চট্টগ্রামে সেই ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে কোনো বাঙালি মুসলমান মেয়ে নাচত না, নাচার কথা মুখেও আনা যেত না। স্কুলের টিচাররা যদি শোনেন বের করে দেবেন। আমরা কেউ সাড়া দিলাম না। নভেরা আরো কদিন এলেন। বসে বসে গল্প করলেন আমাদের সঙ্গে। তার সাজ-সজ্জা, কথাবার্তা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। খুব আধুনিক আর বেপরোয়া ভাব। মেয়ে বলে গুঁটিসুঁটি মেরে থাকতে হবে, ঢেকেঢুকে রাখতে হবে নিজেকে, তেমন কিছু যেন তার চিন্তার বাইরে। হোস্টেলের গণ্ডিতে থেকে অভ্যস্ত আমরা তার সঙ্গে কথা বলে এক নতুন জগতের খোঁজ পেলাম। খুব ভালো লাগত যখন তিনি আসতেন হোস্টেলে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম প্রতিদিন বিকেলে। তিনি অবশ্য রোজ আসতেন না। যেদিন আসতেন না সেদিন মন বেশ খারাপ হয়ে যেত।

হাসনাত বলল, আপনি কি পরে নভেরার মাধ্যমেই আপনার স্বামীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন?

লুৎফুন হেসে বললেন, না। নভেরা লন্ডনে চলে যাবার পর ১৯৫১ কি ১৯৫২ সালে সেন্ট প্লাসিডে এক ডিবেটে নভেরার ছোট ভাই শাহরিয়ারকে দেখি। তুখোড় ডিবেট করল। তাই শুনে আমি বান্ধবীদের বললাম, না, ওকেই বিয়ে করব। ওটা ঠাট্টা ছিল। কিন্তু কি কপাল, শাহরিয়ারের সঙ্গেই পরে বিয়ে হয়ে গেল। নভেরা অবশ্য জানতে পারে নি খাস্তগীরের সেই মেয়েটির সঙ্গেই তার ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে।

বিয়ের পর শুনেছি তিন বোনের মধ্যে নভেরা ছিল সবচেয়ে বেশি ডানপিটে, চঞ্চল। বাইরে ঘোরাঘুরি খুব পছন্দ ছিল তার। প্রাকৃতিক দৃশ্য পছন্দ করত। মিশুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল কিন্তু কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিত না, পছন্দ না হলে পাত্তা দিত না। স্কুলে পড়তেই কলকাতা থেকে মায়ের গহনা বিক্রি করে চলে এসেছিল চট্টগ্রামে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে। এখানে এসে আত্মীয়স্বজন খুঁজে চলে গিয়েছিল বাঁশখালী তার বাবার গ্রামের বাড়ি। সারা গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। কখনো গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ে, কখনো নৌকা নিয়ে বেরিয়ে যায়, সারা দুপুর পুকুরে দাপাদাপি করে গোসল করে। এমন কাণ্ড কেউ দেখে নি, কেউ শোনে নি গ্রামে। নভেরা আর তার বন্ধুরা বাঁশখালী ছিল প্রায় মাসখানেক, তারপর আনোয়ারায় তার মায়ের গ্রাম তৈলের দ্বীপ হয়ে চলে আসে। শাহরিয়ার বলত প্রায়ই এই গল্প। ওরা তিন ভাই, কেউ তখন গ্রামে যাবার কথা ভাবে নি। কলকাতার আকর্ষণ ছেড়ে অজ পাড়াগাঁয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয় কি কারো।

নভেরার ডাক নাম রানু, কিন্তু সব ভাই-বোন ডাকত ডার্লিং বলে। ওরা নিজেদের একটা করে নাম দিয়েছিল। মেজ বোন শরিফার নাম দিয়েছিল পিয়ারী, বড় বোন কুমুম হকের নাম ছিল সুইটি। বোনেরা নিজেদের দেওয়া নামেই ডাকত। নভেরাকে মা-বাবা রানু বলে ডাকলেও বোনদের কাছে সে ছিল ডার্লিং। কাজিনদের কাছেও। শুধু ছোট বোন তাজিয়ার নামটাই ছিল মা-বাবার দেওয়া, টুকু।

নভেরা প্রাকৃতিক দৃশ্য ভালবাসত, গ্রামের মানুষ পছন্দ করত, শুনেছি চলে আসার সময় বাঁশখালী গ্রামের শুধু আত্মীয়স্বজন না, বাইরের লোকও মন খারাপ করেছিল, কেউ কেউ কেঁদেছিল। মানুষকে আপন করার একটা ক্ষমতা ছিল। খুব কাছে ঘেঁষত না, আবার দূরেও ঠেলে দিত না। এটা ছিল সবার সম্পর্কে। আর যাদের পছন্দ করত তাদের সঙ্গে খুব সহজ হয়ে মিশত।

বিয়ে? হ্যা শুনেছি কুমিল্লায় যখন ওর বাবা বদলি হয়ে যায় তখন সেখানে এক অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হয়। তার বোধহয় ইচ্ছা ছিল না। শুনেছি বিয়ের আসর থেকেই উঠে চলে আসে। পরে তার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে তাদের বাড়িতে, সেই বিলেত থেকে ফেরার পর। কিন্তু বিয়ে নিয়ে কোনো আলাপ হয় নি।

নভেরার বাবা রিটায়ার করে চট্টগ্রাম চলে আসেন ১৯৫০-এর দিকে। আশকার দিঘিতে জামাই শফিকুল হকের সরকারি বাড়ি 'গডস্ গিফট'-এ থাকলেন কিছুদিন। তারপর পাশেই তৈরি করেছিলেন নিজের জন্য একটা বাড়ি, পথের পাশেই, এখনো আছে। জামাইয়ের ডিজাইন, আমি পরে বউ হয়ে গিয়ে দেখে শাহরিয়ারকে বলেছিলাম, পচা ডিজাইন। আর কাউকে পেলেন না। বুঝলেন না, তখন তো আর্কিটেক্ট ছিল না।

কুমিল্লা থেকে এসে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হয়েছিল নভেরা। তখন সে আয়াদের মতো কটন শাড়ি পরত। বড় বড় পাড় থাকত সেসব শাড়িতে। চুল থাকত কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো, বব করা। খুব বিলাস-ব্যসন না, কিন্তু নিজেকে নিজের রুচি অনুযায়ী সাজিয়ে রাখত। মুখের খুব যত্ন নিত। তাকে মেক-আপ ছাড়া দেখি নি। যাক সে কথা। হ্যা, কলেজ, কলেজ পছন্দ হয় নি নভেরার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলেজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে থাকল নভেরা। মা এসে বললেন, কি রে এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?

নভেরা কিছু বলল না। হাতের নখে নেইল পলিশ দিতে থাকল মনোযোগের সঙ্গে। মা বললেন, শরীর খারাপ?

নভেরা মাথা নিচু করে নখ মুছতে মুছতে বলল, না।

তাহলে? মা তাকালেন।

আমি আর কলেজে যাবো না। বাজে জাগা, ছেলেরা বাজে। নোংরা কথা বলে। খুব জ্বালায়।

মা একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, কিন্তু পড়াশোনা না করলে কি করে হবে? সব মেয়ে পড়ছে, তুই ঘরে বসে থাকবি? বিয়ে করেও তো সংসার করলি না।

নভেরা গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর শুকনো গলায় বলল, মা, তুমি বিয়ের কথা আর তুলবে না আমার সামনে। আই ডোন্ট লাইক ইট। আমার প্রাইভেট লাইফে কেউ ইন্টারফেয়ার করুক এটা আমি পছন্দ করি না।

মা হেসে বললেন, পাগলি, সে তো জানিই। কিন্তু আমি যে মা, যে কেউ না। আমাকে তোর সবকিছু নিয়ে ভাবতে হয়। সব ছেলেমেয়েদের জন্য ভাবতে হয়।

প্লিজ ডোন্ট। ভেবো না। আমি এখন খুকিটি নই।

তুই আমার কাছে সব সময়ই খুকি থাকবি, যত বড়ই হোস্। রাগ করে বললেই হলো।

বলতে বলতে তিনি নভেরার কাছে গেলেন। তার কাঁধে হাত রেখে চুলগুলো ছড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, তোকে নিয়ে আমার বরাবরই চিন্তা, দুশ্চিন্তা না। কিন্তু বেশ চিন্তা।

নভেরা মুখ উঁচু করে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন? চিন্তা কেন?

তুই যে আলাদা। তোর মধ্যে একটা ভাবুক মন আছে। হাসছিস, খেলছিস, হৈ-চৈ করছিস, কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাস। একটা কিছু ভাবতে থাকিস। আমি সব টের পাই। তোর বাইরের ছটফটানি কিছুই না তোর মনের অস্থিরতার কাছে।

নভেরা মায়ের হাত তুলে নেয়। হাতের ভেতর মুখ লুকোয়। খুব জোরে জোরে ঘ্রাণ নেয়। তারপর বলে, মা, তোমার হাতে সুন্দর গন্ধ।

সুন্দর গন্ধ কোথায় পেলি আবার। আমি তো কোনো সেন্ট মাখি নি। লোশনও ব্যবহার করি নি।

নভেরা মায়ের হাত শুঁকতে শুঁকতে বলল, আমি পাচ্ছি। সুন্দর গন্ধ।

মা তার মাথায় হাত রেখে বললেন, পাগলী। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কলেজে সত্যি যাবি না? তাহলে কি করবি?

নভেরা বলল, মূর্তি তৈরি করব।

মূর্তি? কীসের মূর্তি? মা অবাক হয়ে তাকালেন তার দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের মূর্তি, মাথা, বুক পর্যন্ত, আবার পুরো শরীর। স্কাল্পচার। মা আমি ভাস্কর হতে চাই।

মা চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, মুসলমানরা এসব করে না। তা ছাড়া তুই মেয়ে।

ছি মা। তুমি এমন বলতে পারো না। তুমি পুতুল বানাও নি মাটি দিয়ে, টিন কেটে কাপড় জুড়ে?

হ্যা, বানিয়েছি। সে তো শখ করে অবসর কাটানোর জন্য।

ধরো আমিও তাই করব। শখ করে। তফাৎটা হবে তুমি বানাতে ছোট পুতুল ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। আমি তৈরি করব বড় বড় মূর্তি, ছোট বড় সবার জন্য।

মা চুপ করে থাকলেন। নভেরাকে দেখলেন। বুঝলেন মেয়ে সিরিয়াস হয়েই বলছে।

তিনি বললেন, শখ তো লেখাপড়ার বিকল্প হতে পারে না। এই শখের জন্য লেখাপড়া ছাড়া কেন?

নভেরা বলল, আমি স্কাল্পচার নিয়ে পড়াশোনা করব। এটাও একটা শিক্ষার বিষয়।

মা বললেন, কোথায় পড়বি? এখানে আছে তেমন সুবিধা?

এখানে কেন? লন্ডনে যাবো, প্যারিসে যাবো।

মা বললেন, টাকা, টাকা দেবে কে?

নভেরা নখে পলিশ লাগাতে লাগাতে বলল, কেন বাবা দেবে।

রিটায়ার্ড করেছে। এত টাকা পাবে কোথায়? মার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি।

নভেরা বলল, কষ্ট হবে জানি। কিন্তু আব্বা তো আমার অনেক আবদার রেখেছেন। এটাও রাখবেন।

মা বললেন, কি জানি। আচ্ছা তোর বাবাকে বলে দেখি তিনি কি বলেন। আমার মাথায় এখন কিছু ঢুকছে না।

নভেরা এখন আর কলেজে যায় না। মস্ত বড় বড় কাঠের টুকরো এনে জড়ো করেছে তার ঘরে। হাতুড়ি, বাটাল, ছুরি এই সব টেবিলে ভর্তি। সকাল থেকে তার কাজ শুরু হয়। সারা বাড়ির লোক শোনে ঠুক-ঠুক শব্দ। মা এসে দেখেন কখনো কখনো। বাবাও আসেন। যারা আড্ডা দিতে আসত আগে তারা এসে কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যায়। নভেরা তাদের সঙ্গে গল্প করে, তবে আগের মতো অত সময় দিতে পারে না। কাঠের মানুষগুলোর ওপর এখন তার সব মনোযোগ।

একটা মানুষের মাথা, খুব বড়, কুঁদে কুঁদে বার হলো গাছের গুঁড়ি থেকে। সেগুন কাঠ, বেশ শক্ত। বাটালি দিয়ে কষ্ট করে কুঁদে নিতে হচ্ছে। রাশেদ নিজাম, নভেরার কাজিন, প্রায়ই এসে বসে বসে দেখে। কখনো বলে, নভেরা আপা, এটা বড় কেন? কখনো বলে, নাক চ্যাপ্টা কেন? নভেরা কখনো কিছু বলে না যেন তার উপস্থিতিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখে পড়ে নি। আবার কখনো বলে, বিরক্ত করো না। তাহলে স্টুডিওতে ঢুকতে দেবো না। মুখে মৃদু হাসি থেকে বোঝা যায় এটা তার রাগের কথা না।

একদিন কাঠের ভেতর মানুষের মুখটা সম্পূর্ণ হলো। চ্যাপ্টা নাক, ঠোঁট দুটো পুরু, চোখ আধ বোজা। যেন ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে, কিছু দেখছে। বেশ গম্ভীর দেখায়। একটু যেন-বা বিষণ্ন।

রাশেদ বলল, আই লাইক ইট। তৈরি করার সময় যেমন মনে হয়েছিল তেমন নয়। ইট ইজ নাইস। ইট হ্যাজ ক্যারেক্টর। ক্যান আই হ্যাভ ইট?

নভেরা তার দিকে তাকালো। তার প্রায় দশদিন লেগেছে মূর্তিটা তৈরি করতে। বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে একটা বিশেষ চেহারার আদল ফুটিয়ে তুলতে। এখন এটা তার কাজিন ব্রাদার চাইছে। কিছুক্ষণ মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, ইয়েস। ইউ ক্যান হ্যাভ ইট। আই এম প্রেজিন্টিং দিস টু ইউ।

খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে রাশেদ বলল, থ্যাংক ইউ। আমি এটাকে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখব। মাই ট্যালিসম্যান।

নভেরা বলল, ইউ আর ওয়েলকাম।

লুৎফুন বললেন, প্রায় সাত আট মাস বাড়িতে বসে বসে কাঠ দিয়ে, সিমেন্ট দিয়ে মূর্তি গড়ার পর নভেরা জেদ করল লন্ডনে গিয়ে পড়বে। বাবা বললেন, এত টাকা কোথায় পাবো? কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। নভেরা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাকল প্রায় এক মাস, বাড়ির কারো সঙ্গে কথা বলে না, ঠিকমতো খায় না। তার মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বাবাও অস্থির হলেন।

তারপর ব্যবস্থা হলো। মায়ের গহনা, সঞ্চয়ের টাকা, কিছু ধারকর্জ করে নভেরার লন্ডন যাওয়া ঠিক হলো। সেখানে পিয়ারী আছে। তার স্বামীর সঙ্গে। তাদের ওখানে উঠতে পারবে।

মূর্তি গড়ার দিকে ঝোঁক হলো কেন তার? বিদেশে অন্য কিছু পড়তে যেতে পারতেন? হাসনাত তাকালো।

লুৎফুন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, হয়ত মার কাছ থেকে ঐ গুণটা পেয়েছিল। তাঁর মা মাটির পুতুল বানাতেন, কৃষ্ণনগরের পুতুল দেখে দেখে। ছোট ছোট টিনের ওপর দিক কেটে রং দিয়ে চোখ, নাক, মুখ এঁকে নিয়ে শাড়ি পরিয়ে মেয়ে পুতুল তৈরি করতেন। আমার ছেলেমেয়েরা ছোট থাকতে তার কাছ থেকে এসব উপহার পেয়েছে। তিনি নিজের ঘরেও সাজিয়ে রাখতেন। নভেরা এসব দেখত, দেখতে দেখতে তারও শখ হয়েছে হয়ত।

লন্ডন যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না কি করে হবে? আমার তখনো বিয়ে হয় নি। বলে কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে রাখলেন লুৎফুন। তারপর বললেন, তারপর আমার বিয়ে হলো।

হাসনাত বলল, বিয়ের পর কবে দেখা হলো তার সঙ্গে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুৎফুন মুখ তুললেন। মনে করার চেষ্টা করে বললেন, ১৯৫৭-১৯৫৮ কিংবা ঐ রকম সময়ে। নভেরা তখন লন্ডন থেকে ফিরেছে। হামিদদের পুরনো ঢাকার বাড়িতে থাকে। এক সঙ্গে না, কিন্তু কাছাকাছি। এক সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া। প্রায় ওদের ফ্যামিলিরই একজন হয়ে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম হামিদের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। আমার শ্বশুরও তাই ভাবতেন। লন্ডনে হামিদকে চিঠি লিখতেন। আমি দেখেছি তিনি 'বাবা হামিদ' বলে সম্বোধন করতেন। জামাই হিসেবে না দেখলে 'বাবা হামিদ' বলবেন কেন? হুঁ কি বলছিলাম? হ্যা, ঢাকায় এসে নভেরা হামিদদের ওখানে কিছুদিন থাকার পর তেজগাঁওয়ে মণিপুরী পাড়ায় একটা বাসা ভাড়া নিল। চৌ এন লাই আসবেন, তাঁর অভ্যর্থনার জন্য মূর্তি বানাবার দায়িত্ব দেওয়া হলো নভেরাকে।

এয়ারপোর্টের কাছেই ছিল সেই বাসা। নিচে থাকত বাড়িঅলা। আমার স্বামী শাহরিয়ারকে একদিন চিঠি দিল নভেরা। সে একটা পুরনো গাড়ি পেয়েছে। তাকে ড্রাইভিং শেখাতে হবে। আমরা দুজন ঢাকা গেলাম। বেশ কিছুদিন ছিলাম তার মণিপুরী পাড়ার বাসায়। তার স্টুডিও দেখতে অনেকে আসত। গভর্নর আজম খান তার খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি একদিন এ. কে. ব্রোহি আছে না? তাকে নিয়ে এসেছিলেন। আরো অনেক নামকরা লোক আসত, অবজার্ভারের এডিটর কি যেন নাম? কালাম... কি বললেন? সালাম? হ্যা তিনিও এসেছিলেন। নভেরা তখন শুধু চৌ এন লাই না আরো মূর্তি বানাচ্ছে। এম. আর. খান বলে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিল পাশে। তার বাগানের জন্য গরু আর মানুষের মূর্তি বানিয়েছিল। এখনো আছে না সেই বাড়ির সামনে। দেয়াল দিয়েছে। আগে খোলা ছিল।

হাসনাত বলল, নভেরা লন্ডন থেকে ফিরে হামিদুর রহমানের পুরনো ঢাকার বাসায় উঠেছিলেন। তারপর শহীদ মিনার যখন তৈরি শুরু করেন দুজনে তখন একটা টিনের ঘরে এক সপ্তাহ থাকার পর বেইলী রোডে নিজের জন্য বাসা নিয়েছিলেন। তেজগাঁও-এর বাসার কথা শুনি নি।

লুৎফুন কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, আমরা গিয়ে নভেরাকে তেজগাঁও-এর বাসাতেই পাই। আগে থাকতে পারে অন্য কোথাও। হামিদুর রহমানের সঙ্গে পুরনো ঢাকায় থাকার কথাও শুনেছি। সেটা ঢাকা ফেরার পর প্রথম দিকে।

হামিদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপার শুনে কি মনে হয়েছে আপনাদের? আত্মীয় হিসেবে? হাসনাত তাকায়।

কি মনে হবে? মডার্ন না? নভেরা সব সময়ই মডার্ন। আর কারো মতো নাকি? চট্টগ্রামের মতো ব্যাকওয়ার্ড কনজার্ভেটিভ শহরেই তার চাল-চলন ছিল ড্যামকেয়ার। ঢাকা রাজধানী না? শ্বশুর বাড়ির সবাই মডার্ন। তাছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ি তো ধরেই নিয়েছিলেন ওদের বিয়ে হবে।

নভেরার বোনরা কোথায় তখন? তারা কি বলতেন?

কুমুম হক মনে হয় ঢাকায়, তার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার না? শরিফা আলম পিয়ারীরা থাকে করাচিতে, তার হাজব্যান্ড একটা ফার্মে বড় চাকরি করে। শরিফা মাঝে মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় আসত। ছোট বোন তাজিয়া তখন কোথায়? হুঁ, ঢাকায়, না চট্টগ্রামে, উ হুঁ হুঁ ঢাকায়। সেখানেই তার সঙ্গে ডান্স ডিরেক্টর দেবুর সঙ্গে বিয়ে হলো না?

বোনরা ঢাকায় থাকতে নভেরা একা বাসা নিলেন কেন?

ইন্ডিপিন্ডেন্ট। নভেরা সব সময় ইন্ডিপিন্ডেন্ট থাকতে চেয়েছে। তাছাড়া তার কি শুধু শোবার ঘর, বসবার ঘর লাগে? স্টুডিও লাগে না, খুব বড় ঘর, মই, টেবিল, শেল্ফ, বড় বড় মূর্তি রাখার জাগা? বোনদের বাড়িতে অত বড় খালি ঘর কই?

বোনরা আসত নভেরার বাসায়?

হ্যা। আমি আর আমার স্বামী তার তেজগাঁওয়ের বাসায় যাওয়ার পর প্রায়ই দেখতাম তাদের। এসে নভেরাকে বলত, এই লন্ডন থেকে যেসব জুয়েলারি এনেছিস্ আমাদের পরতে দিবি। আমরা বিয়েতে, পার্টিতে যাবো। পরে ফেরত দেবো। কিন্তু নভেরাও কম না। আমাকে বলত, এই যে ড্রয়ারে রেখে দিলাম, চাবি দিচ্ছি তোমার কাছে, তুমি কিন্তু বলবে চাবি নেই।

নভেরা যখন পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজ করতে যেত দুই বোন আসত। আমি মুখস্থ বলে যেতাম, চাবি নেই। ওরা বসে চা খেত, এটা ওটা উল্টে দেখত। তারপর চলে যেত। রাগ করে বলত, নভেরাটা যে কি!

লুৎফুন একটু ভাবলেন, আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, শ্বশুর বাড়ির কথা অন্যকে বলা ঠিক না। কিন্তু এত অনেক দিন আগের কথা, হয়ত বলা যায়। তালেয়াকে বলেছি। বুঝলেন ওর বোনেরা মনে মনে ওকে হিংসা করত, খুব দরদ ছিল না।

কি করে বুঝলেন, শুধু ঐ গহনার ঘটনা থেকেই?

না না তা হবে কেন? অনেক ঘটনা থেকেই বুঝতে পারতাম। নভেরা তো যাবার আগে চোখের জলে বলেই গেল আমাকে।

সে কবে? আমি উৎসুক হয়ে তাকালাম। নভেরার চোখে পানির কথা এই প্রথম একজনের কাছে শুনতে পেলাম। অমন শক্ত মনের মানুষ, দৃঢ় সংকল্প যার, তারও চোখে পানি আসে ভাবতেই কেমন লাগল।

লুৎফুন বললেন, নভেরা চলে গিয়েছিল লন্ডনে। ঢাকাতেই পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজ করার সময় ওর পেটে ব্যথা হতো। একটু ফুলেও উঠেছিল। ওর বোনরা ঠাট্টা করত, বাজে কথা বলত চরিত্র নিয়ে। বলত ও প্রেগন্যান্ট। নভেরা ঢাকা থেকে লাহোরে যায়, তখন সঙ্গে এস. এম. আলী। হামিদুর রহমানকে বলে দিয়েছে বিয়ে করবে না। কেন জানেন? ডাক্তার বলেছে পেটের টিউমার অপারেশন করতে হবে। ইউটেরাস ফেলে দিতে হবে। নভেরা আমাকে বলেছিল, হামিদকে ব্লাফ দিতে পারব না। সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলব যখন তখন কারো বউ হয়ে কি প্রয়োজন? বেচারা হতাশায় ভুগবে, আমাকে দোষারোপ করবে।

যাক যা বলছিলাম, নভেরা লাহোর থেকে লন্ডনে চলে যায়। সেখানে তার অপারেশন হয়। ঊনিশশো সাতষট্টি আটষট্টি হবে, ঠিক করে মনে নেই, তার বাবা, আমার শ্বশুরের অসুখ হলো। নভেরা খবর পেয়ে দেখতে এল তাকে চট্টগ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশকার দিঘির পাড়ের বাড়িতে। কিছুদিন পর আমার শ্বশুর মারা গেলেন। ঢাকা থেকে কুমুম হক, করাচি থেকে পিয়ারী এরা সব এসেছিল।

শ্বশুর মারা যাবার আগে নভেরা ঘরে বসে বসে কাগজে লিখতো, বাবা, বাবা, শুধু এই একটা কথা। আমি একদিন তার ড্রয়ার দেখেছি অনেক কাগজে 'বাবা' লেখা। খুব ভালবাসত বাবাকে, বাবারও বোধ করি নভেরার জন্য একটু বেশিই স্নেহ ছিল।

আমার শ্বশুর মারা যাবার পর নভেরা ঘরে একা একা সময় কাটালো বহুদিন। কারো সঙ্গে দেখা করত না। মুখ ভার করে বসে থাকত। তারপর একদিন আমার মেয়েকে বলল, আয় তোকে নাচ শেখাবো। ঐ যে নজরুল সঙ্গীত আছে না, ফুলে ফলে না ফলে ফুলে? হ্যা, ঐ গানের সঙ্গে নাচ শিখিয়েছিল আমার মেয়ে আর তার বান্ধবীদের। হ্যা, তারা স্কুলের ফাংশনে নেচেছিল।

সেই সময় আমার শাশুড়ির পিঠে একটা ফোঁড়ার মতো হয়েছিল। তিনি চিকিৎসা করাতেন না, শুধু গরম সেঁক দিতেন। নভেরা একদিন জোর করে ঢাকায় নিয়ে গেল মাকে, মেডিকেলে ভর্তি করে তার সঙ্গে নিজেও থাকল সেবার জন্য। অন্য বোনরা ছিল ঢাকাতেই। যাক সে কথা। অপারেশন হলো। কিন্তু নভেরা তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে ছোট বোন তাজিয়াকে বলল, এবার তোরা আমার সেবা শুশ্রূষা কর। আমি বিশ্রাম নিই একটু। সে কুমুম হকদের বাড়িতে চলে যায় অসুস্থ অবস্থায়।

কিছুদিন পর মাকে নিয়ে চট্টগ্রামে এসেছিল। লন্ডনে চলে গেল হঠাৎ। যাবার আগে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলেছিল, আমি আর দেশে আসব না। আমার অসুখ হলো কেউ দেখল না।

যাবার আগে আমাকে আর আমার স্বামীকে বলেছিল, ঢাকা গেলে হামিদ আর তার বউকে দেখে এসো। সে নিজে দেখতে গিয়েছিল কিনা জানি না।

ওহ্ বলা হয় নি। নভেরার পাল্লায় পড়ে আমি একটা ডকুমেন্টারি ফিল্মে একটিং করেছিলাম। নাম, 'কর্ণফুলী কেন নদীর নাম হলো'। ফতেহ লোহানী ডাইরেক্টর, আজাদ হলেন ফটোগ্রাফার। পাকিস্তান গভমেন্ট ফতেহ লোহানীকে ইস্ট পাকিস্তানে ফিচার ফিল্মের জন্য টাকা দিতে চায় নি। বলে, আগে ডকুমেন্টারি করো। তারপর ফিল্ম হবে।

নায়ক, হিরো?

আমার স্বামীই হিরো ছিল ঐ বইতে।

তাহলে জমল না। হাসনাতের মুখে কৌতুকের হাসি।

তা আমি কি করব? আমার বিয়ে হয়েছে না? আসলে নভেরার অভিনয় করার কথা ছিল, সিনেমাতেও ওর খুব শখ। কিন্তু হিরোয়িনের নাক একটু চ্যাপ্টা হতে হবে, নভেরার নাক সোজা। তাই আমাকেই বেছে নিল। আমি না গয়না পরে সমুদ্রে বিচে পাথরে বসে আছি, একটা একটা করে গহনা ফেলে দিচ্ছি। কানের ফুল ঢেউয়ে ভেসে যেতে দেখে লাফ দিলাম। তারপর কানফুলের সঙ্গে ভেসে গেলাম। দেখেন নি? শুধু চট্টগ্রাম কেন করাচিতেও তখন ফিল্মের আগে ডকুমেন্টারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাতো। অনেক চিঠি পেতাম, টেলিফোন আসত। ঐ বই দেখিয়েছে। ফিল্মে তোলা আমার ছবির অ্যালবাম নভেরা নিয়ে গিয়েছে। না হলে দেখাতে পারতাম।

বাংলাদেশ হবার আগে সেই যে চলে গেলেন আর আসেননি? আমি প্রশ্ন করলাম।

নাহ্।

আপনাদের সঙ্গে তো বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল মনে হচ্ছে। আপনি চেষ্টা করেন নি যোগাযোগ করতে?

করব না কেন? ১৯৯১ সালে যখন লন্ডনে মেয়ের কাছে গিয়েছিলাম, জামাইকে বলেছিলাম, প্যারিসে বাংলাদেশ অ্যামব্যাসিতে চিঠি লিখে নভেরার ঠিকানা বার করতে। অ্যামব্যাসি থেকে উত্তর এল, তারা খোঁজ রাখে না।

বলে লুৎফুন থামলেন। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তার এই ভঙ্গিটি বেশ ইন্টারেস্টিং, যেন ছোট মেয়েটির মতো অভিমান করে বসে আছেন। অথবা রাগ করেছেন।

মুখ নিচু রেখেই একটু পর বললেন, শুনেছি প্যারিসে নিউ ইয়ারস্ উদ্‌যাপন করতে গিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়েছে। লাঠি ব্যবহার করতে হয়। এর আগে ও যখন লাহোর থেকে বোম্বাইতে বৈজয়ন্তীমালার কাছে ভরত নাট্যম শিখতে যায়, তখন গোড়ালিতে ব্যথা পেয়েছিল। এরপর মনে হয় তার নাচের শখ ছিল না।

তার অন্য আত্মীয়স্বজন কোনো খবর রাখে নি?

না। নভেরা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। তবে শুনেছি তার মামা বি আর নিজাম সাহেবকে অনেক বছর পর প্যারিস থেকে একটা চিঠি দিয়েছিল। তার মামা সেই চিঠি নিয়ে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। কবে ১৯৮৫, ১৯৮৬-এরকম হবে। তার আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে। তার মামা বি আর নিজাম ঢাকায় থাকেন। সাত মসজিদ রোডের কাছে ধানমন্ডিতে। চিঠিতে লিখেছিল, একটা টিকেট পাঠাও।

তালেয়াকে বলেছি এসব কথা আপনাকে বলব কিনা। ও আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই স্কুল থেকে এক সঙ্গে পড়ি। আমার তো কলেজের পরই বিয়ে। তালেয়াকে বলতাম, কিরে তুই বিয়ে করবি না! ও একদিন বলল, হ্যা। একটা চমৎকার ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছে। আমি বললাম, চট্টগ্রাম নিয়ে আয় আমরা দেখব। সে নিয়ে এসেছিল তার বাবা-মাকে দেখাতে। আমি দরজার ফুটো দিয়ে দেখে পরে ওকে বলেছিলাম, ওমা, কি বিচ্ছিরি! একে তুই বিয়ে করবি? তালেয়া অবাক হয়ে বলেছিল, বিচ্ছিরি হবে কেন? কি বিচ্ছিরি দেখলি ওর? আমি বললাম, কেন ওর পায়জামা। কেমন ঢোলা ঢোলা। খুব আনস্মার্ট।

তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল?

হবে না কেন? সেই তো শফিকুর রহমান। এখন 'র' বাদ দিয়ে এ-কার যোগ করে শেফিক লেখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, এসব কিন্তু লিখব।

হায় হায় তাই নাকি? আপনি কি জার্নালিস্ট? তালেয়া তো বলে নাই।

চট্টগ্রামে খুলশীতে এক নম্বর রোডে নিচু জায়গায় মসিয়ুর করিমের বাড়িটা। সামনে বোগেনভেলিয়ার ঝাড়, দেয়াল ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে হাত বাড়িয়েছে। লাল-নীল-হলুদ বাতির মালা ঝুলছে বাড়ির লনে। ছোট একটা শামিয়ানা, তার নিচে নিমন্ত্রিতরা চেয়ারে বসে আছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। প্রায় সবাই কথা বলছে।

হাসনাত রসুল নিজামকে বলল, মনে হচ্ছে তার ওপর তোমার টিন এজ সুলভ ক্রাশ ছিল।

রসুল দুষ্টুমিভরা হাসি মুখে নিয়ে বলল, অমন কাজিন থাকলে অনেকেরই হবে। ইয়েস, মাই মোস্ট ফেভারিট কাজিন। নভেরা।

হাসনাত বলল, লন্ডনে ১৯৫২-তে সেই শেষ দেখা?

না, তা হবে কেন। ঢাকায় ফিরল ১৯৫৮-এর দিকে। হামিদুর রহমানের সঙ্গে। আমরা ধরেই নিয়েছি তার সঙ্গে বিয়ে হবে। তখন আমি ঢাকায় যাই মাঝে মাঝে। সন্ধ্যার পর হামিদ ভাইকে নিয়ে জিন্নাহ এভেন্যুতে ক্যাসবা রেস্তরাঁয় গিয়ে আড্ডা দিই। তখন সেটাই ছিল ইনটেলেকচুয়ালদের আড্ডার জায়গা। নভেরা আসত রাত নটার পর। তার কাজ শেষ করে, সেজে মেক-আপ লাগিয়ে। সেই কালো শাড়ি, পিঠময় ছড়ানো চুল। তুমুল আড্ডা হতো। হামিদ ভাইয়ের সংস্পর্শে এসে আমিও সোসালিস্ট হয়ে যাই, কিছুদিনের জন্য ক্যাপিটালিজমের মুণ্ডপাত করি। 'ওয়ার্কার্স অব দা ওয়ার্ল্ড ইউনাইট' বলে স্লোগান দিই। খুব জমত আমাদের আড্ডা। নভেরা এসব এগ্রেসিভ কথাবার্তা পছন্দ করত। চট্টগ্রামে থাকতে এমন ছিল না।

হাসনাত বলল, লন্ডনে গেলে সবাই সোসালিস্ট হয়ে ফিরত তখন। এখন বলো দেখি, তোমার মোস্ট ফেভারিট কাজিন যে এইভাবে প্যারিসে হারিয়ে গেল, তার সম্বন্ধে কিছুই জানা যাচ্ছে না, বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে, কেউ বলতে পারছে না, এ-ব্যাপারে তোমার কৌতূহল নেই?

রসুল বলল থাকবে না কেন? ফ্রেঞ্চ অ্যামবাসাডরকে অনুরোধ করেছি নভেরার ঠিকানা বের করতে, তার খোঁজ নিতে। অদূরে আতাউর রহমান কায়সারকে দেখে রসুল বলল, কায়সারের আব্বা কিন্তু নভেরাকে পছন্দ করতেন না, তার আধুনিকতার জন্য। তার সামনে আমি কিন্তু নভেরা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না।

আতাউর রহমান কায়সার এগিয়ে এসে বলল, কী আলাপ হচ্ছে?

রসুল বলল, নভেরা আহমদকে নিয়ে।

কায়সার বলল, নভেরা আমার ফুপু। সে তো বিস্মৃত ইতিহাস। তার কথা এখন কেউ বলে এই প্রথম শুনলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত বলল, আপনার আব্বা ইয়ার আলী খান নাকি নভেরাকে পছন্দ করতেন না? বিশেষ করে তার নাচ-গানের ব্যাপারে তার আপত্তি ছিল।

কায়সার মাথা ঘোরালো কয়েকবার। তারপর বলল, তিনি মুসলিম লীগ করতেন ঠিকই, কিন্তু গোঁড়া বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন না। আমি অবশ্য ছোট ছিলাম। সব ঘটনা মনে নেই। নভেরা ফুপুকে নিয়ে বাড়িতে আলাপ হতো। তিনি আর তার বোনেরা চট্টগ্রামে এসে তাদের খোলামেলা চলাফেরায় বেশভূষার আধুনিকতায় একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। নভেরা ফুপুর নাচের শখ ছিল সেটাও জানা গেল। কিন্তু আব্বা তার নাচের বিরোধিতা করেন নি।

তাহলে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হলো কীভাবে? হাসনাত তাকায়। রসুল কখন পাশ থেকে সরে গিয়েছে টের পায় নি সে।

কায়সার সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে ধুঁয়ো বার করে বলল, মেয়েরা শালীনতা বজায় রেখে চলুক এটা আব্বা চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছিলেন না, সেসবে মেয়েরা অংশ নেবে এতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। সেন্ট প্লাসিড স্কুলের মঞ্চে নজরুল জয়ন্তীতে নভেরা ফুপুর নাচ দেখার পর বলেছিলেন, নজরুল সঙ্গীতের সঙ্গে নাচ আগেও দেখেছি। কিন্তু তুমি যে নাচলে সেটা নতুন। 'লা লা লা' বলে নজরুল সঙ্গীত না গাওয়া হলে কি তোমার নাচ জমত না? আর নাচের মধ্যে মাঝে মাঝে পুরুষালি ঢঙে লাফঝাঁপ না দিলে কি হতো না? নেচেছ ঠিকই, কিন্তু এটা কি নজরুল সঙ্গীতভিত্তিক নাচ?

শুনে নভেরা ফুপু বলেছিলেন, আপনি বুঝবেন না।

আব্বা বললেন, বুঝি নি বলেই তো বললাম। আর আমি তো একা না, অনেকেই বোঝে নি।

নভেরা ফুপু হেসে বলেছিলেন, আস্তে আস্তে বুঝবে সবাই।

চারদিকে নিমন্ত্রিতদের দিকে দেখে গিয়ে কায়সার বলল, আব্বা কিন্তু তার ফুপাতো বোনকে পছন্দই করতেন। নভেরা ফুপু লন্ডনে যাবার আগে রসিকতা করে কবিতা লিখেছিলেন। আমার এখনো মনে আছে। দাঁড়ান বলছি। কায়সার একটুক্ষণ ভাবে, তারপর ছড়ার মতো আবৃত্তি করে

আমি যাবো সাহেব বাড়ি
বদনা যাবে গড়াগড়ি
পকেট ভরা চুইংগাম
ক্লাস ফ্রেন্ডরা করবে দান
তাই নিয়ে থাকব ভুলে
নিজ দেশের পান সুপারী।

হাসনাত অবাক হয়ে বলল, এত পুরনো জিনিস মনে রাখলেন কি করে?

মুখে রহস্যময় হাসি নিয়ে কায়সার বলল, মনে রাখতে হয়। কিছু কিছু ঘটনা ভোলা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত বলল, আপনার আব্বার চমৎকার রসবোধ ছিল। না হলে এমন ছড়া লিখতে পারতেন না।

কায়সার সিগারেটে টান দিয়ে বলল, সে তো ছিলই। ঐ যে লিখেছেন, বদনা যাবে গড়াগড়ি, মানে বুঝলেন তো? লন্ডনে তো বদনা ব্যবহার হবে না।

রসুল কাছে এসে বলল, কি আলাপ হচ্ছে?

কায়সার ভিড়ের দিকে যেতে যেতে বলল, নভেরা, নভেরা ফুপুর কথা।

ভাস্কর আবদুল্লাহ খালেদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে এসে বলল, নভেরা, কোন্ নভেরার কথা বলছেন আপনারা?

হাসনাত বললেন, বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ভাস্কর।

খালেদ মাথার এলোমেলো চুলে হাত দিয়ে আরো অবিন্যস্ত করে দিয়ে বলল, তাঁকে দেখেছি আমি, কথা হয়েছে।

হাসনাত আগ্রহের সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো।

খালেদ বলল, ১৯৬০ সালে যখন তিনি পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রদর্শনী করেন, আমি তখন নবাবপুর স্কুলে পড়ি। প্রায়ই দেখতে যেতাম। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন, পরনে কালো শাড়ি, মাথার চুল পিঠময় ছড়ানো, নিজেই যেন একটা ভাস্কর্য। একদিন কাছে এসে বললেন, তোমাকে প্রায়ই দেখি এখানে। কি করো তুমি? আমি বললাম, স্কুলে পড়ি।

তিনি হেসে বললেন, এখানে এই যে এতবার এসেছ, কেন?

আমি বললাম, আপনার কাজ দেখে আমার ভাস্কর হতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি ভাস্কর হবো।

AMARBOI.COM

প্যারিস থেকে ব্যাংকক, পথে দিল্লিতে কিছুক্ষণের বিরতি। রাতে ঘুম হয় নি, ব্যাংককের হিউমিড আবহাওয়া, সব মিলে নভেরার মেজাজ অপ্রসন্ন। বিরক্তিকর মনে হলো ব্যাংকক ডং মোয়াং এয়ারপোর্টে সামরিক তৎপরতা, আমেরিকানরা যেন জায়গাটিকে মিলিটারি এয়ারপোর্টে পরিণত করেছে। টার্মিনাল থেকেই দেখা গেল একটু পর পর উড়ছে ইউ. এস. এয়ারফোর্সের বিশালকায় প্লেনগুলি। কাচের দেয়াল কেঁপে কেঁপে উঠছে তাদের সুপারসনিক গতিবেগের ধাক্কায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধ এতদিন সে কাগজের ফটোতে আর টিভির স্ক্রিনে দেখেছিল। এখন সেটা একেবারে চোখের সামনে। তার বিবমিষা হলো।

এয়ারপোর্টে এস. এম. আলী ছিল। নভেরা আর তার সঙ্গী পোলানস্কি ইমিগ্রেসান কাস্টমস্ শেষে বেরিয়ে আসতেই দেখা হলো। নভেরার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে আলী তাকালো পোলানস্কির দিকে। তার তাকানো দেখে বোঝাই যায় যে একে সে নভেরার সঙ্গে আশা করে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেরা বলল, পোলানস্কি, আমার বন্ধু। পেশাগতভাবে ও ফটোগ্রাফার। ভিয়েতনামে যাবে, ছবি তুলতে।

পোলানস্কির সঙ্গে করমর্দন করতে করতে আলী বলল, হ্যা, তোমার কথা নভেরা তার চিঠিতে লিখেছে। কিন্তু তুমি যে ওর সঙ্গে আসবে জানতাম না।

পোলানস্কি বলল, হঠাৎ করেই আসা ঠিক হলো। দুতিনটে নিউজ পেপার ফটোগ্রাফের এসাইনমেন্ট দিল। আর নভেরাও আসছিল, তাই একসঙ্গে চলে এলাম।

পোলানস্কির ঘাড় থেকে, দুহাতে ঝুলছে চার-পাঁচটা ক্যামেরা, বিভিন্ন আকারের লেন্স। হাতের ব্যাগ ফুলে আছে, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ক্যামেরার ট্রাইপড। আলী বলল, একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছি তোমার জন্য। কাছে, সয় ১৫, সয় মানে ছোট রাস্তা। ফ্ল্যাটে বড় একটা ঘর আছে, যেটাকে তুমি স্টুডিও বানাতে পারবে।

নভেরা পোলানস্কির দিকে তাকালো। পোলানস্কি বলল, আমরা তো ভেবেছি দুজনেই হোটেলে থাকব। নভেরা ফ্ল্যাটের কথা কিছু বলে নি।

শুনে অপ্রসন্ন হলো আলী। নভেরার দিকে তাকালো সপ্রশ্ন। নভেরা বলল, তুমি আমার ফ্ল্যাট ঠিক করতে গেলে কেন? হোটেলেই ভালো, ওয়েটার, বয় আছে, ইচ্ছে মতো ফরমাশ দেওয়া যায়। ক্ষিদে পেলে রেস্তরাঁয় চলে গেলাম, রান্নার বালাই নেই। ফ্ল্যাট দেখা-শোনায় অনেক ঝামেলা।

আলী গম্ভীর হয়ে তাকালো নভেরার দিকে। তারপর শুকনো স্বরে বলল, হোটেলে থেকে তুমি কাজ করবে কি করে? তোমার স্কাল্পচার কি হোটেলের রুমে বসে হবে?

ওহ্। স্কাল্পচার। হঠাৎ যেন মনে হলো নভেরার। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তোমাকে আমার নতুন আইডিয়ার কথা বলা হয়নি। আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধের পটভূমিতে শান্তির ওপর স্কাল্পচার করব। অ্যান্টি ওয়ার স্কাল্পচার, পিস স্কাল্পচার। হোয়াট এ বেটার প্লেস দ্যান ব্যাংকক, উইথ ভিয়েতনাম ইন দা ব্যাকগ্রাউন্ড।

তার জন্যও তোমার স্টুডিও প্রয়োজন হবে। আলী তাকালো।

হয়ত হবে। কিন্তু তার আগে ভিয়েতনামে গিয়ে দেখতে হবে।

ভিয়েতনাম? আলী বুঝতে না পেরে তাকায়।

হ্যা, ভিয়েতনাম যাবো। সেখানে যুদ্ধ কেমন করে মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে তা নিজ চোখে দেখব। ব্রুটালিটিজ অ্যান্ড ডিহিউম্যানাইজেশন অব ওয়ার, এই হবে আমার কাজের বিষয়বস্তু। এর জন্য ভিয়েতনাম যেতে হবে। পোলানস্কির সঙ্গেই যাবো।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আলী। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আই থিংক দেয়ার ইজ সাম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং।

নভেরা ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

পোলানস্কি বলল, ইজ দেয়ার এ প্রব্লেম? ক্যান আই বি অব হেল্প।

আলী বলতে চাইল, ইউ আর পার্ট অব দা প্রব্লেম। বলল না। তার বদলে মুখে হাসি এনে বলল, উই আর সর্টিং আউট দা লজিসটিকস্। তারপর নভেরার দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে বলল, লং জার্নির পর এভাবে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে তর্ক করে লাভ নেই। হোটেলে যেতে চাইলে সেখানেই চলো। এক মাসের ফ্ল্যাট ভাড়া না হয় গচ্চা দিতে হবে। তাতে কিছু আসে যায় না।

ট্যাক্সিতে উঠে নভেরা বলল, আই অ্যাম সরি। তোমার জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করলাম।

আলী হাসি মুখে বলল, ইউ আর ওয়েলকাম। আই এনজয় ইওর ঝামেলা।

পোলানস্কি বলল, হোয়াট ইজ ঝামেলা?

আলী হাসি মুখে বলল, নভেরার ডাক নাম।

নভেরা কপট উষ্মার সঙ্গে তাকালো আলীর দিকে।

হোটেলে দুটি সিঙ্গল রুম নেওয়া হলো দুজনের জন্য। জিনিসপত্র ঘরে রেখে ওরা সবাই এল নিচের কফি শপে।

কফি খেতে খেতে নভেরা বলল, আই অ্যাম সরি খসরু। তোমাকে সত্যি ঝামেলায় ফেলেছি। আমি ভাবতে পারি নি। তুমি স্টুডিওসমেত একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে ফেলবে।

না করলেই কি আশ্চর্যের ব্যাপার হতো না? অস্বাভাবিকও। গত এক বছর থেকে ব্যাংককে তোমার এক্সজিবিশনের কথা বলছি। প্রদর্শনীর আগে ভাস্কর্য তৈরি করার জন্য বড় স্টুডিও লাগবে এ তো জানাই ছিল। তাই তুমি যখন ফাইনালি জানালে আসছ তখন ফ্ল্যাটটা নিয়ে নিলাম। যাক ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। এখন শুনি তোমার প্ল্যানটা কি?

ঐ যে বললাম, প্রথমে ভিয়েতনাম যাবো। নিজের চোখে যুদ্ধের ধ্বংস, বর্বরতা, নীচতা সব দেখব। ভাস্কর্যে যে ফিলিংটা আনব সেটা আগে নিজের মধ্যে আনতে হবে তো। আই হ্যাভ টু লিভ থ্রু দা ওয়ার, ইন সাম ওয়ে। না হলে যুদ্ধ-বিরোধী ভাস্কর্য প্রাণহীন মনে হবে।

পোলানস্কি হেসে বলল, নভেরা কোনো কিছুই তাড়াহুড়ো করে করতে চায় না, সি ওয়ান্টস টু গিভ টাইম টু এভরিথিং বিফোর টেকিং এ ডিসিশন।

জানি। পোলানস্কি জীবনটা ছোট, অত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে চিন্তাভাবনার পর কাজ করার সময় কোথায়? আলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আমি আমার চারপাশের লোকদের সব সময়ই হতাশ করে এসেছি। এখন কি তার ব্যতিক্রম হতে প্যারে? নভেরা হেসে বলল। তার হাতে একটা চামচ, সে চামচটা নানা ভঙ্গিতে রেখে দেখছে তার গঠন আর টেবিলে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক।

আলী ওয়েটারকে ডেকে বিল দিতে বলে নভেরার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর পোলানস্কির দিকে তাকিয়ে বলল, যারা নভেরাকে চিনেছে তারা হতাশ বোধ করার উর্ধ্বে। দে হ্যাভ বিকাম ইম্যিউন। তুমি কি হও নি?

পোলানস্কি একটু চমকে উঠল আলীর কথায়। তারপর হেসে বলল, অবশ্যই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী উঠে দাঁড়ালো। দুজনকে উদ্দেশ করে বলল, তোমরা রেস্ট নাও। আমি বিকেলে এসে তোমাদের ব্যাংকক শহর দেখাতে নিয়ে যাবো।

নভেরা বলল, ফাইন।

বিকেলে হোটেলে এসে আলী দেখল পোলানস্কির জ্বর এসেছে। সে বেরুতে পারবে না, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। নভেরাকে বলল, তুমি যাও। আমার জন্য সন্ধ্যাটা মাটি করো না।

আলী আর নভেরা ট্যাক্সি করে শহর দেখতে বেরুলো।

ট্যাক্সি চলছে, পেছনে বসে আলী আশপাশের ভবন, মনুমেন্টের বর্ণনা দিতে থাকল। এক সময়ে সে বলল, এই যে এতক্ষণ ঘুরলাম, কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, শহরে সুন্দর সুন্দর ভবন আছে, কিন্তু স্কাল্পচার নেই, কিছু সিংহের মূর্তি বাদ দিলে আউটডোর স্কাল্পচারের অনুপস্থিতি বেশ চোখে পড়ে।

এর কারণ? নভেরা তাকালো তার দিকে।

কারণ একটাই মনে হয়েছে আমার কাছে। অনভ্যস্ত চোখ। মন্দিরে বুদ্ধ মূর্তি আর প্রাসাদের বাইরে সিংহ মূর্তি দেখেই এরা অভ্যস্ত বেশি। সিটি প্ল্যানিং-এর অংশ হিসেবে স্কাল্পচার আসে নি এখনো। অথচ স্থাপত্যে এরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে। অনেক থাই আর্কিটেক্ট নাম করেছে দেশে-বিদেশে।

হ্যাঁ। প্যারিসেও কয়েকজন আছে। বেশ মডার্ন। নভেরা বাইরে তাকাতে তাকাতে বলল।

সেই জন্যই তোমাকে এখানে একটা প্রদর্শনীর কথা বার বার বলেছি। ইট ইজ এ ভেরি গুড মার্কেট। একবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে দেখবে কমিশনের পর কমিশন আসছে। তখন ব্যাংককেই পার্মানেন্ট স্টুডিও করে বসতে পারবে।

নভেরা চুপ করে শুনল। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়েই বলল, প্যারিসের বাইরে আর কোথাও পার্মানেন্টলি আমার পক্ষে থাকা সম্ভব না।

কেন? আলীর স্বরে বিস্ময়।

প্যারিসে আমি সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। আই ফিল অ্যাট হোম।

কিন্তু কাজ, কাজ পাচ্ছ সেখানে? চলবে কি করে?

চলে যাচ্ছে, চলে যাবে। বেশির ভাগ আর্টিস্টের জীবনই তো স্ট্রাগলিং। কজন আর পিকাসো, হেনরি মুর হয়?

না, না। এটা কোনো প্র্যাকটিকাল কথা হলো না। আলী সজোরে মাথা নাড়ে।

প্র্যাকটিকাল? প্র্যাকটিকাল হলে তো অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করতাম। স্কাল্পচার কেন? নভেরার মুখে মৃদু হাসি।

আলী পাশ ফিরে নভেরার প্রোফাইল দেখল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে ব্যাংককে টেনে আনার চেষ্টা করছি না। এখানে তোমার কমার্শিয়ালি এস্টাবলিস্ড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বলছি। তুমি ভেবে দেখো, এখনই প্রস্তাবটা ফেলে দিও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থ্যাংক ইউ। আমি জানি তুমি আমার ভালোর জন্যই বলছ। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি আমার ভালো সব সময়ই চেয়ে এসেছ। যারা আমার কাছে এসেছে, বন্ধু হয়েছে তারা সবাই আমার মঙ্গল চেয়েছে, অনেক কিছু করেছে, যেমন তুমি এখনো করে যাচ্ছ। কিন্তু আমি নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে পারি না। আমার যখন যেটা ভালো লাগে না, সেই কাজ অন্যকে সুখী করার জন্য করতে পারি না। এদিক দিয়ে আমি বেশ স্বার্থপর। থাক। এ প্রসঙ্গ বাদ দাও। শহর দেখার আনন্দটাই মাটি হবে। এখন এসো, আমরা প্রাফ্রি নদীতে নৌকো দিয়ে বেড়াতে যাই কিছুক্ষণ। ভেরি ইন্টারেস্টিং, তোমার ভালো লাগবে।

দুদিন পর নভেরা আর পোলানস্কি ভিয়েতনাম চলে গেল। আলী কার্ড পেল কদিন পর। আমেরিকানদের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে নভেরা, ওদের সঙ্গেই ঘুরছে। পোলানস্কি ছবি তুলতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্রন্ট লাইনে। সেও এক্রেডিশন পেয়েছে ওয়ার করেস্পন্ডেন্ট হিসেবে।

দুসপ্তাহ পর নভেরা ফিরে এল ব্যাংককে, একাই। পোলানস্কি রয়ে গিয়েছে সায়গনে। তার এসাইনমেন্ট শেষ হতে আরো দিন পনের লাগবে।

নভেরা আলীকে বলল, একটা বাড়ি দেখো আমার জন্য, মস্ত বড় লন থাকতে হবে।

কেন বড় বড় পার্টি দেবে নাকি? আলীর স্বরে কৌতুক।

ওপেন এয়ার স্টুডিও লাগবে আমার। ভাঙা প্লেন, ট্যাংক, কামান এসব আসছে। আমেরিকানরা বিনা মূল্যে দিতে রাজি হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে ট্রাক এসে হাজির হবে। তার আগেই বাড়ি চাই, লনসহ।

ট্যাংক, কামান, এসব সাজিয়ে রেখে কি হবে? ওয়ার মিউজিয়াম করতে চাও নাকি?

শুনে নভেরা ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। তারপর অসন্তুষ্ট স্বরে বলল, মনে হচ্ছে ঠাট্টা করছ। আই ডোন্ট লাইক ইট। আমি যখন সিরিয়াস হয়ে কিছু করতে চাই তখন কেউ ঠাট্টা করলে ভালো লাগে না।

আলী বলল, ঠাট্টা না। সত্যি আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না।

আবার বলতে হবে? ব্যাংককে এসেই তোমাকে বললাম না যুদ্ধ-বিরোধী স্কাল্পচার তৈরি করব। তার জন্য ম্যাটেরিয়াল লাগবে না? ট্যাংক, কামান, ভাঙা প্লেনের টুকরো ঐ জন্যই আনছি।

আমেরিকানরা জানে তুমি যুদ্ধ-বিরোধী স্কাল্পচারের জন্য ঐসব ব্যবহার করবে? আলী তাকায় নভেরার দিকে।

না। তারা জানে স্কাল্পচারে ব্যবহার করব, কোন ধরনের স্কাল্পচার, কি বিষয়ে সেসব কিছু বলি নি। কেননা তারা জানতে চায় নি।

আলী উঠে দাঁড়ালো, তারপর খাবার জন্য গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বলল, মনে হচ্ছে তারা জানলে মোটেও খুশি হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই হলো। আমার তাতে কিছু আসে যায় না। তাদের খুশি করার জন্য কোনো চুক্তি করি নি আমি।

আলী হেসে বলল, নভেরা তুমি সব সময়ই বড় ডিফেনসিভ।

নভেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে বসে বলল, হাজার হোক মেয়ে তো।

অনেক ঘোরাঘুরি করে পছন্দ মতো একটা বাড়ি পাওয়া গেল। ততদিনে ট্রাকে ভাঙা প্লেনের টুকরো, বিকল কামান, ট্যাংকের ভগ্নাংশ সব এসে পৌঁছেছে। একটা গুদামে রাখা হলো সেসব সাময়িকভাবে। ভাড়া করা বাড়িটা সাজিয়ে নেবার আগেই ট্রাক ভর্তি মালামাল নামানো হলো লনে। তারপরই শুরু হলো ঝামেলা। প্রতিবেশীরা আপত্তি জানালো, বাড়িঅলাও খুশি না। নভেরা জেদের সঙ্গে বলল, ভাড়া দিয়েছি এখানেই থাকব। দিক উকিলের নোটিশ, আমিও পাল্টা উত্তর দেবো। সারা শহরে বেশ্যালয় খুলে বসেছে এরা ম্যাসেজ পার্লারের নামে তার বিরুদ্ধে হৈচৈ নেই কেন? কোন্ ধরনের মরালিটি এটা? নাহ্ অন্য কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

আলী ভড়কে গেল নভেরার হাব-ভাবে। শেষে কাকুতিমিনতি করে এইটুকু আদায় করল যে সন্ধ্যার পর নভেরা লনে কাজ করবে না। এতে প্রতিবেশীদের আপত্তিও কমল।

কাজ শুরু করল নভেরা দারুণ উৎসাহে। তাকে সাহায্য করতে দুজন অ্যাসিসট্যান্ট নিয়োগ করা হলো। ওয়েল্ডিং করা, অক্সি-এসিটিলিন দিয়ে ইস্পাত কাটা এসব কাজ দেখে মনে হলো এটা কোনো কারখানা। নভেরা শাড়ি কোমরে পেঁচিয়ে হাতুড়ি হাতে মই দিয়ে ওঠা-নামে।, নাট, বল্টু লাগায় ঠক ঠক করে। প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে বিদেশী মেয়েটার কাণ্ড দেখে পর্দার ফাঁক দিয়ে। আলী আসে প্রতিদিন। চুপ করে দেখে। নভেরা কাজের অবসরে গল্প করে।

পোলানস্কি সায়গন থেকে এসে কদিন থাকল ঐ বাড়িতে। তারপর প্যারিস চলে গেল, প্রদর্শনীর সময় আবার আসবে। আলীর খুব অস্থির লাগল যে কদিন পোলানস্কি নভেরার সঙ্গে ছিল।

তিন মাস পর প্রদর্শনী শুরু হলো। আলী তার কাগজে, সহকর্মীদের দিয়ে অন্যান্য কাগজে পাবলিসিটি দিল। উদ্বোধনীতে এল অনেকে, থাই, ইউরোপিয়ান, আমেরিকান, জাপানিজ। সবাই কৌতূহলের সঙ্গে দেখল কাজগুলো। কামান বাঁকা করে লাঙল, আর্টিলারি দিয়ে মস্ত বড় বড় কলম, প্লেনের ভাঙা উইং, ফুসালেজের টুকরো দিয়ে তৈরি পারাবত, মা ও শিশুর অর্ধ বিমূর্ত মূর্তি এইসব। কাগজে রিভিউ বের হলো, মিশ্র প্রতিক্রিয়া। দুসপ্তাহ ধরে প্রদর্শনী চলল, লোকজনের ভিড় কমে এল প্রথম কদিনের পর। প্রদর্শনী শেষ হবার পর দেখা গেল মাত্র একটা কাজ বিক্রি হয়েছে। এক জাপানি প্রৌঢ় কিনেছে একটি শান্তির পারাবত। ডেলিভারির সময় বিড়-বিড় করে বলল, হিরোশিমা, হিরোশিমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী নভেরাকে নিমন্ত্রণ করেছে বড় একটা হোটেলে। দুজনে মুখোমুখি বসে, পাশে কাচের দেয়াল দিয়ে দেখা যায় নদী, স্কাই-স্ক্র্যাপার। লাল-নীল-হলুদ আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছে রাতের ব্যাংকক।

নভেরা চুপচাপ বসে আছে। তাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে।

আলী বলল, হতাশ হবার কিছু নেই। কাজ হিসেবে তোমার স্কাল্পচার ছিল অনবদ্য। ইট হ্যাড এ মেসেজ। কিন্তু এখনো যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব সোচ্চার হয় নি এ-দেশে। যুদ্ধের ওপর নির্ভর করছে এদের ব্যবসা-বাণিজ্য। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলবে কেন? আর আমেরিকানরা যে পছন্দ করবে না সে তো জানাই ছিল।

নভেরা কিছু বলল না। ওয়েটার এসে ঠাণ্ডা পানির গ্লাস দিয়ে গেল টেবিলে। নিচু স্বরে মিউজিক হচ্ছে। ঘরে আর চারজন বসে আছে। তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

আলী বলল, তুমি একটা স্টুডিও নিয়ে অন্য ধরনের কাজ করে দেখো। ওপেন এয়ার স্কাল্পচার, বাট নন-পলিটিক্যাল। তারপর প্রদর্শনী করে দেখা যাবে। আমি নিশ্চিত তখন আরো সাড়া পাওয়া যাবে।

নভেরা বাইরে নদীর দিকে তাকালো, একটা বড় স্টিমার যাচ্ছে, ওপরে ধনুকের মতো আলোকমালায় সাজানো। পানিতে আলোর প্রতিবিম্ব পড়ে লাফাচ্ছে, টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। সমস্ত নদীটাই যেন নাচছে আনন্দে। সে চোখ না ফিরিয়েই বলল, আমি প্যারিস ফিরে যাচ্ছি। টিকিট কনফার্মড্ হয়েছে। পরশু দিনই আমার ফ্লাইট।

শুনে আলী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর অভিমানের সুরে বলল, আমাকে কিছুই বলো নি, সব ঠিক করে ফেললে?

বলার কি আছে? এখানে যে থাকব না সে তো তোমাকে আগেই বলেছি। এক্সজিবিশন ফ্লপ না হলেও এখানে থাকার প্রশ্ন উঠতো না। আমাকে প্যারিসে যেতে হতোই।

প্যারিস ছাড়া পৃথিবীতে কি আর কোনো শহর নেই? কি আছে প্যারিসে? আলীর স্বরে কিছুটা উষ্মা মেশানো।

হাসল নভেরা। গভীর দৃষ্টিতে তাকালো আলীর দিকে। তারপর বলল, প্যারিস আর্টিস্টদের জন্য মায়ের মতো। সবার জন্য কোল পেতে আছে। যত কষ্টেই থাকি আই ফিল অ্যাট হোম দেয়ার।

দুদিন পর নভেরা প্যারিস চলে গেল। এয়ারপোর্টে বিদায় দেবার জন্য আলী এল। তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে। নভেরা চুপ করে আছে। মাঝে মাঝে হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। তারপর হেসে বলল, এত সিরিয়াস কেন?

আলী বলল, এমনি। ফেয়ারওয়েল ইজ অলওয়েজ স্যাড।

ফ্লাইটের এনাউন্সমেন্ট হচ্ছে। লোকজন আসছে, যাচ্ছে। তারা দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আলী ঘামছে। কপালে ঘামের বিন্দু জমে উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেরা এগিয়ে এসে আলীর হাত ধরল। তারপর হেসে বলল, উই উইল অলওয়েজ বি ফ্রেন্ডস, অলরাইট?

নভেরার প্লেনের ডিপারচার ঘোষণা করল লাউড স্পিকারে। নভেরা যেতে যেতে হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

কথা হচ্ছিল চাইনিজ রেস্তরাঁয়। এস. এম. আলী সুপের চামচ নামিয়ে রেখে বললেন, এটা খুব পেইনফুল আমার জন্য। নভেরার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অবশ্যই ছিল, ভেরি সিরিয়াস রিলেশন। বাট ইট ইজ ভেরি পেইনফুল টু ন্যারেট। আরো দুএকজন জিগ্যেস করেছে। আই ওয়াজ রিল্যাকট্যান্ট। বাট আই ক্যান টক টু ইউ। আই হ্যাভ এ ফিলিং ইউ উইল ডু জাস্টিস টু হার, টু মি, টু এভরিবডি হু নিউ হার। বলে তিনি 'সুলতান' বইটা হাতে নিলেন। তারপর বললেন, আমি কিছু দূর পড়েছি। কেমন হয়েছে পরে বলব।

এরপর আর একদিন ধানমন্ডির একই রেস্তরাঁয় দুজনে বসেছে। এখানেই আলী লাঞ্চ খেতে আসেন। তার অফিস কাছেই।

ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন, প্যারিসে থাকার জন্য বেশ কয়েক বছর আমি তাকে সাহায্য করেছি। শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে আমি আর খবর রাখি নি। বলতে হয় নভেরাই সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয়। ব্যাংককের পর হংকং, তারপর আমি যখন সিঙ্গাপুরে, তখন সে এসেছে। জাপান যাওয়ার পথে, ফিলিপিন্স্ যাওয়ার পথে। সি লাভ্ড্ টু ট্রাভেল, উইথ এ পারপাজ অব কোর্স। শেষের দিকে খুব বুদ্ধ মূর্তি দেখে বেড়াতো। সাম ওয়ান টোল্ড মি দ্যাট সি বিকেম এ নান ইন এ বুড্ডিস্ট্ টেম্পল সামহোয়ার ইন সুইটজারল্যান্ড। সাউন্ডস লাইক দা হিরোইন ইন দা 'আদার সাইড অব মিড নাইট'। যদি সে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে খুবই ফিটিং এন্ড ফর হার। অলমোস্ট লাইক এ ফেয়ারি টেল। আচ্ছা আর একদিন বসা যাবে। আস্তে আস্তে বলব নভেরার কথা। বলে তিনি হাসলেন।

এরপর আর বসা হয়নি। আটটার সংবাদ শুনতে শুনতে হঠাৎ এস. এম. আলীর মুখটা দেখানো হলো টিভি স্ক্রিনে। কিছু শোনার আগেই হাসনাত প্রায় আর্তনাদের মতো বলে উঠল, মাই গড, হি ইজ ডেড্।

ঠাণ্ডা বাতাস, কবলস্টোনের রাস্তা, শব্দ উঠছে, নানা রকমের জুতো, গোড়ালি পর্যন্ত, প্রায় হাঁটুর সমান, চামড়ার, সিনথেটিক্সের, রাবারের, হাইহিল, পুরু সোল...

লাঠিটা হাতে কাঁপে, হাত কাঁপে লাঠি সত্ত্বেও, মুখের পেশিও কাঁপছে মনে হয়, ঠাণ্ডা বাতাস, শুকনো পাতা উড়ছে, হোটেল দে আভ্যালিডে, যুদ্ধে আহত, বেকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যরা, ভিক্ষে করে, পড়ে থাকে আশ্রয়হীন, শুনে দুঃখ পেলেন সম্রাট চতুর্দশ লুই, ওয়াজ ডিজাইন্ড্ অ্যাজ এ রিফিউজ ফর ওল্ড অ্যান্ড ইন্ভ্যালিড সোলজার্স্ হু ওয়্যার অফেন ফোর্সড্ টু বেগ ফর এ লিভিং, এই হোটেল দে আঁভ্যালিডে, বাগানে ফুল নেই, গাছপালা পত্রহীন, ডিসেম্বর মাস বছরের শেষ, শীত আসছে, হাতে রাখা ছবি কটি পড়ে যেতে চায়, জাপটে ধরি তাদের, আতঙ্ক চেপে বসে...

ঈশ্বর আমাকে বেঁটে করল কেন কে জানে, তার ওপর অভিমান করে আমি উঁচু হই, লম্বা হই, আমার অনেক জুতো, হ্যা সবগুলো দিন, লাল-কালো-শাদা সব আমার পছন্দ। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে বেলি সুর দোকান, জানালায় জুতো, হামিদ একটু থামো, ঐ যে জুতোর দোকানে এক জোড়া সুন্দর জুতো দেখতে পাচ্ছি, বুলেভার মঁপারনাসে লোকের ভিড়। সবাইকে খুশি দেখায়, ক্রিস্টমাস কাছে আসছে, রাস্তায়, দোকানে আলোকমালা জ্বলবে সন্ধ্যায়, স্ট্রসবার্গ সান্দেনিতে আমার এলাকায় সব চুপচাপ, উৎসব নেই, কেউ আসে না এখন, ক্ষিদে পায় খুব, ঠাণ্ডা লাগে গ্রীষ্মেও। আরে কি হলো, কি হলো গাড়িটা এসে পড়ল শরীরের ওপর, চোখে দেখে না মনে হয়, তারপর সব অন্ধকার, হাসপাতালে শুয়ে, ডান পা নড়ে না, ব্যান্ডেজ বাঁধা, হোয়াট, এমপুটেট করতে হয়েছে, হোয়াই, ও হোয়াই, কান্না, দুচোখ বেয়ে কান্না...

কাঁদছিস কেন মা?

বাবা চলে গেল।

সবাই যায়। সময় এলে চলে যায়।

বাবাকে মনে পড়ে খুব। তাকে দুঃখ দিয়েছি।

তোর জন্য বাবার খুব গর্ব ছিল, অনেক আশা ছিল।

সেই জন্যেই দুঃখ।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লোকগুলো ভালো, নাজির ভাই বললেন, সব দেখাবো, চলো তুমি আমার সঙ্গে, স্কাল্পচার শিখতে হলে পুরনো ক্লাসিক্যাল সব কাজ দেখা চাই, আমার সবচেয়ে ভালো লাগে মার্বলে 'সাইক্লাডিস আইডল' রমণীর মূর্তি, খুব সংক্ষিপ্ত দেখতে, মিনিমাম এনাটমি, ইঙ্গিতময়, নাজির ভাই আমার জন্য এত সময় দেন, কৃতজ্ঞতা জানানো হয় না, বড় ব্যস্ত তবু সবার ভিড়ে আমাকে খুঁজে নেন, পিগম্যালিয়নের মতো... আমি এলিজা ডু লিটল নই, তবু তিনি প্রফেসর হিগিন্স্...

ঐ তো পন্ট ডে আঁভ্যালিডে, সিন নদীর বুকে স্টিমার, গান হচ্ছে কি? হ্যা, উৎসবের উল্লাস, উচ্ছ্বসিত মানুষের ভিড়, জীবনে আনন্দ অফুরান, উহ আল্লা, হাঁটতে কেন কষ্ট হয়, শরীরে শক্তি ফুরিয়ে আসছে কেন, আমার তো অসুখ নেই, শুধু পা কেটে ফেলেছে, হাত-পা কাঁপে, মুখের পেশি থরথর করে, মই দিয়ে উঠে স্কাল্পচার করতে পারি না, এখন শুধু ছবি আঁকি, ঘর ভর্তি বড় বড় স্কাল্পচার, এত বড় যে বার করা যাবে না...

সামনে ওটা কি? কি করছে লোকগুলো? কাকে তুলছে ওপরে? বিশাল হরফ পরপর সাজানো, 'হ্যাপি ক্রিস্টমাস, হ্যাপি নিউ ইয়ার,' 'ওয়েলকাম ১৯৮৮,' সিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীর পানি বয়ে যায়, অনেক স্রোত ব্রিজের নিচে চলে যায়, পন্ট ডে আঁভ্যালিডে, পঙ্গুদের ব্রিজ, দারুণ সান্ত্বনা, আহত সৈনিক, সব রকমের যুদ্ধে...

ব্রাসেল্‌স্। সানাউল হক উঠে দাঁড়ালেন, আরে কি ব্যাপার, কত বছর পর দেখা সেই চট্টগ্রামে ১৯৪৯ না ১৯৫০-এ, আর এখন ১৯৭৭। মনেও থাকে না আজকাল, বয়স বাড়ছে তো, বেশ কষ্টে আছ প্যারিসে? দেশে যাও না কেন? বলা হয় না, কবি মানুষ নিজেরই বোঝা উচিত কেন যাই না, উনি যেতেন আমি হলে? দুটো ছবির টাকা, ধন্যবাদ দিই, আরে ধন্যবাদ দিতে হবে না, আমরা প্যাট্রনাইজ না করলে কে করবে? অডিটের জন্য পারি না, ফুল কিনেছি বলে আপত্তি জানিয়েছে, বাজেটে এলোকেশন নেই, টেণ্ডারে জয়নুলের ছবি কিনতে হবে, ভাবতে পারো? প্যারিসে তোমার কদর হওয়া উচিত, এত দিন আছ, সাপের ছবি আঁকছ? ভালো বিষয়, সাপই তো অরিজিনাল সিনের মূল চরিত্র, দারুণ ম্যাটাফর...

পোলানস্কি স্থির হয়ে দাঁড়াও। তোমার হাত নড়ছে, প্লাস্টার লাগাতে সময় নেবে, তোমার জেনিটাল স্বাভাবিক হয়ে আসুক, কোন্ স্ট্যাচুতে অমনভাবে দেখেছ? কি করে বার করব ঘর থেকে? বার করব না, ঘরেই থাকবে তুমি, মানে তোমার ওভার-লাইফ-সাইজ স্ট্যাচু, লার্জার দ্যান লাইফ, আমার আকাঙ্ক্ষা লার্জার দ্যান লাইফ...

সাঁজে লিঁজে গাড়ির স্রোত, মানুষের ঢল, সুখী মানুষ, ব্যস্ত মানুষ, সভ্য মানুষ, কুটিল মানুষ, লোভী মানুষ, সূক্ষ্ম মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, মূর্খ মানুষ, নীচু মানুষ, পাপী মানুষ, সরল মানুষ, বন্ধুবৎসল মানুষ, স্বার্থপরায়ণ ক্রুর মানুষ, সুন্দর মানুষ, কুৎসিত মানুষ, মানুষ, মানুষ, মানুষ, সাঁজে লিঁজে ঢেউয়ের পর ঢেউ, শব্দ শব্দ শব্দ কোলাহল...

রাশেদ সেতার নিয়ে সামনে, সেই কখন থেকে, দাঁড়াও আসছি, কাপড় বদলে আসছি, তুমি বাজাতে থাকো, সুরের গমকে, গমকে জেগে উঠি, বাতাসের তরঙ্গে হালকা হয়ে উড়ি...

হ্যা শাদা শাড়িই, এখন ছাত্রী আমি, সেতার শেখাচ্ছ তুমি, বয়সে ছোট তাতে কি, এখন তো শিক্ষক, শেখাও দেখি! সেতারের তারে জেগে উঠুক বুক ভাঙা সুর, কাঁদতে ইচ্ছে করে... এত... এখন...

সাঈদ তুমি কি হোবোর্নে স্টল থিয়েটারে সেতার বাজাতে যাচ্ছ আজ সন্ধ্যায়? সেতারা বেগম এসেছেন, তাঁর দল নিয়ে ঘুরছেন লন্ডন-প্যারিস। তুমিও যাবে প্যারিস? কবে জানুয়ারি ১৯৫৩? জানুয়ারি খুব শীত, শীতই হলো হলে বসে মিউজিক শোনার সময়, আমিও যেতে পারি, হামিদকে সঙ্গে নেওয়া যায়, কেন যে ও প্যারিস থেকে চলে এল, সেখানে থাকলে আমিও চলে যেতাম, আই লাভ প্যারিস, স্বপ্নের শহর, মনটা উদার, প্রসারিত হয়ে যায়, সুন্দরের চর্চায় সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব, প্যারিস হাতছানি দেয়... আয় আয় আয়...

আলী কি লিখেছে? বেশ বড় চিঠি, সিঙ্গাপুর, মার্চ ১৯৮৫, বিয়ে করেছে চাইনিজ মালয়েশিয়ান। সুখী হোক, ওরা সবাই সুখী হোক, হামিদ কানাডায়, আলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঙ্গাপুরে, পোলানস্কি এই প্যারিসেই, ওর ফরাসি বউটা সুন্দর, একটা দোকান আছে বলেছিল, কীসের যেন? সাঈদ কি এখনো সেতার বাজায়? ওর বউটা কেমন?

আমি বলছি এটা টিউমর।

আমরা বুঝি কিছু জানি না। দুর্নাম করবি সকলের। ছি ছি ছি।

প্লিজ স্টপ, স্টপ। মাই গড।

না বলে উপায় কি? এত বড় পেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস!

মাই গড, মাই গড, তোমরা কি মানুষ না অন্য কিছু?

টিউমর, টিউমর টিউমর, টিউমর।

চ্যাচাস্‌নে। গলা ফাটালেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

মাই গড। হাউ ক্রুয়েল, হাউ ক্রুয়েল। লিভ মি এলোন। লিভ মি এলোন।

মই দিয়ে উঠতে কষ্ট হয় আজকাল, পেটে ব্যথা পাই, আলীকে বললাম, সে বলল ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে--আমার ভয় হচ্ছে যদি অপারেশন করতে বলে, বললাম, মনে হয় না খারাপ কিছু, হয়ত আলসার। আলী বলল, তবু দেখানো ভালো। বলেই দেখি বিপদে পড়লাম, এখন কি করি?

মা ভয় পাচ্ছে, পিঠের ফোড়াটা কাটাতে চান না। সেঁক দিলে ভালো হয়ে যাবে এই বিশ্বাস। আমি জোর করেছি ঢাকায় নিয়ে যাবো, মেডিক্যালে ভর্তি করে দেবো...

আই এম এ প্যারাট্রুপার, কাগজে ছবি, তুমি বাংলাদেশে যুদ্ধে যাবেন। আন্দ্রে মালরোর বয়স কত এই ১৯৭১-এর জুলাইতে? আমার চেয়ে অনেক বেশি। আমারও যুদ্ধে যাওয়া দরকার। ছবি দিয়ে, লেখা দিয়ে যুদ্ধ করব আমি, ওরা আমার আর হামিদের তৈরি শহীদ মিনার ভেঙে ফেলেছে, আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে...

১৯৭২-এ মুর্তজা বশীরের সঙ্গে দেখা বাংলাদেশ অ্যামব্যাসিতে, প্যারিসে বাংলাদেশের ম্যাপ আঁকা অ্যামব্যাসি অফিস, সবুজ উজ্জ্বল সবুজ, কতদিন যাই নি, হঠাৎ কি হোমসিক ফিল করি? মুর্তজা বশীর চিনল, বলল কি করছেন? বড় বড় কাজ করছি। একজিবিশন করবেন না? কি করে করব, এত বড় কাজ যে বার করা যায় না ঘর থেকে। বশীর কি অবাক হয়েছে শুনে? ওর সঙ্গে দেখা ঢাকায় লাহোরে আর আজ প্যারিসে। স্মল ওয়ার্ল্ড...

পোলানস্কি তুমি অমন করছ কেন? তোমাকে আমি কোনো প্রতিশ্রুতি দেই নি। আই হ্যাভ নট বিট্রেড ইউ। একি, গালিগালাজ করছ দেখি? ছি ছি ছি কী সব নোংরা কথা বলছ, না, তোমাকে এমন ভাবি নি। আমি শকড্। দারুণ শকড্। তুমি যাও, প্লিজ লিভ মি...

হ্যা, ফার্নান্ডেজ আমার বন্ধু, আমার বিশেষ বন্ধু। কি বললে? গোয়ানিজ নিগার? ছি ছি। এরপর আর কোনো কথা বলা চলে না। তুমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আছ। তুমি আজ যাও। কাল কথা হবে। আমাকে আর আপসেট করো না। আমার শরীর ভালো নেই। আমাকে একা থাকতে দাও প্লিজ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঁজে লিঁজে, ফুটপাতে টেবিল চেয়ার নেই, ঠাণ্ডা বাইরে। কফিশপের ভেতরে ভিড়, আলো জ্বলে উঠছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। পাতাহীন গাছগুলো ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সুন্দর স্কাল্পচারের আদলে। শীতের গাছের সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা লেখে না কেউ? খুব পবিত্র সুন্দর, শান্ত সুন্দর, নির্জন সুন্দর...

জুনে রিগ্রেটে রিয়ে, আই ডু নট রিগ্রেট, এডিথ পিয়াফ আরো জোরে গাও, জুনে রিগ্রেটে রিয়ে আই ডু নট রিগ্রেট, এডিথ পিয়াফ তুমি যখন মরে গেলে সারা প্যারিস কেঁদেছে, তোমার কোনো অনুতাপ ছিল না, জুনে রিগ্রেটে রিয়ে... ইসাডোরা ডানকান, বা বা ব্ল্যাকবার্ড গানটি বাজছিল ঘরে যখন তুমি মরে গেলে রাস্তায়... কালো স্কার্ফ গলায় পেঁচিয়ে গেল ছুটন্ত গাড়িতে বসে... ছুটন্ত... কালো... বা বা ব্ল্যাকবার্ড...

মামা একটা টিকেট পাঠাও, তোমাদের দেখতে আসব, একটা টিকেট পাঠাও, একটা টিকেট পাঠাও, কাগজটা হাতের মুঠোয় দুমড়েমুচড়ে থাকে, হুল ফোটায়, ছুঁড়ে ফেলি দূরে, মেঝেতে পড়ে আস্তে আস্তে ভাঁজ খোলে, কাগজটা ক্রমেই ফুলতে থাকে, একটা বেড়াল হয়ে যায়, আমাকে দেখে নির্নিমেষে... এক সময় একটা পাখি হয়ে যায় কাগজের টুকরো...

মেট্রোতে ভিড়, বাড়ি ফিরছে মানুষ, সুখী মানুষ, দুঃখী মানুষ, সৎ মানুষ, অসৎ মানুষ, মানুষ, মানুষ... লোকটা একটা ছবি কিনল, হাতের মুঠোয় ফ্রাঙ্কের উষ্ণতা, উষ্ণতা, লোকটিকে দেখি, আমার ছবি তার হাতে, তার ফ্রাঙ্ক আমার হাতে, উষ্ণতা, উষ্ণতা... স্ট্রসবার্গ সান্দেনিতে এসে স্থির... কে তুমি? আহা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক। তরুণীটি হাত ধরে সাহায্য করে। ওপরে উঠে ধন্যবাদ দিই... মের্সি... মের্সি বুক... থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ... মের্সি বকু মাদমোয়াজেল। মেয়েটি বাউ করে চলে যায়...

কাফের ভেতরে গরম, আরাম, আরাম। আমার কোণার টেবিলে কেউ নেই, আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। গার্সোকে কিছু বলতে হয় না, একটু পর কফির পেয়ালা এসে যায়, কালো কফি, নিশ্চল নিস্তরঙ্গ কফি তাকিয়ে আছে। গন্ধ পাই, ধোঁয়া ওঠে, কারা যেন কথা বলে পাশে, হাসির ভাঙা টুকরো, গানের কলি। এডিথ পিয়াফ... জুনে রিগ্রেটে রিয়ে। দাররিয়ে...

কে? কে? পাশের টেবিলে বসল কে? চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি? ওহে ধূসর স্মৃতি সাহায্য করো, মনে পড়তে দাও। শাদা গোঁফ, শাদা-পাকা চুল, বয়স্ক মুখ আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করেছে, শাদা থেকে কালো হচ্ছে, ত্বক ক্রমেই মসৃণ আর ফ্রেস দেখাচ্ছে। খোলস ফেলে বেরিয়ে এসেছে মুখ। রাশেদ নিজাম, নির্ঘাৎ রাশেদ নিজাম, এই... স্ স্ স্ স্-চুপ, চুপ—এত দূর থেকে ডাকা যায় না। ইট ইজ এ টেবিল টু ফার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেড ইন... সন্ধ্যা... নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকায় একটি বাড়ি, মুর্তজা বশীর আর হাসনাত দারোয়ানকে জিগ্যেস করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। বেল টিপতে দরজা খুলে দিল ভৃত্য। ভেতরে বসবার ঘরে আলো জ্বলছে, দেয়ালে পেইনটিং, ইন্দোনেশীয় ফোক আর্ট, কাঠের ময়ূর। ঘরের এক কোণে স্ট্যান্ডের ওপর একটি কাঠের মূর্তি। ন্যাচারাল ব্রাউন রঙ। হাসনাত মূর্তিটির দিকে এগিয়ে গেল, কাছে গিয়ে দেখতে দেখতে বলল—

হাসনাত এটা নভেরার কাজ। ঠিক এ ধরনের একটি মাথার ছবি দেখেছি ম্যাগাজিনে, নভেরা হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বশীর (কাছে এসে) নাকটা বোঁচা, চোখ দুটো সরু। মনে হচ্ছে ট্রাইবাল পুরুষের মাথা। রাশেদ কি করে পেল? খুব পুরনো কাজ হবে।

রাশেদ নিজাম ঘরে ঢুকল। পাজামা কুর্তা পরে, হাতে রূপোর চেইন। দুজনের কাছে এসে বলল

রাশেদ সরি। কাপড় পরছিলাম। কিরীট খানের সেতার শুনতে যাবো। হ্যা, কি বলছিলেন যেন স্কাল্পচারটা সম্বন্ধে?

হাসনাত : নভেরার?

রাশেদ (মূর্তির দিকে তাকিয়ে) হ্যা, নভেরার। আমার খুব প্রিয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, এখান থেকে ইন্দোনেশিয়া, সেখান থেকে ইংল্যান্ড। আবার চট্টগ্রাম। আই অ্যাম ভেরি অ্যাটাচ্ড্ টু ইট।

বশীর কোথায় পেয়েছিলেন।

রাশেদ (সাইড টেবিলের ল্যাম্প জ্বেলে মূর্তিটাকে উজ্জ্বল করে দিয়ে) চট্টগ্রামেই। ১৯৫০-এ যখন নভেরা বাড়িতে কাঠ দিয়ে নানা ধরনের মূর্তি বানাতো। আমি গিয়ে বসে থাকতাম। আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। চাইতেই দিয়ে দিল। (তারপর হেসে) তার বিনিময়ে অবশ্য তাকে সেতার শেখাতে হয়েছিল।

বশীর কবে? সেই ১৯৫০ সালে?

রাশেদ না, ঢাকায় ১৯৫৮ সালে, নভেরা লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর। আমি তখন এস এম হলে থাকি। প্রায়ই যেতাম পাবলিক লাইব্রেরিতে তার কাজ দেখতে। নভেরা তখন তেজগাঁওয়ে একটা স্টুডিও ভাড়া করেছে। সেখানেই সেতার শেখাতাম।

হাসনাত নভেরা আপনাদের আত্মীয় ছিলেন। কেমন আত্মীয়?

রাশেদ কাজিন সিস্টার, ফুপাতো বোন। তার আরো তিন বোন ছিল। বাট সি ওয়াজ আওয়ার মোস্ট ফেভারিট।

হাসনাত : আওয়ার?

রাশেদ আওয়ার মানে আমার আর রসুল নিজামের।

হাসনাত তার কোনো খবর রাখেন আপনারা? এখন কোথায় আছেন?

রাশেদ ফানি। এই প্রথম কেউ তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখালো। মনে হয় সবাই তাকে ভুলে গিয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ভাস্কর, অথচ তার কাজগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অযত্নে, অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোথায় কোথায় আছে তাও কেউ ঠিক করে বলতে পারে না।

হাসনাত : আপনারা কিছু করেন না কেন?

রাশেদ আমরা, আমরা কি করব? মিউজিয়ম, শিল্পকলা একাডেমী রয়েছে কেন? তাদের কিছু করা উচিত। আওয়ার ন্যাশনাল হেরিটেজ, ট্রেজার। ট্রাডিশনের প্রতি এত অবহেলা কেন এই দেশে? কিছু মনে করবেন না, যদিও আমি এদেশেরই, তবু বহু বছর বিদেশ থেকে এসেছি। এসব খুব চোখে পড়ে, মনকে বিষণ্ন করে। ভেরি স্যাড।

(রাশেদ সোফায় বসে। হাসনাত আর বশীর তাকে অনুসরণ করে)

রাশেদ লন্ডনে থাকতে তার ঠিকানা বার করার খুব চেষ্টা করেছি। প্যারিসে বাংলাদেশ অ্যামব্যাসি থেকে জানিয়েছে মিড সেভেনটিজ পর্যন্ত তারা খবর রাখত, তারপর থেকে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। আরো অনেক বাঙালিকে জিগ্যেস করলাম। তারাও কিছু বলতে পারে না। প্রথমে মনে হলো সে প্যারিসে নেই। তারপর ভাবলাম প্যারিস ছাড়া একমাত্র দেশে যেতে পারে, কিন্তু সেখানে যখন যায় নি তখন প্যারিসেই আছে।

বশীর (পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে) অন্য কোনো দেশে যেতে পারত?

রাশেদ : নট অ্যাট হার এজ। নতুন দেশে গিয়ে সেটল করা কঠিন। আপনি তো আর্টিস্ট, বুঝতেই পারেন কেন।

বশীর : সেটা ঠিক।

হাসনাত : তারপর?

রাশেদ ১৯৮৭ সালে আমি কাজের কাজে প্যারিস যাই। কাজ শেষে দুদিন খুব ঘুরলাম। খুঁজলাম নভেরাকে। যেখানে শিল্পীরা থাকে, আড্ডা দেয়, মঁ পারনাস, মঁমার্ত, লেফ্‌ট্ ব্যাঙ্ক সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। শেষে একজন স্ট্রসবুর্গ সান্দেনিতে গিয়ে খোঁজ নিতে বলল। সেখানে ডাউন অ্যান্ড আউট শিল্পী-সাহিত্যিকরা থাকে।

বশীর হ্যা, ওটাও প্যারিসে। শিল্পীদের একটা প্রিয় এলাকা, খুব অভিজাত না, কিন্তু সস্তা আর ফ্রেন্ডলি। আমি গিয়েছি। আপনি গেলেন সেখানে?

রাশেদ হ্যা। গেলাম। একটা গোঁ চেপে বসেছে, নভেরাকে খুঁজে বার করতে হবে। জিগ্যেস করলাম কয়েকজনকে। কিছু বলতে পারে না। শেষে একজন বলল, ঐ যে কাফে ব্ল্যাঙ্ক, ওখানে দেখতে পারো। একজন বয়স্কা ওরিয়েন্টাল মহিলা প্রায়ই বসে থাকেন।

গেলাম কাফে ব্ল্যাঙ্কে। বিশ্বাস করবেন না, গিয়েই দেখা হলো নভেরার সঙ্গে। রিয়েল ড্রামেটিক। এক কোণায় বসে আছে একা, সামনে কফির কাপ। টেবিলের পাশে ওয়াকিং স্টিক। নভেরাকে প্রথম দৃষ্টিতে চেনা যায় না। বয়স হয়ে গিয়েছে বলে শুধু না, মাথার চুল শাদা হয়ে এসেছে, সেটাও কারণ না। ওকে চিনতে পারি নি তার বেশভূষার জীর্ণতা দেখে। বোঝাই গেল খুব আর্থিক কষ্টে আছে। এক দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে বসে ছিল। টেবিলে কয়েকটি কাগজ, সে একবার ঘুরে তাকালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত : আপনাকে চিনল?

রাশেদ মনে হয় না। চিনলে তো নাম ধরে ডাকত।

বশীর আপনি কি বললেন তাকে? কিভাবে শুরু করলেন আলাপ?

রাশেদ আলাপ করি নি, কোনো কথাই বলি নি। শুধু দেখলাম বসে বসে।

হাসনাত কেন? যাকে খুঁজে বার করলেন এতদিন পর, এত চেষ্টা করে, তার সঙ্গে কথা বললেন না কেন?

রাশেদ আই ওয়ান্টেড হার টু ফেড অ্যাওয়ে উইথ ডিগ্‌নিটি। সি ওয়াজ এ প্রাউড ওম্যান।

বশীর (অভিভূত হয়ে) আপনি একজন আর্টিস্ট। শুধুমাত্র একজন আর্টিস্টেরই থাকে এই অনুভূতি।

রাশেদ (আস্তে আস্তে) আর্টিস্ট? এককালে সেতার বাজাতাম। নভেরার সেতার শেখার শখ ছিল। খুব বড় বড় স্কাল্পচার করতে চেয়েছিল। লার্জার দ্যান লাইফ।

বলতে বলতে সে কোণের মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আপন মনে বলে, লার্জার দ্যান লাইফ।

ফেড আউট...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশের শহীদ ও স্মৃতির মিনার

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির সাধনা ও সংগ্রাম বা ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতীক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার যা গৌরবের সাথে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। কিন্তু এ-শহীদ মিনারেরও একটা ইতিহাস আছে, যে ইতিহাস ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, জয়-পরাজয়ের ইতিহাস। বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারির ত্রিশ বছর পুরো হওয়ার আগেই অনেক বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে শহীদ মিনারের ইতিহাস নিয়ে। বিরাশি সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষার জন্যে, মাতৃভাষার জন্যে বাঙালির রক্তদানের ত্রিশতম বার্ষিকী, সে দিনটি আসার আগেই তুলে ধরতে চাই শহীদ মিনার সম্পর্কে যথার্থ তথ্যাবলি যাতে আগামী শহীদ দিবসে কোনো বিভ্রান্তি না থাকে শহীদ মিনারের ইতিহাস নিয়ে।

বাংলাভাষার জন্যে বাঙালি রক্ত দিয়েছিল বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে, রক্ত দিয়েছিল বাইশে ফেব্রুয়ারি পুরাতন হাইকোর্ট ও কার্জন হল মধ্যবর্তী রাস্তায়, নবাবপুর রোডে, বংশাল আর রথখোলার মোড়ে। একুশের শহীদ আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, সালাউদ্দিন ও নাম-না জানা কিশোর, বাইশে ফেব্রুয়ারির শহীদ শফিউর রহমান, রিকশাচালক আউয়াল এবং নাম-না-জানা আরো দুজন, এদের কারো লাশ সেদিন আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা পায় নি। নিহতদের কবর দেয়া হয়েছিল গোপনে রাতের আঁধারে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু বরকত ও শফিউর রহমান ছাড়া আর সবার কবর হারিয়ে গেছে সেদিনের স্বৈরাচারী শাসকের চক্রান্তে। সেদিন স্লোগান সৃষ্টি হয়েছিল 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' কিন্তু শহীদ স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্যে প্রতীক চাই। তাই সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উদয় হয়েছিল শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ বা শহীদ মিনারের স্বপ্ন। আর সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল বায়ান্ন'র তেইশে ফেব্রুয়ারি রাতারাতি। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম কর্মী আহমদ রফিকের ভাষায় প্রথম শহীদ মিনার 'এক আকস্মিক চিন্তার যৌথ ফসল, তেমনি এর সমাপনও সমষ্টিগত শ্রমের এক আশ্চর্য ফসল।'

প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ সম্পর্কে বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের মেডিক্যাল কলেজের অপর কর্মী সাঈদ হায়দার লিখেছেন, "এটাকে স্বতঃস্ফূর্ত একটা পরিকল্পনা বলা চলে। দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্র শহীদ মিনার তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারির রাত থেকেই শহীদ মিনার তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আর ২৩ শে ফেব্রুয়ারি থেকে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু হয়। ২৩ তারিখ বিকেল থেকে শুরু করে সারারাত সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ হয় (কার্ফু থাকা সত্ত্বেও) ...ইট-বালির কোনো অভাব ছিল না। মেডিক্যাল কলেজ সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর ইট-বালি ছিল। ছাত্ররাই ইট বয়ে এনেছে। বালির সাথে সিমেন্ট মিশিয়েছে। দুজন রাজমিস্ত্রী ছিল। তাদের নাম বলতে পারব না। আমাদের মেডিক্যাল হোস্টেলে প্রায় তিনশ ছাত্র ছিল। তাদের সকলেই সেদিন কোনো-না-কোনো কাজ করেছিল। আর শহীদ মিনারের নকশা তৈরি করেছিলাম আমি। শহীদ মিনারের কাজ শেষ হলে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল এবং নকশাটি সেখানেই টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিল। ...শরফুদ্দীন (তাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ার বলতাম। সে ভালো অঙ্ক জানত...) শহীদ মিনার নির্মাণের কাজে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিল। এছাড়া মাওলা, হাশেম, জাহেদ, আলিম, জিয়া আরো অনেকে শহীদ মিনার নির্মাণে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। এছাড়া ছিল আমাদের অনেক বয়-বেয়ারা। এরাই ছিল সেদিনকার বড় কর্মী। নকশায় সাড়ে নফুটের পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ করার পর দেখা গেল মূল পরিকল্পনাকে তা ডিঙিয়ে গেছে। মিনারটি সম্ভবত ১১ ফুট তৈরি হয়েছিল। বদরুল আলমও মিনার নির্মাণে সাহায্য করেছিল। তার হাতের লেখা ছিল চমৎকার। কাগজে লিখে মিনারের গায়ে সেঁটে দিলে মর্মর পাথরের মতো দেখাতো। আজকের শহীদ মিনার যেখানে, প্রায় তার কাছাকাছি মিনারটি তৈরি করা হয়েছিল। ...শহীদ শফিউর রহমানের পিতাকে এনে ২৪শে ফেব্রুয়ারি মিনারটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। আমি সেখানে ছিলাম। পরবর্তী সময়ে আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেব নাকি উদ্বোধন করেছিলেন। তবে তা হয়ত আরো আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখার জন্য কালাম সাহেবকে দিয়ে পুনরায় উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে থাকবে।..."

সাইদ হায়দারের নকশায় ও বদরুল আলমের রেখায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারটি ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ শফিউর রহমানের পিতা আর ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে আবুল কালাম শামসুদ্দিন উদ্বোধন করেছিলেন এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালের মধ্যেই এ-মিনার হয়ে উঠেছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক তীর্থকেন্দ্রে। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার কালো হাত এটা মেনে নিতে পারে নি। তাই ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি দুপুর ও সন্ধ্যাবেলার মধ্যেই নাজিমুদ্দিন-নূরুল আমিনের সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশে বাঙালির প্রথম শহীদ মিনারটি আক্ষরিক অর্থে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু তারা জানত না যে এর মধ্যেই বাঙালির হৃদয়ে যে স্মৃতির মিনার গাঁথা হয়েছিল তা নিশ্চিহ্ন করার শক্তি কোনো শাসকের নেই, আলাউদ্দিন আল আজাদের ভাষায় "স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার?... ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা চারকোটি কারিগর... রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।" তাই তিপান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন, ঊনষাট, ষাট, একষট্টি, বাষট্টি—দশটি বছরের প্রথম তিনটি বছর নিশ্চিহ্ন মিনারের কাপড় ঘেরা স্থানটি আর বাকি সাতটি বছর শহীদ মিনারের জন্যে স্থাপিত ভিত্তিটিই ছিল এদেশের মানুষের শহীদ মিনার, তিপ্পান্ন থেকে তেষট্টি প্রতিটি সংগ্রামে বাঙালি শপথ নিয়েছে ঐ স্মৃতির মিনারে, যা বাঙালিকে দিয়েছে অবিরাম সংগ্রামের অন্তহীন প্রেরণা। চুয়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে 'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর' 'যুক্তফ্রন্ট' একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতীক একুশ দফায় শহীদ মিনার নির্মাণ, একুশকে শহীদ দিবস ঘোষণা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা ঘোষণা ও নূরুল আমিনের সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমী করার শপথ নিয়ে বিজয়ী হয়েছিল। চুয়ান্ন সালের ২ এপ্রিল গঠিত হয়েছিল শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে সে সরকার পঁয়তাল্লিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের বেশি স্থায়ী হতে পারে নি, শেরে বাংলাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মুহাম্মদ আলি যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়েছিলেন। ঐ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করলেও তা কার্যকর করে যেতে পারে নি। পঞ্চান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে সরকারি ছুটি বাতিল করা হয়, বাধা দেয়া হয় শহীদ দিবস পালনে, শহীদানের কবর ও শহীদ মিনারে যেতে।

যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গিয়েছিল, কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন পঞ্চাশ সালের আগস্ট মাসে আর ক্ষমতায় ছিলেন ছাপ্পান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৎসরাধিককাল, সে সময়ে পূর্ব বাংলায় বিরোধী দল মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ক্ষমতায় এসেছিলেন ছাপ্পান্ন সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর এবং ক্ষমতায় ছিলেন আটান্ন সালের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত। আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খানের মুখ্য মন্ত্রিত্বের সময় অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের আমলে যথাক্রমে 'শহীদ মিনার'-এর ভিত্তি ও মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমান শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল আবু হোসেন সরকারের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। শহীদ মিনারে স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে 'দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ লেখা হয়, "এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছিল যে পূর্ত সচিব (মন্ত্রী) জনাব আবদুস সালাম খান মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে 'শহীদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য চূড়ান্তভাবে একটি স্থান নির্বাচন করিয়াছেন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া উহা 'যত সত্বর সম্ভব সরকারের বিবেচনার পেশ করার জন্য' সরকারি স্থপতিকে নির্দেশ দিয়াছেন।"

পূর্ত মন্ত্রী কর্তৃক শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন এবং পরের দিন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন তদারক করার সংবাদটিতে প্রচার হয়ে পড়ে যে "রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের যে স্থানটিতে পুলিশের গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত নিহত হয়েছিলেন সেখানে সরকার রাতারাতি একটি 'শহীদ মিনার' গড়িবার আয়োজন করিতেছেন। খবরটি প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট জনতা ঘটনাস্থলে ভিড় জমাইয়া দেখিতে পায় যে জনৈক মন্ত্রী প্রস্তাবিত মিনারটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জনতা ইহাতে প্রবল আপত্তি জানায়... ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রিকশাচালক আওয়ালের ৬ বছর বয়স্কা কন্যা বসিরনকে দিয়া জনতা ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করায়।" ...এভাবে ছাপ্পান্ন সালের বিশে ফেব্রুয়ারি রাতে জনতা বায়ান্নর শহীদ আওয়ালের কন্যা বসিরনকে দিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করায়।

এদিকে ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে এই মর্মে পূর্ববঙ্গ সরকারের একটি প্রেস নোট প্রকাশিত হয় যে, "অদ্য ১টায় মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন।" এছাড়া আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পূর্ব বাংলায় 'সরকারিভাবে' প্রথম 'শহীদ দিবস' পালন এবং 'দিবস'টিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে বর্তমান শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করা হয় এবং তা করেন পূর্ব বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মাতা হাসিনা বেগম। ঐ প্রসঙ্গে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় ছাপ্পান্ন সালের তেইশে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত প্রতিবেদন, "সকাল ৯টায় পবিত্র কোরান তেলোয়াতের পর মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের পার্শ্বে মওলানা ভাসানী, প্রধানমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার ও শহীদ বরকতের মাতা যুক্তভাবে 'শহীদ মিনার'-এর পার্শ্বে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে জনাব আবু হোসেন সরকার জুতা পায়ে আগমন করিলে উপস্থিত ছাত্র-জনতার মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত জনাব সরকার জুতা খুলিতে বাধ্য হন।" এভাবেই ছাপ্পান্ন সালের বিশে ফেব্রুয়ারিতে এবং একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে মওলানা ভাসানী, আবু হোসেন সরকার ও শহীদ বরকতের মাতা হাসিনা বেগম আনুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পূর্তমন্ত্রী আবদুস সালাম খান কর্তৃক শহীদ মিনারের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যত সত্বর সম্ভব সরকারের কাছে পেশ করার জন্যে সরকারি স্থপতিকে নির্দেশদানের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আবু হোসেন মন্ত্রিসভার আমলে শহীদ মিনারের পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের কাজ আর বিশেষ অগ্রসর হয় নি। ছাপ্পান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টির মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান পূর্ব বাংলায় প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেন। আওয়ামী লীগ চৌদ্দ মাস অর্থাৎ আটান্ন সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ সময়ে শহীদ মিনারের কাজ বেশ অগ্রসর হয়েছিল এবং সাতান্ন সালের তেসরা এপ্রিল আইন সভায় 'বাংলা একাডেমী অ্যাক্ট ১৯৫৭' পাস হয়। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় সাতান্ন সালের দশই আগস্ট আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে।

আতাউর রহমান খানের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে শহীদ মিনারের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে তদানীন্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার এম. এ জব্বার-এর ওপরে। ছাপ্পান্ন সালের শরৎকালে শিল্পী হামিদুর রহমান শিল্পকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা সমাপন করে ইংল্যান্ড থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার জব্বার এবং শিল্পী জয়নুল আবেদিন তাঁকে অনুরোধ জানান শহীদ মিনারের জন্যে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে। তাঁদের অনুরোধ অনুযায়ী শিল্পী হামিদুর রহমান শহীদ মিনারের একটি মডেল এবং বায়ান্নটি নকশা ও পরিকল্পনার কাগজপত্র পেশ করেন।

রফিকুল ইসলাম

'দৈনিক সংবাদ'-এ প্রকাশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেরার বোন কুমুমের কথা

আমি কুমুম হক। স্কাল্পট্রেস নভেরার বড় বোন। সুদূর প্রবাস, অস্ট্রেলিয়া থেকে এই চিঠিখানি লিখছি। আশা করি আপনার সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় চিঠিখানা ছাপাবেন।

আপনাদের ১৯৯৪ সালের ঈদ সংখ্যা বিচিত্রায় সাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাইয়ের লেখা 'নভেরা' উপন্যাসটি পড়েছি।

লেখক এই উপন্যাসটি লেখার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে প্রথম বাঙালি স্কাল্পট্রেসের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আসল কথা হচ্ছে, আমার মতে হাসনাত সাহেবের লেখা 'নভেরা'কে কোনোমতে উপন্যাস বা উপাখ্যান বলা যেতে পারে না তার কারণ, এর প্রধান চরিত্র ও পার্শ্ব চরিত্রগুলো খুবই বাস্তব। তিনি সব ঘটনাগুলোকে যথাসম্ভব বাস্তবরূপে দেয়ার চেষ্টা করেছেন; তাই আমি বলব এটা নভেরার আংশিক জীবনী। এই আংশিক জীবনীতে বর্ণিত অনেক ঘটনায় ভুল আছে। ভুলগুলোকে সংশোধন না করলে নভেরার প্রতি অবিচার করা হবে। সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় কেউ কেউ অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার ও আমার স্বামীর নামে মিথ্যা দোষারোপ করেছেন। তাই ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের উদ্যোগ নিচ্ছি। আশা করি আপনারা ও হাসনাত সাহেব আমার বর্ণিত প্রমাণসহ সত্য ঘটনা যাচাই করে গ্রহণ করলে খুবই বাধিত হবো। এক দুর্ঘটনা এই চিঠিখানা লিখতে অনেক দেরি করিয়ে দিল। ঈদের পরই সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে নাকের হাড় ভেঙে যাওয়াতে অনেক কষ্ট পেয়েছি এবং লেখাপড়ার জন্য অনেক দিন চশমা ব্যবহার করতে পারিনি। তাই দেরি করে এই চিঠি দেয়ার জন্য আশা করি মাফ করবেন।

AMARBOI.COM

নভেরার জীবনের সব ঘটনা আমার জানা নেই। প্রধানত ও যখন প্রবাসে ছিল তখনকার ঘটনা আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। ১৯৫১ সালে আমার স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় যাওয়ার সময় এবং ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে দেশে ফেরার সময় লন্ডনে কয়েকদিন মাত্র ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সব ঘটনা জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ও এইটুকু বলেছিল যে, নাজির সাহেব ও হামিদুর রহমান ওর স্কাল্পচার শেখার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন।

যাই হোক, এরপর সাক্ষাৎকারে বর্ণিত যে সব ঘটনা আমার জানা মতে সত্য নয়, তা আপনাদের জানাচ্ছি।

প্রথম ভুল দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ পৃষ্ঠায়–আমার বাবা দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লায় বদলি হন ১৯৪৭ সালে। আর নভেরার বিয়ে হয় ১৪ বছর বয়সে আমার বিয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক বছর পর এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে, কলকাতায়, দেশ ভাগ হওয়ার অনেক আগে। বিয়েতে নভেরা আপত্তি করেছিল, কিন্তু বাবার পীড়াপীড়িতে রাজি হয়। আক্দ হওয়ার ৪/৫ মাস পর ওর মত বদলে যায় এবং সম্প্রদান বা রুসমত ছাড়া বিয়ে ভেঙে যায়। কাজেই মাহবুব সাহেবের মতে নভেরা ১৯৪৭ সালে, কুমিল্লায় তার হবু বরের সাইকেলের পেছনে বসে ঘুরেছে এবং পরে তাদের বিয়ে হয়েছে মোটেই সত্য নয়। মাহবুব সাহেব তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্বেও একই কথা বলেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ পর্বে—সাঈদ সাহেবের মতে নভেরা লন্ডনে পালিয়ে যায় She fled from her failed marriage—তাও ঠিক নয়। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি ওর বিয়ে হয় এবং সে বছরের শেষের দিকে ডিভোর্স হয়। কিন্তু ও লন্ডন যায় ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি, স্কাল্পচার শেখার জন্য, তা ডিভোর্স হওয়ার প্রায় সাড়ে চার বছর পর। তাই সাঈদ সাহেবের বর্ণনায় কোনো সত্যতা নেই।

দ্বিতীয় ভুল তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৯ পৃষ্ঠায়—মাহবুব সাহেবের বর্ণনা মতে, আশকার দীঘির পাড়ের 'গডস্ গিফট' বাড়িটা নভেরার বড় বোন কুমুম হকদেরই ছিল। মাহবুব সাহেবের বলার ভঙ্গিতে মনে হয়, বাড়িটা কুমুম হকদের নিজস্ব সম্পত্তি। আসলে ঐ বাড়িটা পূর্ব পাকিস্তানের সেচ বিভাগের ভাড়া করা বাড়ি এবং অফিস-কাম-রেসিডেন্স ছিল কর্ণফুলী প্রজেক্টের জন্য। ১৯৪৮ সালে আশকার দীঘির পাড়ে আমার বাবা বাড়ি তৈরি করার পর ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ভাড়া দেয়া ছিল এক বিদেশী স্টিমার এজেন্সির কাছে। কিন্তু নভেরা ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি লন্ডনে চলে যায়। কাজেই লন্ডনে যাওয়ার আগে ও বাড়িতে নভেরা ছিল না। অনেক পরে পেছনের জায়গায় বাবা আর একটা বাড়ি করে তাতে থাকেন। ১৯৫৩ সালের পর সামনের বাড়ি চাইনিজ রেস্টরেন্টের জন্য ভাড়া দেয়া হয়।

তৃতীয় ভুল : সপ্তম অধ্যায়ের ৫৭ পৃষ্ঠায় ১৯৫৩ সালের এক সময় আমরা দেশে ফেরার জন্য লন্ডনে আসি। ৩/৪ দিন পর আমার সেজো বোন পেয়ারে ও তার স্বামী আলম সাহেবসহ একটা পোলিশ জাহাজে, নাম 'বাটোরী,' দেশে ফেরার জন্য রওনা হই। আগে এই জাহাজটা আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে চলত। কিছু বেআইনি কাজ করার জন্য আমেরিকান সরকার আটক করার চেষ্টা করলে ইউরোপ ও এশিয়া রুটে চলতে থাকে। ঐ স্টিমারে বাচ্চাদের ড্রেস এজ ইউ লাইক প্রতিযোগিতায় আমার মেয়ে প্রথম পুরস্কার পায়। পেয়ারে তার একখানা দামি শাড়ি কেটে ওর ড্রেস তৈরি করে। সেই ফাংশনের একটা ছবিতে জাহাজের ক্যাপ্টেইন, আমার মেয়ে ও পেয়ারে আছে। এতে বোঝা যাচ্ছে পেয়ারে মি. আলম ও আমরা একসঙ্গে জাহাজে এদেশে ফিরেছি। সেই ছবি এখনো আমার কাছে আছে। এর প্রমাণ হচ্ছে পেয়ারে এয়ার লাইনে আসে নি। লন্ডন ছেড়ে আসার সময় নভেরা বলে যে পেয়ারে চলে যাওয়াতে লন্ডনে থাকা ওর পক্ষে কষ্ট হবে। তা শুনে নভেরাকে তার পড়া শেষ করার জন্য মাসে মাসে বিশ পাউন্ড সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিই এবং তা পালন করেছি। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা সব ভাইবোনরা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহায়ক। ছোট বোন তাজিয়া লেখাপড়া ও চাকরি করার সময় ঢাকায় আমার কাছে প্রায় ৭/৮ বছর ছিল। তাই সাঈদ সাহেবের লন্ডন এয়ারপোর্টে গিয়ে পেয়ারে ও তার স্বামীকে বিদায় দেয়ার বর্ণনায় কোনো সত্যতা নেই। বিদায়ের সময় নাজির সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সাঈদ সাহেব তখন লন্ডনে ছিলেন কিনা আমার মনে নেই। কিন্তু আসার সময় হামিদ ও সাঈদ সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ ভুল এগার অধ্যায়ের ৭৩ পৃষ্ঠায় ও ৭৪ পৃষ্ঠার প্রথমে। সাঈদ সাহেবের বর্ণনায় বলা হয়েছে—কুমুম হক তার স্বামীকে নিয়ে আওলাদ হোসেন লেনে এসে নভেরার সঙ্গে দেখা করে অনেকক্ষণ গল্প করল, দুপুরে খেলো। পরে এক সময় কুমুম হক আপনজনের বাসায় না উঠে আওলাদ হোসেন লেনে থাকার জন্য অনুযোগ করে। এই বর্ণনায় বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। তার কারণ, আমার স্বামী ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসাবে কুষ্টিয়ায় বদলী হওয়াতে আমরা ওখানে চলে যাই। সেচ বিভাগের রেক্টর ও প্রাক্তন ফাইনান্স সেক্রেটারি এবং ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থমন্ত্রী মি. কফিলউদ্দিন মাহমুদ হচ্ছেন এর প্রধান সাক্ষী। কারণ, সেই সময় তিনিও ডিসি হয়ে কুষ্টিয়ায় বদলি হন। মিসেস মাহমুদ ও আমরা কয়েকজন মিলে কুষ্টিয়ায় মহিলা সমিতি আরম্ভ করি। কিন্তু নভেরা ঢাকায় আসে ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে। ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে যখন ও তেজগাঁয়ে সাবেক ডিএলআর সৈয়দ আবদুল মজিদ সাহেবের বাড়ির নিচের তলা ভাড়া নেয়, তখন আমার ৬ বছরের মেয়েকে ওর কাছে পাঠাই—কারণ, কুষ্টিয়ায় ওর পড়াশোনার অনেক ক্ষতি হচ্ছিল। আর হলিক্রস স্কুল ঐ বাড়ির খুব কাছে। মেয়ে আগেও ঐ স্কুলের ছাত্রী ছিল।

১৯৫৭ সালের শেষের দিকে কর্ণফুলী হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্পের কাজে গোলযোগ হওয়াতে আমার স্বামীকে সরকার প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসাবে টেলিফোনিক অর্ডারে বদলি করেন এবং দুদিনের মধ্যে কাপ্তাই পৌছুবার জন্য বলেন। তাই আমরা কুষ্টিয়া থেকে সোজা কাপ্তাই চলে যাই। কাপ্তাইয়ের কাজ যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে আমার স্বামীকে উপকূল বাঁধের চিফ ইঞ্জিনিয়ার করে ঢাকায় বদলি করেন। আমার ঢাকায় যাওয়ার অনেক আগে ১৯৫৮ সালের প্রথমদিকে 'মার্শাল ল' চালু হওয়ার কয়েক মাস পরে নভেরা লাহোর চলে যায়। কাজেই নভেরার ঢাকা থাকা অবস্থায় আমার বাসায় না থেকে অন্য জায়গায় থাকার অনুযোগ করার বর্ণনা সত্য নয়। আমার স্বামীর বদলির রেকর্ড সেচ বিভাগে পাওয়া যাবে। ঢাকায় নভেরার কার্যকর্ম সম্বন্ধেও আমার জানা নেই।

পঞ্চম ভুল তের অধ্যায়ের ৮৮ পৃষ্ঠার মাঝামাঝি আমার ভাইয়ের বউ লুৎফুন নাহারের বর্ণনায় অনেক, ভুল বলব না, স্বয়ং ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কাহিনী আছে। তার কারণ, যে আমার ভাইয়ের বউ হিসাবে আমাদের পরিবারের সঙ্গে প্রায় ৪২ বছর আছে তার বর্ণনায় আমাদের পরিবারের খবর সম্বন্ধে ভুল থাকার কথা নয়। আমি কুমুম হক—পরিবারের ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় এবং শরিফা (পেয়ারে) মেজো মেয়ে। এ অবস্থায় লুৎফুন নাহার আমাকে বানিয়েছে সেজো বোন।

নভেরার সঙ্গে তার বিয়ে সম্বন্ধে লুৎফুনের আলাপ না হতে পারে, কিন্তু নভেরার সঙ্গে যে এতই অন্তরঙ্গতার দাবি করছে তার জীবনের এত বড় ঘটনা সম্বন্ধে ৪২ বছরের মধ্যে না জানার কোনো যৌক্তিকতা নেই। নভেরার বিয়ে সম্বন্ধে, আর কেউ না হোক, লুৎফুনের স্বামী শাহরিয়ারের কাছ থেকে ঠিক খবর না জানার কোনো কারণ নেই। আমার বাবা কুমিল্লায় বদলি হওয়ার পর সেখানে নভেরার বিয়ের ভুল খবরটা যদি অন্য কারো কাছ থেকে পেয়ে থাকে, বাড়ির বউ হয়ে এত বছরেও সঠিক খবর না জানার কারণ কি? তাই বলি ওর সব বর্ণনাই ইচ্ছাকৃত বানানো মিথ্যা কাহিনী। তার বর্ণনার শতকরা ৯৯ ভাগ মিথ্যা। ওর নিজের বিয়ে সম্বন্ধে যা বলেছে কেবল তাই সত্য।

আগেই বলা হয়েছে 'গডস্ গিফট্' বাড়িটা শফিকুল হকের বাড়ি নয়। ওটা সেচ বিভাগের ভাড়া করা বাড়ি। শফিকুল হক ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় বদলি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। কাজেই সেই বাড়িতে ১৯৫০ সালে আমার বাবা বদলি হওয়ার পর থাকার কোনো কথাই ওঠে না। তিনি আন্দরকিল্লায় বাসা ভাড়া করেছিলেন। আর ঐ অল্প বয়সে কলেজে পড়ার সময়, লুৎফুনের স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে এত জ্ঞান কি করে হলো? চট্টগ্রাম কলেজে সেই সময় বিএ ডিগ্রির সাথে স্থাপত্যবিদ্যাও শেখানো হতো বলে মনে হয় না। লুৎফুনের এও জানা উচিত ছিল—ঐ বাড়ির জায়গা রাস্তার দিকে ২৮ ফুট চওড়া এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০ফুট। রাস্তার দিক থেকে শেষ প্রান্ত প্রায় ৭/৮ ফুট নিচু আর পলিভর্তি ডোবা। পৌর আইন অনুযায়ী রাস্তার দিক থেকে দশ ফুট ছেড়ে এবং এক পাশে লম্বালম্বি চার ফুট এবং অন্যদিকে রাস্তার জন্য ৬ ফুট বাদ দেয়ার পর বাড়ির জন্য জায়গা ছিল মাত্র ১৮′ বাই ৪০′। ১৯৪৮ সালে ঐ বাড়ি তৈরি করার সময় কনক্রিটের জন্য কোনো লোহার রড পাওয়া যেত না। কেবল ট্রাকের চেসিস দিয়ে বিম্ ও যুদ্ধের সময় সামরিক এয়ারপোর্টে ব্যবহৃত ফুটাওয়ালা লোহার শিট দিয়ে ছাদ তৈরি করা হতো। ঐ সময়ে স্বল্প পরিসর জায়গায় ওর থেকে ভালো আড়াই তলা বাড়ি ডিজাইন করা সম্ভব ছিল না। ঐ রকম ফুটাওয়ালা লোহার শিট দিয়ে ঢাকার আজিমপুরে পুরনো কলোনির বাড়ি তৈরি হয়েছিল। শফিকুল হকের ওপর লুৎফুনের এত বিরূপ মনোভাব কেন? সে তো আমাদের পরিবারের সবার উপকার ছাড়া কারো ক্ষতি করে নি। নভেরার জীবনী সম্বন্ধে সাক্ষাৎকারে শফিকুল হকের স্থাপত্যশিল্পের জ্ঞান নিয়ে মন্তব্য করায় মনে হচ্ছে এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া।

ষষ্ঠ ভুল তের অধ্যায়ের ৮৭ পৃষ্ঠায়—নভেরা ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি ঢাকায় আমার বাসা হয়ে লন্ডনে যায়। আর আমার স্বামী সরকারি স্কলারশিপে ১৯৫১ সালের জুন মাসে লন্ডন হয়ে এমএস পড়তে আমেরিকায় যায়। আমার স্বামীর খরচে, আমার এক বছরের মেয়েকে নিয়ে, আমিও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পড়ার জন্য আমার স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় যাই। এখানে এও বলা দরকার যে আমার স্বামী ৪৫০ টাকা বেতনের সিপিডব্লিউডি'র চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৪৬ সালে বাংলার সেচ বিভাগের সিনিয়র সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার ক্যাডারে ৩৫০ টাকা বেতনের চাকরিতে যোগ দেয়। ঐ ক্যাডারের বেতনের হার ইন্ডিয়ান সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স পর্যায়ের, যখন সহকারী প্রকৌশলীর বেতনের হার ছিল ১৫০ থেকে আরম্ভ। আমেরিকায় আমার স্বামী স্কলারশিপ ছাড়া বিদেশে মাসে দুশ ডলার করে বেতন পেত। কাজেই নভেরার আগে এবং বাবার খরচে আমার আমেরিকা যাওয়ার বর্ণনা সব মিথ্যা ও মনগড়া কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তখন লুৎফুনের বিয়েও হয় নি। তাই এ খবর তার জানার কথা নয়।

আরো অনেক মিথ্যা তের অধ্যায়ের ৮৮ পৃষ্ঠায় লুৎফুন সাক্ষাৎকারে আরো অনেক মিথ্যা বলেছে।

প্রথমত নভেরা লন্ডন থেকে ঢাকা আসার অনেক আগে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে কুষ্টিয়ায় চলে যাই। তাই ঘন ঘন নভেরার বাসায় আমার যাওয়ার কাহিনী অবান্তর ও অলীক।

দ্বিতীয়ত আমার বিয়ের সময় ১৯৪৪ সালে আমার স্বামী সিপিডব্লিউডিতে মাসে ৪৫০ টাকা বেতন পেত, সহকারী প্রকৌশলীর বেতনের তিনগুণ। আর আমার শ্বশুর বার্মায় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার বিয়ের গয়না, আমার মেজো বোনের পছন্দমতো, আমার স্বামীর তরফ থেকে দেয়া ৫,০০০ টাকার গয়না কেনা হয়। যখন সোনার দাম প্রতি ভরি ৮০ টাকা। কাজেই অন্য কারোর গয়না পরার দরকার বা আগ্রহ আমার কোনোকালেই ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং ১৯৫১ সালে আমেরিকা যাওয়ার সময় আমার বেশির ভাগ গয়না মায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। ১৯৮২ সালে আমার ভাই শাহরিয়ার তার বিয়ের সময় লুৎফুনকে বউ সাজিয়ে আনার জন্য মায়ের কাছ থেকে আমার গয়না নিয়ে যায়। কিন্তু পরে আমার গয়না আর ফেরত পাই নি। নভেরার নিজের আয়ে নিজের খরচ চলত না যখন, তখন তার গয়না তৈরি করার কথা অবান্তর। শাহরিয়ার ও লুৎফুন, আমার ঢাকা থাকা অবস্থায়, যখন ঢাকায় আসত আমার বাসায় ওরা থাকত। আমার স্বামী কুষ্টিয়ায় বদলি হওয়ায় শাহরিয়ারের তার বউকে নিয়ে নভেরার বাসায় থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। আর্টিস্ট নভেরা সব সময় অগোছালো ছিল। সে গয়না করবে আর রাখবে তালা দেয়া ড্রয়ারে এবং তার হেফাজত করবে লুৎফুন! এ যেন বেড়ালকে মাছ পাহারার ভার দেয়ার মতো কেচ্ছা।

তৃতীয়ত ১৯৬৩ সালের প্রথম ভাগে, চট্টগ্রামে সাইক্লোন হওয়ার পর আমার বাবা হৃৎক্রিয়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ মারা যান, ১৯৬৭-৬৮ সালে নয়। কাজেই বাবার মৃত্যুর আগে অসুখের সময় নভেরার চট্টগ্রামে আসার কথাই উঠতে পারে না। আর বাবা-মারা যাওয়ার আগে তার কোনো অসুখ ছিল না। আমি ও পেয়ারে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে চট্টগ্রামে যাই। নভেরা তখন লাহোরে ছিল। ও চট্টগ্রামে আসে ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে।

চতুর্থত আমার ছোট মেয়ে ১৯৬২-তে মারা যাওয়ার পর আমাকে দেখতে মা-বাবা ঢাকায় আসেন। তখন মায়ের পিঠের একটা আঁচিল সময় সময় ব্যথা করত। আমার ছোট বেলার বন্ধু বীনা আছিরের স্বামী ডাক্তার আছিরকে তা দেখানো হয়, উনি ঐ আঁচিলের রং দেখে অপারেশন করার পরামর্শ দেন। মাকে আমার খরচে হাসপাতালের কেবিনে ভর্তি করা হয়, কিন্তু উনার রক্তচাপ বেশি থাকার জন্য রক্তচাপ কমানোর ওষুধ দেয়া হয়। রক্তচাপ কমলেই অপারেশন করা হবে। কিন্তু ৫/৭ দিনেও রক্তচাপ না কমাতে ডাক্তার হাসপাতালের পরিবেশের বাইরে বাড়িতে এনে রক্তচাপ কমানোর উপদেশ দেন। কিন্তু মা-বাবা ঢাকায় আর থাকতে চান নি। পরে ডাক্তার আছিরের কাছে শুনি হাসপাতালের আয়া ওনাকে বলেছেন যে আমার মা রক্তচাপ কমানোর ওষুধ মোটেই খান নি, আর রক্তচাপ বাড়ার জন্য খাবারের সাথে বেশি করে লবণ খেতেন। মা-বাবা অপারেশনকে ভয় করতেন।

১৯৬৩ সালে, বাবার মৃত্যুর পর যখন চট্টগ্রামে যাই তখন মায়ের আঁচিলটা আরও অনেক বড় হয়েছিল, এবং বেশ ব্যথা হচ্ছিল। ওটা অপারেশন করার কথা বলাতে তিনি কয়েক মাস পরে ঢাকায় আসার কথা দিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে নভেরা যখন ঢাকায় আমার বাসায় আসে, শফিকুল হক সাহেব তখন লাহোরে স্টাফ কলেজে ট্রেনিংয়ে ছিল। নভেরাকে নিয়ে চট্টগ্রামে যাই এবং মাকে এনে ঢাকায় অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিই আমার খরচে। ডাক্তার আছিরউদ্দিন সাহেব খুব যত্ন সহকারে অপারেশন করেন, যার জন্য ওটা আর রিলেপস করে নি, যা মেডিক্যাল হিস্ট্রিতে নাকি বিরল। মায়ের অপারেশনের সময় নভেরা আমার বাসায় ছিল এবং আমরা পালা করে মার সেবা-শুশ্রূষা করি। নভেরা স্কাল্পচারের কাজ করে নিজেই চলতে পারত না সে অবস্থায় মায়ের অপারেশনের খরচ দেয়ার কথাই ওঠে না। ১৯৮৫ সালে মায়ের পায়ে আর একটা আঁচিল ক্যানসারের মতো হয়ে যায়; সে সময়ও অপারেশনের ব্যবস্থা আমিই করি।

১৯৭২ কি ১৯৭৩ সালে শাহরিয়ার একবার ঢাকায় এসে অনেক কাকুতি-মিনতি করে মাকে চট্টগ্রামে নিয়ে যায় বেড়াতে। ২০/২৫ দিন পর ঢাকায় ফিরে আসেন। অনেক পরে মায়ের কাছে শুনি সামনের বাজে ডিজাইনের বাড়ি, যা মায়ের নামে ছিল মায়ের দস্তখত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ভালো দামে বিক্রি করে দেয় এবং সব টাকা শাহরিয়ার নিয়ে নেয়। ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে নভেরা লাহোর চলে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর খবর পেয়েছিলাম নভেরা প্যারিসে কষ্টে আছে। প্যারিসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুল ফতে সাহেবের কাছে ২০০০ টাকা ও কিছু শাড়ি পাঠাই। সে টাকা নিয়েছিল কিন্তু শাড়ি নেয় নি। পরে এক সময় কফিলউদ্দিন মাহমুদ সাহেব যখন সরকারি কাজে প্যারিসে যান শাড়িগুলো ফেরত নিয়ে আসেন।

আমি, মেজো বোন শরিফাকে (পেয়ারে) ছাড়া সব ভাইবোনকে আর্থিকসহ সব রকমের সাহায্য করেছি। তা সত্ত্বেও ভাইয়ের বউ লুৎফুন আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করেন কারণ কি বুঝতে পারছি না। এ ব্যাপারে একটা হাদিসের কথা মনে পড়ল। এক সময় এক আহছাব রসুল করিমকে (স:) কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন, 'আমি অমুক লোকের কোনো উপকার করেছি বলে মনে পড়ছে না।'

আমাদের পরিবারের প্রায় সব ঘটনা বিশেষ করে নভেরা ও মায়ের সম্বন্ধে আমার মামা বি. আর. নিজাম সাহেবের জানা আছে। উনি নভেরা সম্বন্ধে কাগজে ও সরকারের কাছে অনেক লেখালেখি করেছেন। যদি হাসনাত সাহেব বি. আর. নিজাম সাহেব ও কফিলউদ্দিন মাহমুদ সাহেবের সাক্ষাৎকার নেন, তাহলে খুব ভালো হয়।

কুমুম হক
3, Landale Avenue
Mount Clear, Victoria-3350, Australia

AMARBOI.COM

লেখকের বক্তব্য

জীবনীভিত্তিক লেখা কি উপন্যাস? এই প্রশ্নের মুখোমুখি 'নভেরা' লেখার আগেও আমাকে হতে হয়েছে, 'সুলতান' উপন্যাসটি লেখার পর। জীবনীভিত্তিক লেখা উপন্যাসের দৃষ্টান্ত বিদেশী এবং বাংলা সাহিত্যে রয়েছে, যেমন আরভিং স্টোনের 'এগোনি অ্যান্ড ইকস্ট্যাসি' ইত্যাদি, সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে,' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' এবং সেলিনা হোসেনের 'কাঁটা তারে প্রজাপতি,' সুতরাং উত্তরটা সহজেই দেয়া যায়। তবে জীবনীভিত্তিক উপন্যাস রচনায় আমি একটু বেশি স্বাধীনতা নিয়েছি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি বেশি, যার পরিণতিতে অন্যান্য জীবনীভিত্তিক উপন্যাসের তুলনায় ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট। এর ফলে কি উপন্যাস পদবাচ্য হবার যোগ্যতা হারিয়েছে লেখাগুলি? মনে হয় না, এই জন্য যে, উপন্যাসের বাঁধা-ধরা প্রচলিত ধরনটা মেনে চলতে হবে, কোনো ব্যতিক্রম ঘটানো যাবে না—এমন শর্ত কেউ দেয় নি। বিদেশে উপন্যাস রচনায় অনেক অভিনবত্ব এসেছে, বাংলা সাহিত্যেও এর দৃষ্টান্ত বিরল বলা যাবে না। তবে নতুনত্বের জন্যই আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এমনটা ভাবার কারণ নেই। বিষয়ের প্রয়োজনেই আঙ্গিক, আর বিষয় যদি চায় তাহলেই নতুন আঙ্গিকের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হবে। এর ফলে যদি প্রচলিত ধারার ব্যত্যয় ঘটে, তাহলেও সেটা স্বাভাবিক। ন্যারেটিভ স্টাইলে ইউনিলিয়ার ভঙ্গিতে লেখা হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না বলেই উপন্যাস বলা যাবে না, এমন বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও আমি বিনীতভাবে দ্বিমত পোষণ করি।

জীবনীভিত্তিক উপন্যাস কতটুকু বাস্তবভিত্তিক হবে এবং সেখানে কল্পনার স্থান কতদূর পর্যন্ত? এর উত্তরে বলতে হয় পুরোপুরি বাস্তবভিত্তিক হলে তা হবে জীবনী, উপন্যাস নয়। উপন্যাস হতে হলে কল্পনার ভূমিকা মেনে নিয়ে বাস্তবের সঙ্গে তার মিশেল দিতে হবে। এই মিশ্রণের হেরফের হবে দুভাবে—প্রথমত যদি বাস্তব তথ্য অপ্রতুল হয়, তাহলে কল্পনার পাখা বেশ অনেকটা মেলে দিতে হয়। তখন বাস্তব হয় তার 'লঞ্চিং প্যাড,' দ্বিতীয়ত, যদি বাস্তব তথ্য পর্যাপ্ত থাকে, তাহলে উপন্যাসের চরিত্র অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বাস্তবতার ওপর কল্পনার প্রলেপ লাগাতে হয়, শিল্পী যেমন আধা বিমূর্ত ছবি আঁকেন। শেষের ক্ষেত্রে লেখককে সচেতন হয়ে বাস্তব আর কল্পনার এই মিশ্রণ ঘটাতে হয়, ভারসাম্য রাখার জন্য প্রতিক্ষণই থাকতে হয় সচেতন। চরিত্রের মানস প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়েই প্রধানত কল্পনার ভূমিকার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়, ঘটনা উদ্ভাবন করে নয়। 'সুলতান' লিখতে গিয়ে আমাকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়েছিল, কেননা তিনি তখন জীবিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছে, তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের সংখ্যাও ছিল অনেক, যাঁরা অনায়াসেই স্মৃতিচারণায় তাঁর সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা, নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

নভেরা আহমদকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আবিষ্কার করি যে, তাঁর সম্বন্ধে জানেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম, যেন নিকট অতীতের তিনি কেউ নন। তাঁর আত্মীয়-আত্মীয়ার অনেকেরই দেখা পাই নি, বন্ধু এবং বান্ধবীদের মধ্যে যাঁরা খুব নিকটের ছিলেন তাদের বেশির ভাগই মৃত অথবা প্রবাসী। মুদ্রিত লেখা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করব এমন সম্ভাবনাও ছিল না, কেননা প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি ব্রোসিওর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে নি। উপন্যাসটি লেখার পর শিল্পী হাশিম চক্রবর্তী আর মুর্তজার ডাকযোগে পাঠানো কমরুদ্দিন আহমদের লেখা 'বাংলার এক মধ্যবিত্তের লেখা আত্মকাহিনী' অন্তর্ভুক্ত 'নভেরা' অধ্যায়টি হস্তগত হয়, যা উপন্যাসে ব্যবহার সম্ভব হয় নি। ভাস্কর খালেদ তাঁর স্কুল জীবনে, ১৯৬০ সালে নভেরা আহমদের ভাস্কর্য প্রদর্শনী দেখতে এসে ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার ব্যবহারও করা হয় নি একই কারণে। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির স্মৃতিচারণা থেকে 'নভেরা' আহমদ সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি, তা তাঁর জীবনের অনেক অধ্যায় সম্বন্ধেই আমাকে অজ্ঞ রেখেছে। এখানে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, হয়ত স্বাভাবিকভাবে যতটুকু ব্যবহৃত হতো তার চেয়ে বেশিই কল্পনা এসেছে। এর ফলে যদি বাস্তবতা থেকে বিচ্যুতি ঘটে থাকে, তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতে পারি এটা তো উপন্যাস, জীবনী বা ইতিহাস নয়, কথাসাহিত্যিকের এটুকু স্বাধীনতা আছেই। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করব যে, এই স্বাধীনতা লেখককে সত্যের অপলাপ হতে দেয়ার বা বাস্তবের বিকৃতি ঘটানোর ক্ষমতা দেয় না। সত্যের অপলাপ বা বাস্তবের বিকৃতি ঘটে যখন জীবনী-উপন্যাসের কোনো চরিত্র (প্রধান চরিত্র তো বটেই) বাস্তবে যা ছিল না তেমনিভাবে চিত্রিত হয়ে যায় অথবা এমন কোনো ঘটনার অবতারণা করা হয় যা মূল চরিত্রকে এবং পার্শ্ব চরিত্রগুলিকে সহানুভূতির আর আন্তরিকতার সঙ্গে দেখতে সাহায্য করে না। এক কথায়, কোনো বিদ্বেষ বা যুক্তিতিরিক্ত আসক্তির আশ্রয় না নিয়ে লিখতে পারাটাই জীবনী উপন্যাসের প্রধান শর্ত বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ধারণা। 'নভেরা' উপন্যাস লিখতে গিয়ে এই মনোভাব কাজ করেছে. আমি প্রধান চরিত্রের যে ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছি একজন স্বাধীনচেতা, সাহসিকা. আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্না, আপসহীন শিল্পী হিসেবে, তার সমর্থনে ঘটনাগুলি সাজিয়েছি এবং পাত্র-পাত্রীদের অবতারণা করেছি। যদি আরো তথ্য পাওয়া যেত, যা দুঃখজনকভাবে এখন পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে পাই নি, তাহলে উপন্যাসটি আরো ঘটনাবহুল হতো, আরো কিছু চরিত্রের ভূমিকা থাকত অথবা যেসব চরিত্র এসেছে, তারা আরো মেদ-মাংসে পরিপূর্ণ হতে পারত। নভেরা আহমদ সম্পর্কে দেশের মানুষের নির্লিপ্তি, কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য বেশ মোটা দাগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ানোর ফলে তাঁর ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে তথ্য-সংকট তো বটেই, সেই সঙ্গে তাঁর শিল্পকর্মের সহজলভ্যতাও লেখার জন্য বিশেষ অন্তরায়। 'নভেরা' প্রকাশের পরও পরিস্থিতির তেমন হেরফের হয়েছে বলে মনে হয় না। অনেকেই আগ্রহ আর কৌতূহল দেখিয়েছেন, কিন্তু নতুন তথ্য দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনই।

নভেরা আহমদের অগ্রজা অস্ট্রেলিয়া থেকে যে চিঠি পাঠিয়েছেন 'বিচিত্রায়,' আমাকে তা দেখানো হয়েছে। কিছু তথ্য বা মতামতকে এখানে ভুল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে পত্র-লেখিকা এবং তাঁর স্বামী সম্বন্ধে তাদেরই আত্মীয়া কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের কিছু অংশ যে অসত্য এই মন্তব্য সঠিক কি না এই বিতর্কে না গিয়েও বলব যে 'নভেরা' চরিত্রের শুদ্ধতা রক্ষার জন্যই তাদের অসন্তুষ্টি বা উষ্মার কারণ যেসব উক্তি, তা ভবিষ্যতে লেখায় পরিহার করা হবে। তবে স্থান ও কালে কিছু ঘটনার সন্নিবেশে যদি ভুল থাকে, যেমন নভেরার বিবাহ বিচ্ছেদ কুমিল্লায় হয়েছিল না কলকাতায়, সে সব শোধরানোর তাগিদ দেখিনে, কেননা ঘটনাটাই প্রধান, তাকে যথাসময়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে এটা ঐতিহাসিকের দায়িত্ব, ঔপন্যাসিকের নয়। অথবা লন্ডনে সহোদরাদের তিনি এয়ারপোর্টে বিদায় দিয়েছিলেন, না জাহাজবন্দরে, সেটিও বিদায়কালীন বিষণ্ণতার প্রতি তুলনায় গৌণ। অথবা 'গডস্ গিফট' বাড়িটি নিজেদের ছিল, না সরকারের, এই সব খুঁটিনাটির জন্য 'নভেরা' চরিত্র চিত্রণ অসম্পূর্ণ বা বিকৃত হয়েছে এমনটা আমি ভাবি না। তাঁর চরিত্রের নির্যাস নির্ণয় এবং উপস্থাপনাই আমার উদ্দিষ্ট এবং সেটা স্থান-কালের এই বিভ্রাটের ফলে বিসর্জন দেয়া না হয়ে থাকে তাহলে বাস্তবতার জন্যই স্থান-কাল সঠিক করার প্রয়োজন দেখি না। তবে অকারণে অহেতুক জীবিত কেউ মনে আঘাত যেন না পান অথবা তাঁদেরকে অন্যের বিদ্বেষের কারণে হেয় প্রতিপন্ন করা হোক এমনটাও হতে দেয়া সমীচীন নয়। মৃতদের সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয় এবং একটু বেশি করেই, শুধু এই জন্য যে, তারা এখন সপক্ষে বলার ঊর্ধ্বে।

নভেরা আহমদ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল অংশ, আমাদের গর্বিত উত্তরাধিকার তাঁর সৃষ্টি। তাঁর সম্বন্ধে, বিশেষ করে সৃজনশীল প্রতিভার দিকটার ওপর, আরো তথ্য প্রয়োজন যেন তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হয়। তিনি বোহেমিয়ান ছিলেন, সময়ের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন, নারী স্বাধীনতার পথিকৃৎ ছিলেন, প্রথম বাঙালি ভাস্কর ছিলেন, এসবই শেষ কথা নয়। শিল্পী হিসেবে কেমন ছিলেন, তাঁর শিল্পকর্মের উৎকর্ষের বিচার কিভাবে করা হবে, এসব সম্বন্ধেও ভাববার সময় এসেছে।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৯৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'It Is My Mother's Face'

Hamidur Rahman, a pioneer Painter of this country, had gone to Europe in 1951 to study painting at Beaux Arts in Paris. During his five year stay in Eurpoe, while coming under the influence of various Western thoughts, media and personalities including painter Victor Pasmore, art authorities Basil Gray and J. Archer, he was able to realise deeply the wealth of his own culture.

Sitting in small flat in Cranleigh House a few hundred yards from Euston tube station in 1956, Hamidur Rahman, Novera Ahmed the culptress and I were debating whether, they should go back home or utilise the opportunities already available in London. Hamidur Rahman was my elder brother.

Both the artists had finished their academic life and were now ready to embark in a competitive world. The picture of the then East Pakistan was not a very happy one. Not many exhibitions were being held, nor many commissions available. Painter Zainul Abedin was struggling hard to lead the art movement in Dhaka. Not many Asian painters were working in London at the time. The racial colour bias was not so pronounced then, therefore Hamidur Rahman who had qualified from the Central School of Arts in London, and Novera Ahmed from Camberwell School of Arts, London, could have stayed back comfortably.

As the discussion went from aesthetic problems to economic problems, the voice of Hamidur Rahman became sharper. I could see in his eyes a grim determination to face an unknon future in his home-twon. He was so convinced that he simply must go back.

Europe was not suffocating nor dull, but the challenge felt by his youthful spirit led him to decide to return and immerse himself in the struggles of his country.

In the background of the 1952 Language Movement, no Bengalee could have remained unconcerned, least of all a fiery artist like Hamidur Rahman. He Packed his small suitcase and boarded the plane for Dhaka.

He did not choose to stay in Karachi where a lot of money was available for Europe-trained artists. His deep fellings, his roots, his convictions threw him into the difficult art world of East Pakistan.

Novera Ahmed followed suit to remain in his company for a long time.

In the spring of 1957, Chief Minister of East Pakistan Ataur Rahman Khan requested Chief Engineer Jabbar and ZainulAbedin to ask Hamidur Rahman to prepare a plan for a Shaheed Minar. The idea charged Hamidur Rahman with tremendous enthuasiasm. He found and outlet to express his commitment to Bengali nationalism. This was a complex demand. Never before had there been an agitation of such intensity as the Language Movement, nor was there any

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

important example of a martyrs' monument in this tract of land. Therefore the artist Hamidur Rahman had to search for a new expression to convey the aspirations of the people. He presented a model of the Shaheed Minar along with 52 drawings and sketches, out of a hundred more he had worked out. There were other competitors who submitted their designs, but the Selection Committee composed of the internationally acclaimed Greek Artist Doxiades, Zainul Abedin and Jabbar chose the design evolved by Hamidur Rahman.

Hamidur Rahman started work in November 1957. He realised in a month's time that in order to complete the monument before February, 1958, he must devote all his time to his work and ber near the construction site. He therefore asked that two small tin huts be built next to the site, one to live in and the other to work in. He left his cosy Islampur house to live in this workshop so that he could breathe the atmosphere of the Shaheed Minar.

A pyramid, or a vertical column like Cleopatra's Needle or an obelisk, or a Qutb Minar are the well-known forms of various styles of monuments. Hamidur Rahman designed a greatly different minar from the other, well-known structures.

He went ahead untiringly and completed the first phase of the foundation, the raised platform and three columns time. He was grappling with two basic forms of horizontal and vertical to bring out the beautiful theme of revolt and peace, of love and grief, tears and solace. It can be seen that the Vertical lines porvide manifestation of the inner strength of a nations conviction. The four columns reflect the tension of horizontal and vertical lines at different heights. The central column shifts away from the stated geometric shape, where the bowed head of the symbolic mother, bestowing protection and blessings on her children, leans forward at an angle.

Hamidur Rahman's design provided for stained glass to be used in the columns on which a pattern of hundreds of eyes were to be incorporated through which the sunlight would glow. The floor was to be of marble, so as to show up, or reflect, the moving shadows of the columns as the sun crossed the sky, thus creating a mobile drama of geometric lines and colour from the stained glass. He had thought of inclusion of blood-stained footsteps of the Shaheeds and outside foot prints in black of the aggressor, on the marble. He had kept provision for a clock tower and a well-stoked research library. In the basement gallery of the Minar, he had designed 1,500 sq. ft. of fresco depicting the scenes of the Language Movement, which was in fact one of his masterpieces. Hamidur Rahman had learnt the technique of frescoes at London and Florence.

In this mural Hamidur Rahman portrays human figures brutally flattened and stretched into geometric forms, and unarmed marchers pushed back to the wall. Their last-ditch attempt to stand up for their rights transform faces, arms, elbows and shoulders into sharp weapons. The single eye on a triangular-face stares out and dismembered legs and feet continue their stance of unyielding challenge. Hamidur Rahman used earth colours from the folk paletteblue, yellow and earth red in pastel shades, deploying lime and egg yolk in the tradition of fresco work. Unfortunately this beautiful work was erased by vandals. And the fact becomes downright tragic if we remember that this happened in 1972, in the month of February, when there was a general euphoria in the air as the first Ekushey

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

celebrations in the free Bangladesh were being planned. One of the disciples of Shilpacharja Zainul Abedin. Iqbal Ahmed who is a noted leather craftsman himself was going to the Shilpacharja's house in the morning of 10 February along the shaheed Minar road when he decided to drop in and see the progress of work at the Minar complex. The whole structure was being rebuilt and the area refurbished. He found some workmen of the public works department at work in the room where the mural was. They were hacking at the mural and levelling up the wall. Iqbal rushed to Zainul Abedin, who in trun sent him to fetch Hamidur Rahman from his house. When Hamidur Rahman came, the Shiplacharja sent him to the Government Secretariat to find out what was going on. There, in the labyrinth of the Secretariat, Hamidur Rahman found not one person who could tell him who had decided to deface the mural, who gave order and most importantly, why it was being done. Frustrated, Hamidur Rahman came back to report to Zainul Abedin. Evidently, someone was responsible for this vandalism, but to this day, no one knows who. a Single canvas in extant in my private collection of the same mural design, thouth this is in oil.

Novera Ahmed collaborated with Hamidur Rahman in the field of designing the fountain and embellishing the landscape with sculptures and design of plants and foliage. Both Hamidur Rahman and Novera Ahmed had spent time in Florence and Novera had studied sculpture under D. Vogel in London and the famous Italian Venturno Venturi in Florence. She was especially fascinated by the great tradition of fountain sculptures abounding in Italian cities, such as the Fontana Trevi in Rome and Piazza Vecchio in Florence and garden designing as in Bobli Gardens and Villa Borghese. Mughals had practised fountain art in India, but only in well laid gardens, as part to the designs of these gardens. In Europe, however, fountains had been a part of the aesthetic layout of cities. When Novera came back to Dhaka, she became the first practitioner of fountain art in the then East pakistan. Obviously, she wanted to include a fountain as part of the structural design of the Shaheed Minar.

AMARBOI.COM

As an avant garde artist she wanted to add a new dimension to the land-scape of Shaheed Minar using the flow of water as a complement to the graceful moving shadows on the Marble platform.Her sculptures were also to enhance the passion and pain of the martyrs through figurative works. She was the first sculptor who pointed out the importance of placing sculpture in the open air. Unfortunately, these aspects remain unfulfilled to a great extent even now.

In late 1958, following the imposition of martial law by General Ayub Khan, the Shaheed Minar plan was shelved and those connected with it had to undergo various tortures and harassment. I received a telegram in Karachi, where I was working at the time. Hamidur Rahman intimated that he was arriving on his way to the United States. I had anticipated this and therefore was mentally ready to accord whatever protection possible for his safety. Internationally-acclaimed artist Sadeqain and I went to receive Hamidur Rahman at the airport. He came out of the plane, completely shaken.

We talked of many things, except the painful subject of the Shaheed Minar. He said he was to fly out at the earliest, which meant the next day. He had got an assignment in Philadelphia University Art Centre, through the good offices of his friends in Dhaka. Things were unbearable for him. No one was allowed to work

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

on the Shahed Minar anymore. I could realise the frightful situation in Dhaka. The next day we saw him off at the airport. With tearful eyes he said, though his assignment was a long one, he would be back at the first opportunity to continue his work with the Shaheed Minar. His words came true. He cut short his stary without hesitation as soon as he got word that the situation was somewhat congenial and hurried back to Dhaka.

While in Philadelphia, he executed a mural in Library Hall, depicting the Language Movement. It may be of interest for researchers that a substantial documentation of the shaheed Minar basement mural is available in the archives of the Art Department of Philadelphia University, which does not exist in Bangladesh.

In 1972, designs were called for to rebuild the Shaheed Minar (which was destroyed on the night of March 27, 1971 by the Pakistan Army). A competition was held and many people submitted their designs from amongst which Hamidur Rahman's layout was selected once again.

I remember in 1973, sitting in my Circuit House Flat, Shilpacharja Zainul abedin narrated an interesting episode about the selection. He said that during several hours of deliberations the Committee kept on considering various changes. He was so exasperated, that he raised voice and in a firm manner said that the nation had owned and cherished Hamidur Rahman's design of the Shaheed Minar for many long years. Abedin told the Committee "This is the face of my mother, I adore it. To some it may be a plain or a simple face, but it is my mother's face. I would not barter it for a hundred other beautiful faces." The result was that Hamidur Rahman's original design won the day. This much-loved symbol is replicated all over the country and has even crossed the border.

In due course of time the five columns of the monument were reconstructed, though he had to go through much red tape and buraucratic obstructions in fulfilling just a part of his total plan. The worst was that on December 7, 1973 when M. R. Jabbar, an associate of Hamidur Rahman, submitted the contract from for final approval of the Works Secretary, alas, no contract was signed, no contract could be signed! A horrible thing happened, the file got misplaced!

Hamidur Rahman never got a farthing anymore.

I was further shocked when as recently as 1984, a Finance Minister in the regime of H. M. Ershad coming out of cabinet meeting told me that the government had decided to improve the Shaheed Minar. I posed a question as to whether it would be Hamidur Rahman's desing. The minister smiled and said, "Not exactly. It will be somewhat similar, but not after the original." I don't know of any other country where designs are changed at will, without the artist's permission, particularly when the artist was alive and available.

Again in 1986, the Works Minister in Ershad's cabinet invited Hamidur Rahman to talk about the implementation of the plan of the Shaheed Minar. They visited the shaheed Minar and Hamidur Rahman told the minister that he can spend as much as six months of his time if need be to execute his plan. The artist had envisaged a reading area in his original design, now he wanted to build a library for children behind the Minar along the boundary wall, where a basement and an upper floor would contain the library and reading rooms. A lot of

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

discussion took place but nothing concrete materialized. Once again, the government had attempted an eye wash.

Hamidur Rahman or Novera cannot implement their designs now.

Hamidur Rahman passed away in 1989.

And Novera Ahmed has simply left, with no forwarding address. No one knows where she lives now, or what she is doing. A pity such a gifted artist has vanished from amongst us.

Had Hamidur Rahman been alive today, he would have been happy to see that his humble offering has provided the central meeting point where people's songs and dramas are acted and where intellectuals and politicians go to place wreaths of homage to the departed souls of the martyrs.

From "Ekushey", An anthology of articles published by Bangla Academy, 1994

Sayeed Ahmed

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~